বংশধর ও কোষবিজ্ঞান
অধ্যাপক
বিবেকজ্যোতি মৈত্র

বংশধারা ও কোষ বিজ্ঞান

সর্ব্বভারতীয় পাঠক্রম অনুসারে

শ্রীবিবেকজ্যোতি মৈত্র

অধ্যাপক, ক্রীশ্চান কলেজ

বাঁকুড়া

পরীক্ষক কলিকাতা ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
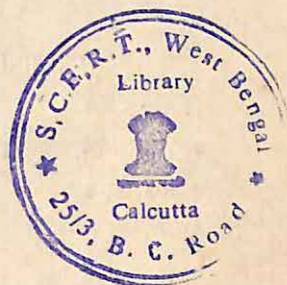
প্রকাশক
অমিতাভ ঘোষ
ব্রজেন্দ্র প্রকাশনী.
৪২/১ বোসপাড়া লেন
কলিকাতা-৩

প্রথম মুদ্রণ-১৯৬৮

মুদ্রাকর
শ্রীহীরালাল গোস্বামী
শ্রীআর্ট প্রেস
৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট—শ্রীবিশ্বজ্যোতি মৈত্র

মূল্য দশ টাকা মাত্র।

মুখবন্ধ

ত্রি বার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা বংশধারা ও কোষ বিজ্ঞানের প্রশ্ন
তৈরী করার জন্য যে সমস্ত বই হাতের কাছে পায় তার সবগুলিই বিদেশী
ভাষায় বিদেশী লেখকদের লেখা। এই সব বই তথ্যের দিক দিয়ে ভাল
খুবই তাতে সন্দেহ নেই তবে ছাত্রদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এদের আকাশ
ছোঁয়া দাম, বিদেশী ভাষার অনভ্যাস, এবং তথ্যের বিপুলতা ও জটিলতা।
অথচ আমরা সাধারণ ভাবে যেমন কথা বার্ত্তা বলি, কোন কিছু আলোচনা
করি সেই ভাবে বোঝানত কিছু কঠিন নয়। আর ক্লাশে তাই করতে হয়ই
কারণ ছাত্র ছাত্রীরা যদি বুঝতে না পারে তাহলে লিখবে কি। কিন্তু ছাত্র
ছাত্রীরা ক্লাশে যা বোঝে বই থেকে তা উদ্ধার করে একটি প্রশ্নের উত্তর
তৈরী করতে গিয়ে হারিয়ে যায় তার জটিলতায় অনেক সময় বুঝতে পারেনা
ভাষা। তাছাড়া আমাদের দেশে যে ভাবে পড়ানো হয় এবং পরীক্ষা নেওয়া
হয় বাইরের অনেক দেশেই সে ভাবে হয় না। সেজন্য বিদেশী লেখকের বই
এর বাঁধুনী অন্য ধরণের। আমাদের ছাত্রদের তাই একটা প্রশ্নের জন্য দশটা
বই দেখতে হয়। বাংলা ভাষায় বংশধারা ও কোষ বিজ্ঞানের উপর এই
প্রথম বই এদেশের ছাত্র ছাত্রীদের এখানকার প্রচলিত পদ্ধতির পরীক্ষায়
সাহায্য করবে।

বাংলা দেশে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী ও বিশ্বভারতী এই
পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বংশধারা ও কোষ বিজ্ঞানের পাঠক্রম প্রচলিত
আছে। এই বইয়ে যে অংশগুলি আলোচনা করা হয়েছে তার বাইরে
কোন কিছু সম্ভবতঃ এই পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর
সাম্মানিক ও সাধারণ শ্রেণীর পাঠক্রমে নেই। সে জন্য বাংলা দেশে প্রাণী
বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানে স্নাতক শ্রেণীর যে কোন ছাত্রের প্রয়োজন হবে
এই বই এর।

শ্রীবিবেকজ্যোতি মৈত্র

সাহিত্য ভাষ্যকার, সুলেখক, ও সাংবাদিক
সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়—
অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের
পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

বংশধারা ও কোষবিজ্ঞান

শ্রীবিবেকজ্যোতি মৈত্র

বংশধারা

উত্তরাধিকারের রহস্য চিরকালের আকর্ষণের বিষয়। জন্মগত বৈশিষ্ঠ, বংশধারা বা পারিবারিক ঐতিহ্য সকলের কাছেই আকর্ষণীয়। প্রত্যেকেই চায় তার পারিবারিক ঐতিহ্য যেন নষ্ট হয়ে না যায়, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে যেন বজায় থাকে, বরং নূতন কিছু বৈশিষ্ঠ যেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আসে। প্রত্যেক পরিবারেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ঠ থাকে। বিভিন্ন পরিবারের মিলন হয় বৈবাহিক সূত্রে। নূতন বংশধরেরা গড়ে ওঠে দুই পরিবারের দোষগুণের সম্মিলনে। বিবাহের আগে তাই পাত্র পাত্রীর বিভিন্ন গুণাবলীর খোঁজ খবর বিশেষ ভাবে নেওয়া হয়। আর শুধু গুণাবলীই নয়, রূপ লাবণ্যের উপরও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়। এর কারণ স্মরণাতীত কাল থেকে আমরা জেনে এসেছি ছেলে মেয়েরা তাদের যা কিছু বিশেষত্ব তা পায় মা, বাবা, মামা, কাকা ইত্যাদির কাছ থেকে। অর্থাৎ দুই পরিবারের সব কিছু মিলিয়ে।

একথা জানতে আমাদের পুঁথি-পত্রের প্রয়োজন হয়নি। প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্রের পর্য্যবেক্ষণ আমাদের একথা জানিয়েছে। তবে কখন হয়ত দেখা যায় যে, যা আশা করা যাচ্ছে তাই ঘটছে আবার কখন হয়ত দেখা যায় যে কোন হিসাবই মিলছেনা। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেরই গায়ের রঙ ফর্সা এমন একটি পরিবারের প্রথম সন্তানটি হয়ত সকলে যেরকম আশা করেছিলেন তেমনি ফর্সা হল। কিন্তু তার পরেরটি হয়ত হল কালো কিম্বা মাঝামাঝি কিছু। হিসাব মিলল না। কেন এমন হল? এই প্রশ্ন বার বার এসেছে মানুষের মনে। সাধারণ লোকেরাও যেমন চিন্তা করেছেন এই প্রশ্ন নিয়ে, চিন্তা করেছেন বৈজ্ঞানিকেরাও। এমনি ধারার পর্য্যবেক্ষণ এবং তার বিশ্লেষনী চিন্তা এবং ভাবনা আমাদের ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে গেছে উত্তরাধিকার তত্বের গোপন রহস্যের ব্যাখ্যার দিকে এবং ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের এক নূতন শাখা।

চার্লস ডারউইন মনে করতেন উত্তরাধিকারের রহস্য এক আশ্চর্য্য বিষয়। এই ভাবনার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ১৮৬৮ সালে। ডারউইন তাঁর পারিপার্শ্বিক জগত সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করতেন। তাঁর বিশ্লেষনী দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ফলস্বরূপ তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি বিবর্তন বাদের অতি আশ্চর্য্য ও অতি সত্য বিশ্লেষণ। প্রাণী জগতের এত বৈচিত্র (variation) কি ভাবে এল এবং কিভাবে এত বিভিন্ন প্রজাতীর (species) উদ্ভব হল এই রহস্য ভেদের চেষ্টায় ডারউইন তাঁর সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন। ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন যে সব চরিত্রই যে সকলে ঠিক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে তা নয়। আবার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চরিত্রগুলি যে সব সময় একই ভাবে প্রকাশ পায় তাওনয়। দেশকাল পাত্র ভেদে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের (Environment) প্রভাবের বিভিন্নতায় অনেক চরিত্রের ই উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটে।

মা বাবার গায়ের রং ফর্সা হলেও ছেলে মেয়েরা কালো হয় না এমন নয়। সাদা খরগোসের বাচ্চারা অনেক সময় কালো হয়, কালোয় সাদায় মেশানো হয়। কিন্তু উত্তরাধিকারের নিয়মের এই ব্যতিক্রম কেন, অথবা একই মা বাবার সন্তানের মধ্যে এত বৈচিত্র কেন, তার কারণ কি অথবা যে রকমটা আশা করা যায়নি তা হঠাৎ কেমন করে এল তার রহস্য ডারউইনের জানা ছিলনা। তা যদি জানতেন তবে ডারউইন তাঁর প্রজাতীর উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতেন।

কালো বেরালের বাচ্চারা সবাই সব সময় কালো যে হবেই তা নয়, হঠাৎ এক আধটা সাদা হয়ে যায়, কোনটা বা সাদায় কালোয় মেশানো হয়। কিন্তু কেন? এই কেনটা ডারউইনের কাছে ছিল একটা ধাঁধার মত রহস্য। কাজেই ডারউইন বলতেন পৃথিবীতে এমন বৈচিত্র (variation) ঘটে। যদিও ডারউইনের প্রজাতির উৎপত্তি রহস্যের সমস্ত বিশ্লেষণটার মূল কাঠামো ছিল প্রকৃতির এই বৈচিত্রের (variation) উপর। ডারউইনের জানা ছিলনা এই বৈচিত্রের (variation) উৎপত্তির মূল কারণটা কি। অথচ সে সময় আর একজন বিজ্ঞানী এই রহস্যের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন ১৮৬৬ সালে। ইনি হলেন বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী গ্রেগর জন মেণ্ডেল।

মেণ্ডালের এই আবিস্কারের কথা ডারউইন কিছুই জানতেন না।

ডারউইন কেন কেউই জানতেন না। তার কারণ মেণ্ডেল অষ্ট্রিয়ায় বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি অতি সাধারণ পত্রিকায় তাঁর গবেষণার বিষয় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সেই সময় বিশেষ কারো নজরে পড়েনি, বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পত্র পত্রিকার আড়ালে চাপা পড়েছিল। ১৯০০ সালের আগে সেটা নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনাও হয়নি। ফলে আজকের দিনে যাঁর নাম উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রই জানে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি কোনায় যাঁর নাম উচ্চারিত হয়, নিজের জীবদ্দশায় তিনি কোন সম্মানই পাননি। তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ন হয় তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে।

বাঘের বাচ্চা বড় হয়ে বাঘই হয়, পাখীর ছানা পাখীই হয়, অন্য কিছু হয়না। কেন হয়না? আবার কালো বেরালের বাচ্চারা কখনও এক আধটা সাদা হয়, কোনটা সাদায় কালোয় মেশান হয়। কেন হয়? এই কেনর উত্তর দেবার জন্যই উত্তরাধিকার তত্ব (Heredity) বা বংশ ধারানুক্রমের (Genetics) অবতারনা যা ব্যাখ্যা করবে উত্তরাধিকারের (Inheritance) মূল সূত্র। অবশ্য জীবন রহস্যের এই গভীরতায় প্রবেশ করতে হলে আমাদের জানতে হবে আরো কিছু বিষয় যার মধ্যে একটি হল সৃষ্টিরহস্য (Reproduction)।

সন্তান যে তার মা বাবার প্রকৃতি পায় এটা যদিও সকলেরই জানা আছে। তা হলেও বংশ ধারানুক্রমের অতি সাধারণ বিষয়গুলির রহস্য ভেদ করতেই আমাদের সময়লেগেছে অনেক এবং অবতারণা হয়েছে বহু তর্ক বিতর্কের। প্রাণ থেকে যে প্রাণের উৎপত্তি, এই ধারণাটারই প্রতিষ্ঠা হয়েছে বহু বিতর্কের পরে।

সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে প্রাচীন যুগে বহু বিচিত্র ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যা এখনকার দিনে অচল। এমন কি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন যুগের যে জ্ঞান তপস্বীর নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় সেই এরিষ্টটল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২ অব্দ) নিজেও বিশ্বাস করতেন যে প্রাণহীন জৈব পদার্থ থেকে প্রাণের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে সত্যান্বেষী কিছু বিজ্ঞানী এই মতবাদ খণ্ডন করতে চেয়েছেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে।

রেডি (১৬২৬—১৬৯৮) এবং স্প্যালানজী (১৭২৯—১৭৯৯) দেখিয়েছিলেন যে প্রাণহীন জৈব পদার্থ যদি সব রকমের সংক্রামন থেকে মুক্ত রাখা যায় তাহলে তা থেকে প্রাণের উৎপত্তি হয় না। তবুও উনবিংশ শতাব্দীর

শেষভাগ পর্যন্তও বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়নি। প্রাণের উৎপত্তি যে শুধুমাত্র প্রাণ থেকেই হয় এই সত্য শেষপর্যন্ত প্রশ্নের অতীত ভাবে প্রমাণিত হল লুই পাস্তর (১৮২২—১৮৯৫) এর পরীক্ষায়।

পাস্তর এবং অন্যান্যরা যা প্রমাণ করলেন তা হল এই যে প্রাণের উৎপত্তি প্রাণ থেকেই। সহজ কথায় প্রাণ প্রবাহের একটা ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিকতাই হল বংশানুক্রম যার বিজ্ঞান ভিত্তিক সফল বিশ্লেষণ হল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রেগর জন মেণ্ডালের গবেষণায়।

অবশ্য মেণ্ডালের আগে যে বংশধারানুক্রম নিয়ে কাজ হয়নি তা নয়। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ এই দুই শতাব্দীতেই প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈচিত্রের মধ্যে সঙ্কর তৈরী করে অনেক কাজই হয়েছে। তবে মেণ্ডালের মত এত পরিষ্কারভাবে ছকে বাঁধা কিছু নিয়ম কানুনের মধ্যে বংশধারার বৈচিত্রময় প্রকাশগুলিকে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। এর ফলে মেণ্ডালের পূর্ববর্তী-দের কাজকর্ম দুর্ব্বোদ্ধতার জটিলতা যেমন ভেদ করতে পারেনি তেমনি রেখে যেতে বাধ্য হয়েছে অনেক প্রশ্নের অবকাশ।

মেণ্ডালের পূর্ববর্ত্তীদের মধ্যে আমরা দুজনের নাম উল্লেখ করতে পারি। এঁরা হলেন নাইট (Knight 1799) এবং গস (Goss 1824)। প্রথম জন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং দ্বিতীয় জন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাজ করেন। এঁরা দুজনেই পরীক্ষা চালান মটর গাছের বিভিন্ন বৈচিত্র নিয়ে। মেণ্ডালের পরীক্ষাও ছিল ঐ একই উপকরণেই তবে নাইট এবং গস যে আসল লক্ষ্যে পৌছুতে পারেননি তার কারণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী খুব স্বচ্ছ ছিল না, এবং নিজেদের পরীক্ষার ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণে সতর্কতার অভাব ছিল যথেষ্ট।

ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী নাইট (Knight 1799) আগ্রহী ছিলেন নূতন ও উন্নত ধরণের ফলমূল শাকসব্জী ইত্যাদি তৈরী করায়। এর জন্য তিনি বিভিন্ন বৈচিত্রের সংমিশ্রণে সঙ্কর তৈরী করতেন। পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মটর গাছকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তার কারণ মটর গাছের জীবন স্বল্প মেয়াদী, মটর গাছের বৈচিত্র অনেক, এছাড়া মটর গাছ উভলিঙ্গ হওয়ায় স্বতঃ প্রজননে একই ফুলের অভ্যন্তরে স্ত্রী ও পুরুষ কোষের মিলন হতে পারে। এছাড়া ফুলের ভেতরের অংশটি অর্থাৎ গর্ভকেশর ইত্যাদি পাপড়ি দিয়ে ঘোমটার মত ঢাকা দেওয়া থাকে। পতঙ্গ ইত্যাদিরা অন্য ফুলের পরাগ বয়ে

এনে প্রজননে সাহায্য করে অনেক ফুলেই, যেখানে উভলিঙ্গ ফুল নয়। কিন্তু এরা অপ্রয়োজনীয় বৈচিত্রবাহী পরাগও নিয়ে আসতে পারে এবং তার ফলে সমস্ত পরীক্ষাই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে মটর ফুলে সে সম্ভাবনা নেই। গবেষক তাঁর পছন্দ মত কোন বৈচিত্রের ফুল থেকে পরাগ এনে ইচ্ছামত প্রজনন করাতে পারেন অথবা প্রয়োজন হলে স্বতঃ প্রজনন ঘটতে দিতে পারেন।

নাইট দুরকম বৈচিত্রের মটর গাছ বেছে নিয়েছিলেন। একরকম বর্ণহীন সাধারণ প্রকৃতির অর্থাৎ সবুজ গাছ সাদাফুল এবং সাদা বীজ হয় এমন। অন্যটি বর্ণাঢ্য প্রকৃতির অর্থাৎ লালচে গাছ, লাল ফুল, এবং বাদামী বা ধূসর বর্ণের বীজ হয় এমন। নাইট দেখলেন এদের মিলন ঘটালে যে মটরগাছগুলি হয় সেগুলি সবই লালচে গাছ, লাল ফুল এবং বাদামী বীজ প্রকৃতির। এইগুলির স্বতঃ প্রজনন হলে অথবা এদের সঙ্গে বর্ণহীন বৈচিত্রের মিলন হলে পরবর্তী বংশে কিছু বর্ণহীন এবং কিছু বর্ণাঢ্য প্রকৃতির গাছ হয়। এমন কি একই শুঁটির বিভিন্ন বীজের কোনটি বর্ণাঢ্য, কোনটি বর্ণহীন হয়।

নাইট অবশ্য মোট কতগুলি গাছ হল এবং তার মধ্যে কোন ধরণের গাছ কতগুলি হল সে সব কোন হিসাব রাখেননি। এর ফলে বংশানুক্রমের আসল রহস্যটি তাঁর কাছে অজানাই রয়ে গেল। তবে নাইট একটা কথা বললেন যে দেখা যাচ্ছে বর্ণহীন প্রকৃতির চেয়ে বর্ণাঢ্য প্রকৃতি হবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে এবং তারাই সংখ্যায় বেশী হয়।

১৮২৪ সালে গস (Goss 1824) নাইটের মতই মটর গাছের উপর পরীক্ষা করেন। গস এর পরীক্ষার ফলাফলও নাইটের আবিষ্কারের সঙ্গে একই হল। তবে গস তাঁর বিশ্লেষণকে আর একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তৃতীয় বংশ পর্যন্ত।

ডেভনশায়ারের অধিবাসী গস এরও প্রধান আগ্রহ ছিল নূতন ধরণের গাছপালা তৈরী করায়। গস মটর বীজের দুরকম বৈচিত্র বেছে নেন, সবুজ রংয়ের বীজ আর হলুদ রংয়ের বীজ। এদের মিশ্রণে যে গাছগুলি হল সেগুলির প্রত্যেকটির বীজ হল হলুদ রংয়ের। এই বীজগুলি থেকে যে গাছ গুলি হল সেগুলিতে তিনি স্বতঃ প্রজনন হতে দিলেন। তার ফলে যে বীজ হল তার কিছু হল সবুজ বীজ, কিছু হলুদ রংয়ের বীজ এবং কিছু হল মিশ্র প্রকৃতির অর্থাৎ একই শুঁটিতে হলুদ এবং সবুজ বীজ হল। এই পর্য্যায়ের বীজ গুলি থেকে দেখা গেল সবুজ বীজে সবুজ বীজ দেয় এমন গাছই হয়, হলুদ বীজে

হলুদ বীজ দেয় এমন গাছ হয় এবং মিশ্র প্রকৃতির বীজ থেকে হলুদ এবং সবুজ দু রকম বীজের গাছই হয়।
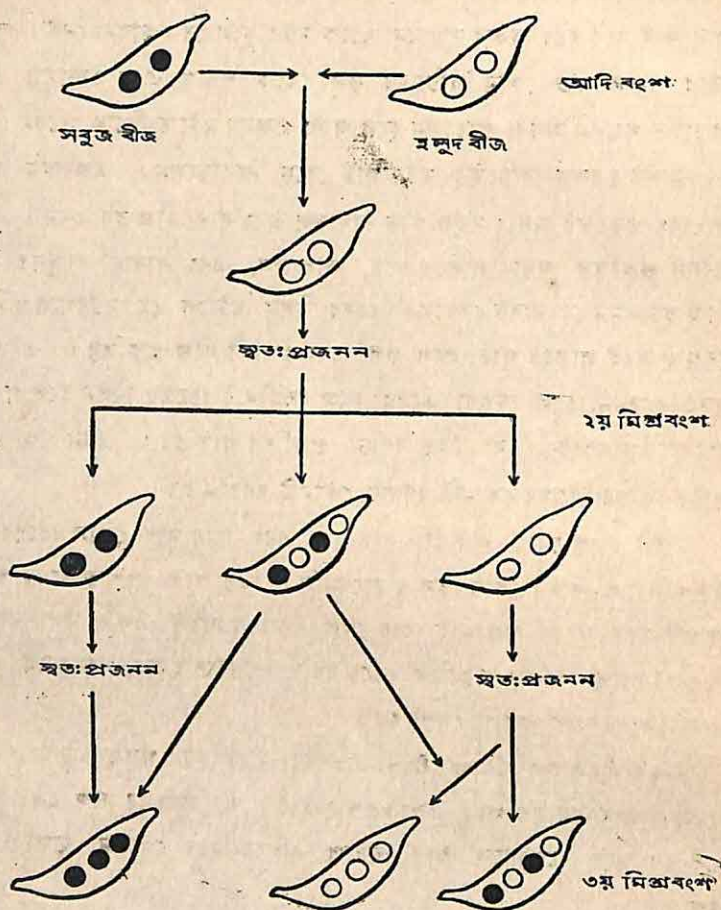
গসের প্রায় বিয়াল্লিশ বছর পরে মেণ্ডাল (Mendal 1866) ঐ মটর গাছের উপরেই পরীক্ষা করে ঐ একই ধরণের ফলাফল পেলেন। নাইটের মত গসও বিভিন্ন বৈচিত্রের সংখ্যা গণনা করেননি। সংখ্যা তত্ব যে বংশধারানুক্রমের মূল রহস্যটি ধরে দিতে পারে তা এরা কল্পনাই করতে পারেননি।

গস এবং নাইট মটর গাছের উপর পরীক্ষায় যে ফল পেলেন অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে অন্য অনেক প্রাণীও উদ্ভিদেও অনুরূপ ফল অনেকেই পেয়েছেন, তবে সহজভাবে কোন বিশ্লেষণ করতে তাঁরা পারেননি। এর পরে অমরা উল্লেখ করতে পারি গ্রেগর জন মেণ্ডালের কথা, বংশধারানুক্রমের রহস্য যিনি সর্বপ্রথম সহজভাবে বিশ্লেষণ করেন।

গ্রেগর জন মেণ্ডাল

১৮২২ সালে মোরাভিয়ার এক কৃষক পরিবারে গ্রেগর জন মেণ্ডালের জন্ম হয়। মোরাভিয়া এখন চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি অংশ হলেও সেই সময় এই রাজ্যটি অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারীর অধীন ছিল। মেণ্ডালের বাবা এণ্টনী মেণ্ডাল বাগানের মালীর কাজ করতেন। ছেলেবেলায় জন তার বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকে বাগানের কাজেকর্মে তাঁকে সাহায্য করতেন।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মেণ্ডাল বাড়ীর কাছেই হাইনতসেনদের্ফ গ্রামের স্থানীয় স্কুলে ভর্ত্তী হলেন। এই স্কুলে সাধারণ পড়াশোনা ছাড়াও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ব্যবস্থা ছিল। হয়ত এখানেই বালক মেণ্ডালের মনে প্রথম এই চিন্তার উদয় হয় যে প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্রও অনুসন্ধিৎসার বিষয় হতে পারে। এই স্কুলের পাঠ শেষ করে মেণ্ডাল কাছাকাছি এক সেকেণ্ডারী স্কুলে ভর্ত্তী হলেন। মেণ্ডালের পারিবারিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম ছিল প্রতিনিয়ত। অনাহার ও অর্দ্ধাহারের সঙ্গে পড়াশোনার পরিশ্রম সাতবছরের বালক মেণ্ডালের শরীরে সইলনা। মেণ্ডাল কঠিন অসুখে পড়লেন। অন্তরে প্রচুর আগ্রহ সত্ত্বেও মেণ্ডালকে লেখাপড়ার কাজ সব বন্ধ করতে হল।

গ্রেগর জন মেণ্ডালের বাবা এণ্টনি মেণ্ডাল এই সময়ে এক দুর্ব্বিপাকে পড়ে নিজের ক্ষেত খামার পর্য্যন্ত বিক্রী করে দেবার মত অবস্থায় এসে পড়লেন। এই সময় এণ্টনী মেণ্ডাল কিছু সম্পত্তি তাঁর ছেলে ও মেয়ের নামে ভাগ করে আলাদা করে দেন। মেয়ে অবশ্য নিজের ভাগের অংশ ভাইয়ের পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য দিয়ে দেয়। এর পর কষ্টে স্বষ্টে চলল প্রায় চার বছর। বোনের এই ঋণ পরবর্ত্তী জীবনে মেণ্ডাল কিছুটা শোধ করে দিয়েছিলেন।

এর পর মেণ্ডালকে উপার্জনের চেষ্টা আরম্ভ করতে হল। এক শুভাকাঙ্খীর পরামর্শে মেণ্ডাল আলতক্রয়েনের আগষ্টিনীয়ন মঠে যোগ দিলেন ১৮৪৩ সালে। মাত্র ২১ বৎসর বয়সেই মেণ্ডাল স্থির করলেন যে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ

করবেন। সব সময়ের কর্মী হিসাবে তিনি মঠে যোগ দিলেন। এই সময় মেণ্ডালের জীবনে শান্তির দিন এল। খাওয়া পরার দুর্ভাবনা তাঁর আর রইল না। মঠের সংলগ্ন এক ফালি জমিতে একটি ছোট্ট বাগান ছিল। এক বৃদ্ধ পাদরীর সখের বাগান সেটি। তিনি শেষ জীবনে সেখানে ফুলের বাগান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর মেণ্ডাল ঐ বাগানটির তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন। ১৮৪৭ সালে মেণ্ডালের আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দান হল। দীক্ষান্তে তাঁর নাম হল গ্রেগর।

দীক্ষা নেবার পর মেণ্ডালকে মঠ ছেড়ে এক গ্রামের গীর্জায় কিছু দিনের জন্য কাজ নিয়ে যেতে হল। অল্প দিন পরেই আবার তিনি মঠে ফিরে এলেন। এর পর মেণ্ডেল স্থানীয় এক স্কুলে শিক্ষকতার জন্য দরখাস্ত দিলেন। স্কুল বোর্ড মনে করলেন যে নিয়মিত ক্লাশ নেবার ক্ষমতা মেণ্ডালের নেই। মেণ্ডাল স্কুল বোর্ডের কাছে পরীক্ষা দিলেন। বোর্ডের সিদ্ধান্ত হল যে প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ানোর যোগ্যতাও মেণ্ডালের নেই। মেণ্ডাল আবার পরীক্ষায় বসলেন এবং এবারও উত্তীর্ণ হতে পারলেন না।

১৮৫১ সালে মঠ থেকে মেণ্ডালকে ভীয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হল প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেণ্ডাল খুব ভাল ফল দেখাতে পারেন নি। পদার্থবিদ্যা ও গণিতে তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। ১৮৫৪ সালে তিনি ফিরে এলেন ব্রুয়েনে বিজ্ঞানের অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবে।

শিক্ষকতা ও মঠের কাজ কর্মের অবসরে মেণ্ডাল ব্যস্ত থাকতেন তাঁর সেই সখের বাগানটির পরিচর্যায়। এই এক ফালি জমিতে তিনি বিভিন্ন গাছ লাগাতেন, ফুল ফোটাতেন, তন্ময় হয়ে যেতেন প্রকৃতির রহস্যের মধ্যে।

১৮৫৭ সালে মেণ্ডাল চাষীদের কাছ থেকে মটর বীজের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। মটের সেই ছোট্ট বাগানে মেণ্ডাল সেই সব বীজ থেকে কি রকম গাছ হয়, কি রঙের ফুল হয়, তার বীজ কি রকম হয় এই সব দেখতেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বৈচিত্রের মিলনে সঙ্কর তৈরী করতেন। প্রায় সাত আট বছর ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৮৬৫ সালে মেণ্ডাল ব্রুয়েনের Natural History Societyর সামনে তাঁর গবেষণার বিষয় তুলে ধরলেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত হল, এবং ১৮৬৬ সালে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাঠান হল।

মেণ্ডেলের এই গবেষণার বৃত্তান্ত কিন্তু সেই সময় কোথাও কোন সাড়া

জাগালনা। এর প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারেন এমন কারো হাতে তা এলনা। মেণ্ডালের এই কাজকর্ম বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পত্র পত্রিকার আড়ালে চাপা রইল দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে ১৯০০ সালে তিনজন গবেষক তিন জায়গায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে গিয়ে মেণ্ডালের এই নথিপত্র আবিষ্কার করলেন। এই তিনজন হলেন হল্যাণ্ডের ডুভ্রীস, জার্মানীর করীনস্ এবং অষ্ট্রিয়ার ৎসেরমাক (De Vries, Coreans, Tshermak)।

এই তিনজন বিজ্ঞানী গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়ে দেখলেন মেণ্ডালের গবেষণা পত্রটি। মেণ্ডালের সহজ এবং কার্যকরী বিশ্লেষণপদ্ধতি তাঁদের মুগ্ধ করল। এই তিনজন বিজ্ঞানী অতীতের অন্ধকার থেকে আলোয় আনলেন মেণ্ডালকে। পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তে বহু বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর মেণ্ডালের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করা আরম্ভ হল এবং তাঁর উদ্ভাবিত নিয়মাবলী সমর্থিত হতে আরম্ভ হল। এই সাফল্য মেণ্ডাল কিন্তু তাঁর জীবনকালে দেখে যেতে পারেননি।

তাঁর গবেষণা পত্র প্রকাশের পর যখন কোথাও সাড়া জাগালনা, আশাহত মেণ্ডাল তখন অন্যান্য গাছ এবং মৌমাছি নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন এবং সেই সঙ্গে শুরু করেন আবহাওয়া তত্ত্ব নিয়ে পর্যবেক্ষণ। ক্রমশঃ মেণ্ডাল মঠের পরিচালনার কাজে খুব বেশী জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। ১৮৬৮ সালে মেণ্ডাল মঠের প্রধান নির্বাচিত হলেন। ১৮৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয় মাত্র ৬২ বছর বয়সে, বিশ্ববিখ্যাত হবার ১৬ বছর আগে।

মেণ্ডালের পদ্ধতি

মেণ্ডালের পদ্ধতি অনুসারে বংশধারার যে ইতিবৃত্ত আমরা পাই তা হল এই যে যদি বিপরীত চরিত্রের বর্ণ সঙ্কর (Hybrid) তৈয়ারী হয় তবে তার বংশধারা একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করবে।

যেমন বিশুদ্ধ শ্রেণীর (Pure Variety) সাদা খরগোস, যারা অনেক পুরুষ ধরে সাদা খরগোস হয়ে আসছে, তার সঙ্গে মিলন ঘটানো হল বিশুদ্ধ শ্রেণীর কালো খরগোসের যারা পর পর অনেক পুরুষ ধরে শুধু কালো খরগোস হয়ে আসছে। দেখা গেল এদের মিলনের ফলে যে খরগোসগুলি জন্মাবে সেগুলি সবই হল কালো। সাধারণ ধারণায় এটা কেউ আশা করেনি। মা এবং বাবা, একজন সাদা এবং একজন কালো হলে অনভিজ্ঞ জনেরা আশা করবে যে তাদের সন্তানেরা হবে সাদায় কালোয় মেশানো। কিন্তু তা হল না, হল সবগুলিই কালো তারপর এই ভাবে তৈরী কালো খরগোসদের মধ্যে মিলন ঘটালে দেখা যায় যে তাদের সন্তানদের মধ্যে তিনটি হয় কালো একটি হয় সাদা। অর্থাৎ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কালো এবং শতকরা পঁচিশ ভাগ সাদা হবার সম্ভাবনা থাকে।

কেন এমন হয়? মেণ্ডাল বললেন যখন দুইটি বিপরীত চরিত্রের সংমিশ্রণ হয় তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে কোন মিশ্র চরিত্রের সৃষ্টি করে না। একটি চরিত্র অন্যটির উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেইটিকে চেপে দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য। অর্থাৎ দুইটি পরস্পর বিপরীত চরিত্রের মধ্যে যে চরিত্রটি সবল (Dominant) সেইটির বহিঃপ্রকাশ হয় এবং যে চরিত্রটি দুর্ব্বল (Recessive) সেইটি অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ মেণ্ডালের ভাষ্য—অনুসারে বিশুদ্ধ কালো এবং বিশুদ্ধ সাদা খরগোসের মিলনের ফলে যারা জন্মাল তারা যে সকলেই কালো হল তার কারণ 'দেহের রং কালো' এই চরিত্রটি এখানে সবল (Dominant) এবং 'দেহের রং সাদা' এই চরিত্রটি এখানে দুর্ব্বল।

মেণ্ডাল আরো বললেন যে প্রত্যেক চরিত্রের জন্য জীব দেহে জোড়

সংখ্যায় কিছু পদার্থ থাকে যাদের কাজ হল জীব দেহের আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ বিন্যাস, দৈর্ঘ ইত্যাদি নির্ণয় করা। যৌন কোষে অর্থাৎ শুক্র এবং ডিম্বে (Sperm and Ovum) এই পদার্থগুলি আসে একটি করে। উভয়ের সম্মিলনে যখন নতুন জীবদেহ গঠিত হয় তখন নূতন জীবদেহে এই পদার্থগুলি একজোড়া করেই থাকে। অর্থাৎ জীবদেহের এই চরিত্র নির্ণায়ক পদার্থগুলির (Some factors) একটি পিতৃদত্ত (Paternal Origin) এবং অন্যটি মাতৃদত্ত (Maternal Origin) হয়।

এইবার দেখাযাক মেণ্ডালের এই ভাষ্য সাদা কালো খরগোসের পরীক্ষায় কিভাবে প্রয়োগ করা যায়। মনে করা যাক জীবদেহে কালো রঙের জন্য বর্ণ নির্ণায়ক পদার্থ (Colour producing factor) 'ক' আছে এবং সাদা রঙের জন্য জীবদেহে বর্ণ নির্ণায়ক পদার্থ 'খ' রয়েছে। তাহলে বিশুদ্ধ কালো খরগোসের দেহে রয়েছে একজোড়া পদার্থ অর্থাৎ ক ক, ঠিক তেমনই বিশুদ্ধ সাদা খরগোসের দেহে আছে একজোড়া পদার্থ খ খ। অর্থাৎ কালো খরগোসের যৌন কোষে একটি করে 'ক' থাকবে এবং সাদা খরগোসের যৌন কোষে একটি করে 'খ' থাকবে। এদের মিলনে যেসব খরগোসগুলি হবে সেগুলির দেহে ক ও খ এই দুই পদার্থই থাকবে। এগুলির রং আমরা দেখেছি কালো হয়। তাহলে 'ক' পদার্থটি সবল এবং খ পদার্থটি নিশ্চয়ই দুর্ব্বল।
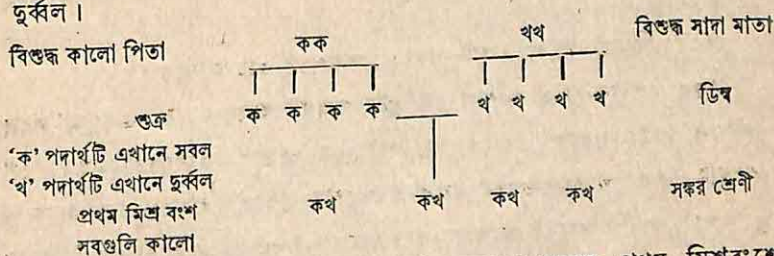
অতএব দেখা যাচ্ছে যে মেণ্ডালের ভাষ্য অনুসরণ করলে প্রথম মিশ্রবংশে সবগুলি কালো কেন হচ্ছে তার একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এদের মিলনের ফলে আবার তিনভাগ কালো এক ভাগ সাদা কেন হয় ? মেণ্ডাল বললেন যে জীবদেহে যখন বিপরীত চরিত্রের পদার্থগুলি থাকে, সেগুলি মিশে এক হয়ে যায় না আলাদাই থাকে। যেগুলি দুর্ব্বল সেগুলির কোন প্রভাব বাইরে প্রকাশিত হয় না কিন্তু পদার্থগুলি ভিতরে কর্মক্ষম অবস্থায়ই গোপন থাকে। যদি কোথাও কোন সম্ভাবনা আসে অর্থাৎ

প্রতিরোধ করবার মত সবল কোন পদার্থ না থাকে তাহলে এই দুর্ব্বল পদার্থ-গুলির প্রভাব ও বাইরে প্রকাশিত হয়। এই ভাষ্যটি সহজে বোঝা যাবে সঙ্কর শ্রেণীর খরগোসের মিলনের ফলাফল দেখলে।
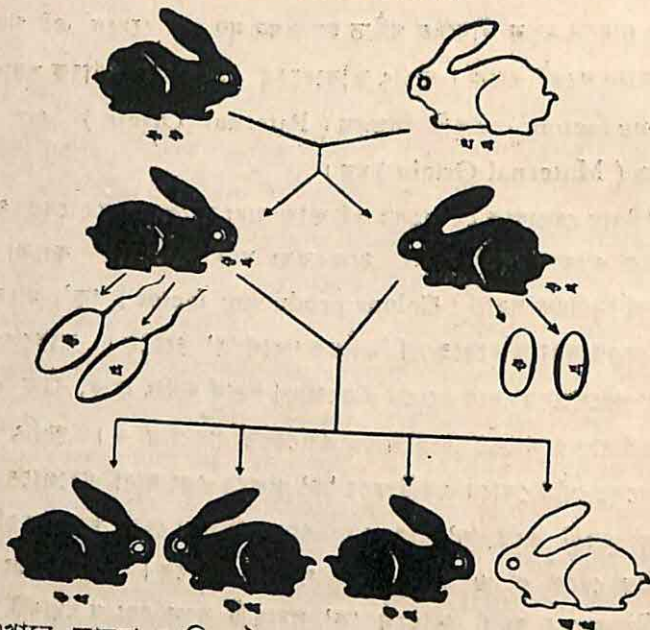
এখানে আমরা দেখছি যৌন কোষ দুরকমের হবে। এদের মিলন এই ভাবে হ'তে পারে।

অর্থাৎ তিনটি কালো একটি সাদা। অনুপাত ৩:১ আসছে।

সঙ্কর শ্রেণীর দেহে ক ও খ এই দুই পদার্থই আছে। ক এখানে সবল সেইজন্য বাইরে থেকে এরা কালো, 'খ' এর প্রভাব কার্যাকরী নয়। খ পদার্থটি কিন্তু আলাদাভাবেই থাকে এবং যৌন কোষ বিভাগের সময় ক ও খ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই আলাদা হয়ে যেতে (free segregation) পারে এর ফলে যৌনকোষ হয় দুরকমের।

দ্বিতীয় মিশ্র বংশে আমরা কালো ও সাদা ৩:১ অনুপাতে পেলাম। এই দ্বিতীয় মিশ্র বংশের প্রাণীগুলির প্রকৃতি কি? এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে তিনটি কালোর মধ্যে একটিতে আছে 'ক ক' অর্থাৎ এইটি বিশুদ্ধ কালো। যদি বিশুদ্ধ কালো শ্রেণীর সঙ্গে এর মিলন হয় তাহলে এর সন্তান সবগুলিই বিশুদ্ধ কালোশ্রেণীর হবে। এখানে 'খ' পদার্থ নেই বলে সাদা রং আসার কোন সম্ভাবনাই নেই।

অন্য দুটি কালোতে আছে 'ক' 'খ'। এরা বিশুদ্ধ কালো নয় এরা সঙ্কর (Hybrid) শ্রেণীর। সাদা রং নির্ণায়ক পদার্থ 'খ' এখানে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে, যেখানে সম্ভব হবে এই সাদা রং প্রকাশ পাবে। এদের মিলন যদি বিশুদ্ধ সাদা (খ খ) অথবা সঙ্কর শ্রেণীর (ক খ) সঙ্গে হয় তাহলে ঐ অপ্রকাশিত পদার্থ 'খ' এর প্রভাব কোন কোন সন্তানের দেহে প্রকাশ পাবে।

দ্বিতীয় মিশ্র বংশের সাদা খরগোসটি বিশুদ্ধ শ্রেণীর। সেখানে সাদা ছাড়া অন্য কোন রং নির্ণায়ক পদার্থ নেই। যদি বিশুদ্ধ সাদা শ্রেণীর সঙ্গে এদের মিলন হয় তাহলে এদের সন্তানেরা সকলেই সাদা হবে।

মেণ্ডাল তাঁর পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করেছিলেন মটর গাছের (Pissum Sativum) বিভিন্ন চরিত্র। আমরা এখানে দেখালাম প্রাণী দেহের উদাহরণে। মেণ্ডাল এই ৩ : ১ অনুপাত পেয়েছিলেন একটি মাত্র চরিত্র ও তার বিপরীত চরিত্রের সঙ্কর করে। যেমন লাল ফুল ও সাদা ফুল অথবা লম্বা গাছ ও বেঁটে গাছ ইত্যাদি। সর্বত্রই দ্বিতীয় মিশ্র বংশে এই ৩ : ১ অনুপাত আসে। অর্থাৎ সবল চরিত্রের প্রকাশ শতকরা পঁচাত্তর ভাগে এবং দুর্বল চরিত্রের প্রভাব শতকরা পঁচিশ ভাগে।

এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে তিনটি কালোর মধ্যে একটিতে আছে 'ক ক'। অর্থাৎ এইটি বিশুদ্ধ কালো। যদি বিশুদ্ধ কালোর সঙ্গে এর মিলন হয় তাহলে এর পরবর্ত্তী সকল সন্তান সন্ততীরা কালো হবে। অন্য দুইটি কালোতে আছে 'ক খ'। এরা কিন্তু বিশুদ্ধ কালো নয়। সাদা রঙ নির্ণায়ক পদার্থ খ এখানে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। বিশুদ্ধ সাদা (খ খ শ্রেণীর) অথবা মিশ্র কালো (ক খ শ্রেণীর) শ্রেণীর সঙ্গে মিলনে এই অপ্রকাশিত সাদা রঙটি প্রকাশিত হতে পারবে। আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে জীবদেহে বিভিন্ন চরিত্র নির্ণায়ক পদার্থ যে জোড় সংখ্যায় থাকে তার একটি মাতৃদত্ত এবং অপরটি পিতৃদত্ত।

জীবদেহ বহু বিভিন্ন চরিত্রের সমষ্টি। প্রতি চরিত্রেরই নিজস্ব ধারানুক্রম আছে। মেণ্ডাল একটি চরিত্র ও তার বিপরীত গুণের বংশানুক্রম বিশ্লেষণের সাফল্যের পর কাজ করলেন একাধিক চরিত্র তার বিপরীত গুন নিয়ে। এইবার দেখা গেল দ্বিতীয় মিশ্রবংশে সম্ভাব্যতার সংখ্যা আরো বেশী এবং নূতন এক অনুপাত পাওয়া যাচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক কালো দেহ ও লাল চোখ একটি খরগোস, যারা বংশানুক্রমিক ভাবে কালো দেহ ও লাল চোখ হয়ে আসছে। এর সঙ্গে মিলন করা হল একটি সাদা দেহ ও বাদামী চোখ খরগোসের যারা বংশানুক্রমিক ভাবে সাদা দেহ ও বাদামী চোখ হয়ে আসছে। এদের মিলনের ফলে যে খরগোসগুলি হল (অর্থাৎ প্রথম মিশ্র বংশ) সেগুলি সবই কালো দেহ ও লাল চোখ হল। অর্থাৎ দেহের কালো রং এবং চোখের লাল রং এই চরিত্র দুটি সবল (**Dominant**) চরিত্র। মনে করা যাক কালো রং নির্ণায়ক পদার্থ 'ক', সাদা রং নির্ণায়ক পদার্থ 'খ' লাল রং নির্ণায়ক পদার্থ 'গ' এবং বাদামী রং নির্ণায়ক পদার্থ 'ঘ' আছে। তাহলে লাল চোখ ও কালো দেহ খরগোস হবে 'ক ক গ গ' প্রকৃতির এবং সাদা দেহ বাদামী চোখ খরগোসেরা হবে 'খ খ ঘ ঘ' প্রকৃতির। কালো দেহ ও লাল চোখ খরগোসের যৌনকোষে ক ও গ পদার্থ থাকবে একটি করে। সাদা দেহ ও বাদামী চোখ খরগোসের যৌনকোষে খ ও ঘ পদার্থ থাকবে একটি করে। প্রথম মিশ্র বংশের প্রাণীদের দেহে থাকবে ক খ গ ও ঘ এই চারটি পদার্থই। সেই জন্য প্রথম মিশ্র বংশে সবগুলি হবে কালো দেহ ও লাল চোখ কারণ 'ক' পদার্থটি খ এর প্রভাব প্রতিরোধ করবে এবং গ পদার্থটি ঘ এর প্রভাব প্রতিরোধ করবে যেহেতু ক ও গ সবল (**Dominant factor**) পদার্থ।

এর পরে মিলন করা হল প্রথম মিশ্র বংশের একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী খরগোসের মধ্যে। প্রথম মিশ্র বংশের প্রাণী গুলির যৌন কোষ হবে চার প্রকার। শুক্র ও ডিম্ব কোষের মিলনের ফলে সম্ভাব্য মিশ্রণ পাওয়া যাবে ষোলটি।

দ্বিতীয় মিশ্র বংশে দেখা গেল সবল চরিত্র দুটি আসছে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় এবং দুর্বল চরিত্র দুটি আসছে সবচেয়ে কম সংখ্যায়। উভয়ের মিশ্রণ আসছে এই দুইয়ের মাঝামাঝি। দেখা যাচ্ছে যে মেণ্ডালের বিশ্লেষণ এখানেও কার্যকরী। এখানে দ্বিতীয় মিশ্রবংশে ফলাফল আসছে ৯ : ৩ : ৩ : ১ অনুপাতে, আগের মতন ৩ : ১ অনুপাত নয় তার কারণ এখানে বিপরীত ধর্মের চরিত্র দুই জোড়া। যেখানেই দুই জোড়া বিপরীত প্রকৃতির চরিত্র নিয়ে কাজ করা হবে সেখানেই এই ৯ : ৩ : ৩ : ১ অনুপাত আসবে। চরিত্র সংখ্যা এর বেশী হলে আবার ভিন্ন অনুপাত আসবে।

শুক্র ও ডিম্বকোষের মিলন নির্ভর করে সুযোগের (**chance**) উপর। যে

কোনটির সঙ্গে যে কোনটির মিলন হতে পারে। মেণ্ডালের হিসাবে কতরকমের মিলন সম্ভব সেইটাই দেখান হয়েছে। এই তথ্য মেণ্ডাল নির্ণয় করেন মটর গাছের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে তাঁর নিজের পরীক্ষার ফলাফল থেকে।
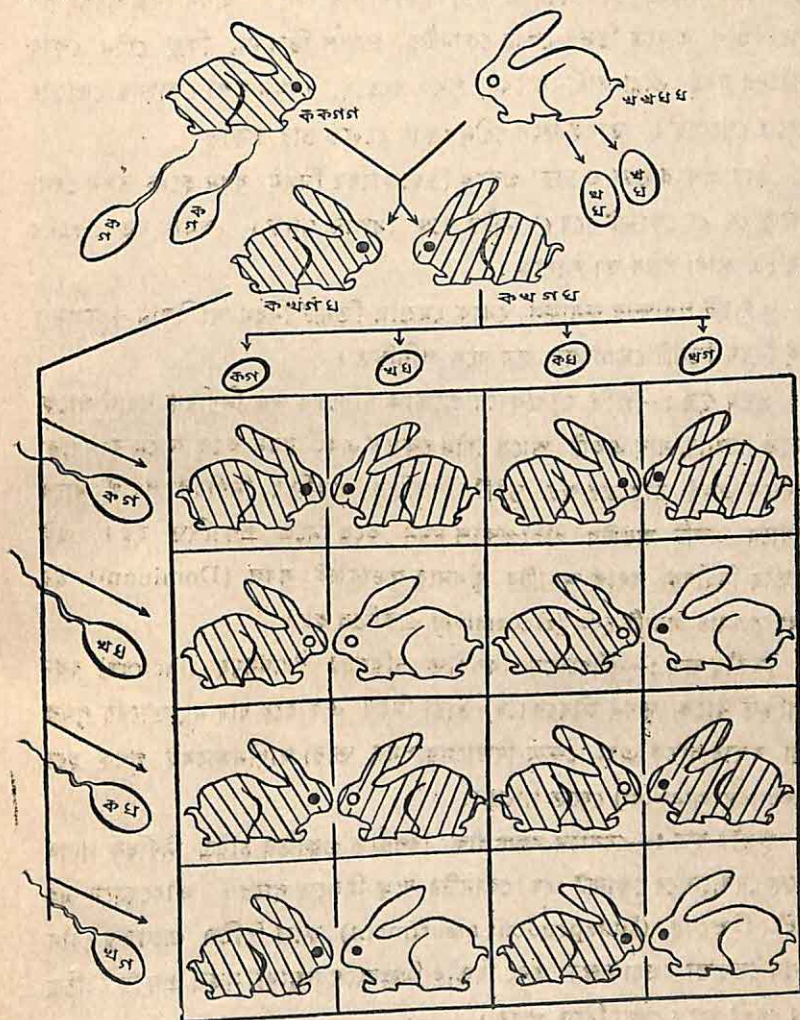
এখানে আরো দেখা যাচ্ছে যে একাধিক চরিত্রের সমাবেশে নির্ণয়াক পদার্থ সমূহের যতরকমে সম্ভব মিশ্রণ হয়। অর্থাৎ তারা যেন স্বাধীনভাবে মেলামেশা করতে পারে। অবস্থা বিশেষে এদের নিজস্ব সত্বা অপ্রকাশিত থাকতে পারে কিন্তু কোথাও এই পদার্থগুলির পৃথক সত্বা নষ্ট হয়ে যায় না।

পৃথক সত্বা বজায় থাকে বলেই এই পদার্থগুলি পরে আলাদা হয়ে যেতে পারে। যেমন এখানে চোখের রং লাল তার সঙ্গে কখনো এসে মিলেছে গায়ের সাদা রং কখনো গায়ের কালো রং। চোখের রং যেখানে বাদামী সেখানেও গায়ের রং কোথাও সাদা কোথাও কালো। প্রথম মিশ্রবংশে সব পদার্থগুলি একত্রে ছিল, কোন কোনটির প্রকাশ ছিল না, কিছু যৌন কোষ গঠনের সময় তারা স্বাধীনভাবেই পৃথক হয়েছে, যেমন খুশী জোড়ায় জোড়ায় যেতে পেরেছে। তারই ফলে যৌন কোষ হয়েছে চার প্রকার।

চার প্রকার শুক্র ও চার প্রকার ডিম্বকোষের মিলন যখন হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে যে কোনটি যে কোনটির সঙ্গে মিলতে পারে। অর্থাৎ যত রকমের বৈচিত্র আসা সম্ভব তা আসছে।

এই দুই পরীক্ষার ফলাফল থেকে মেণ্ডাল তিনটি নিয়ম আবিস্কার করলেন। এই নিয়ম তিনটি মেণ্ডালের সূত্র বলে পরিচিত।

প্রথম সূত্র :—প্রতি জীবকোষে প্রত্যেক চরিত্রের জন্য নির্ণায়ক পদার্থ থাকে জোড় সংখ্যায়, যার একটি আসে যৌন কোষে এবং বহন করে আনে বংশধারা যেখানে একই চরিত্রের জন্য দুইটি বিপরিত প্রকৃতির নির্ণায়ক পদার্থ থাকে সেখানে একটি অন্যটির বহিঃপ্রকাশ দমন করে নিজে প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় নির্ণায়ক পদার্থ অন্যটির তুলনায় স্বভাবতই সবল (Dominant) হয় এবং তুলনায় অন্যটি দুর্বল (Recessive) প্রকৃতির হয়।

দ্বিতীয় সূত্র :—জীবদেহে বিপরীত চরিত্রের পদার্থসমূহ (factors) যখন উপস্থিত থাকে তখন জীবকোষে তারা মিশে এক হয়ে যায় না, তাদের পৃথক সত্বা বজায় থাকে এবং কোষ বিভাগের সময় তারা স্বাধীনভাবেই পৃথক হয়ে (free segregation) যেতে পারে।

তৃতীয় সূত্র :—যেখানে বহুসংখ্যক বিপরীত প্রকৃতির চরিত্র নির্ণায়ক পদার্থ থাকে সেখানে যে কোনটি যে কোনটির সঙ্গে মিলতে পারে। জীবকোষে এই স্বাধীন মিশ্রণের (Independent assortment) ফলে বিভিন্ন প্রকৃতির যৌন কোষ তৈয়ারী হওয়া সম্ভব এবং দ্বিতীয় মিশ্রবংশে সম্ভাব্য সকল প্রকার বৈচিত্র কম বেশী হারে দেখা দিতে পারে।

মেণ্ডালের এই পরীক্ষাগুলি থেকে আমরা যে বংশধারাক্রমের একটি সহজ বিশ্লেষণ ও বংশানুক্রমের জটিল প্রকাশকে সহজ নিয়মে বাঁধবার মত কতকগুলি সূত্র পাই তাই নয় এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করি। বাইরে

থেকে দেখে যা মনে হয়, প্রাণী বা উদ্ভিদের সত্য পরিচয় তা নাও হতে পারে। যেমন বাইরে থেকে দেখতে কালো এমন খরগোস দুই প্রকৃতির হতে পারে একটি 'কক' শ্রেণীর অন্যটি কখ শ্রেণীর। বাইরে থেকে দেখতে এই দুইয়ে কোন প্রভেদ নেই। বংশধারা অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই এই দুইয়ে প্রভেদ অনেক। কক শ্রেণীর কালো খরগোসটি বিশুদ্ধ কালো (Pure variety) জাতের কারণ বর্ণ নির্ণায়ক পদার্থ এর দেহে যা আছে তা শুধু কালো রং প্রকাশের জন্যই। যতদিন সমশ্রেণীর কালোর সঙ্গে (Genetically same) এর মিলন হবে ততদিন এর বংশধারায় কালো ছাড়া অন্য রং দেখা দেবে না। কখ শ্রেণীর খরগোসটি কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে কালো হলেও সাদা রং নির্ণায়ক পদার্থতার দেহে সুপ্ত আছে। সমশ্রেণীর সঙ্গে অর্থাৎ 'কখ' শ্রেণীর সঙ্গে এর মিলনে এর সন্তানেরা শতকরা পঁচিশ ভাগ হবে সাদা। অর্থাৎ কখ শ্রেণীর খরগোসটি সঙ্কর অথবা অবিশুদ্ধ অথবা মিশ্র (Hybrid) প্রকৃতির।

তাহলে আমরা দেখছি যে কোন কোন প্রাণীর বাইরের এবং ভিতরের প্রকৃতি এক যেমন কক শ্রেণীর কালো খরগোস। এদের বলা যেতে পারে অন্তর্লীন (Genotype) কালো। কোন কোন প্রাণীর বাইরের প্রকাশ ও ভিতরের প্রকৃতি এক নাও হতে পারে যেমন কখ শ্রেণীর কালো খরগোস। এদের বলা যেতে পারে বহিঃপ্রকাশ (Phenotype) কালো। অতএব উত্তরাধিকার তত্ত্বে কোন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে কোন সিদ্ধান্তে আসা নির্ভুল হবেনা ; লক্ষ্য করা প্রয়োজন তার অন্তর্লীন প্রকৃতির।

অসম্পূর্ণ প্রভাব

মেণ্ডালের পদ্ধতি পুনরাবিষ্কারের পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞানীরা এর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগ আরম্ভ হল বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজননে। অনেকেই সমর্থন এবং অভিনন্দন জানালেন মেণ্ডালের কর্ম্মপদ্ধতিকে। বংশধারানুক্রমের যে রহস্য এতকাল দুর্ব্বোদ্ধ এবং জটিল বলে মনে হয়েছে এখন মনে হল তা অতি সহজ বিষয় এবং মেণ্ডাল এই রহস্যের মূল কারণ বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন অতি সহজে। কিন্তু একদল আবার তা সমথন করতে পারলেন না। তাঁরা বললেন মেণ্ডালের পদ্ধতি মত ফল তাঁরা পাচ্ছেন না। বেটিসন, পানেট, সণ্ডার্স ইত্যাদিরা (Bateson, Punnet, Saunders) এঁদের মধ্যে অন্যতম। মেণ্ডালের পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে না এমন উদাহরণ একটা দুটো করে অনেক এসে পড়তে লাগল। ১৯০৫ সালে বেটিসন পানেট এবং সণ্ডার্স দেখালেন যে আন্দালেসিয়ান মোরগ (Andalesion fowl :—Gallus Domesticus) নামে যে নীলচে ধুসর রঙের মোরগ পাওয়া যায় সেগুলি আসলে সাদা ও কালো মোরগের সঙ্কর। মেণ্ডালের সূত্র অনুসারে সাদা ও কালোর প্রজননের ফলে আমরা কালো অথবা সাদা যে চরিত্রটি প্রবল (Dominant) সেইটাই পাব প্রথম মিশ্র বংশে। অন্য কোন চরিত্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যা মেণ্ডালের সূত্রে নেই।

মেণ্ডালের সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা চলে না এমন উদাহরণ উদ্ভিদেও অনেক পাওয়া গেল যেমন লাল ফুল দেয় এমন বিশুদ্ধ শ্রেণীর সঙ্গে সাদা ফুল দেয় এমন বিশুদ্ধ শ্রেণীর মিলনের ফলে মেণ্ডালের পদ্ধতির ব্যতিক্রম হয়ে প্রথম মিশ্র বংশে সবগুলি হল গোলাপী ফুল দেয় এমন গাছ। এখানে নতুন কোন চরিত্র আশা করা যায়নি। এই ধরণা ছিল যে হয় লাল নয় সাদা যে রংটি এখানে প্রবল (Dominant) সেইটি প্রকাশিত হবে প্রথম মিশ্র বংশে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে দুইয়ের মাঝামাঝি একটা রং এসেছে। ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই মেণ্ডালের মূল নিয়মের বাইরে চলে গেল। মেণ্ডালের নিয়মে গুণ নির্ণায়ক পদার্থগুলি (factors) কখনই একটার সঙ্গে আর একটা মিশে যায় না। বিপরীত গুণের হলে একটি সুপ্ত থাকে, যেটি দুর্ব্বল (Recessive) চরিত্রের। যেমন এর আগে আমরা দেখেছি যে কালো ও সাদা বর্ণ নির্ণায়ক পদার্থ ক এবং খ যেখানে একসঙ্গে এসেছে সেখানে 'খ' দুর্ব্বল বলে সাদা রং প্রকাশ পায়নি, সুপ্ত ছিল। ক প্রবল

বলে খ এর উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে প্রকাশ হতে দেয়নি, নিজে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেও প্রথম মিশ্র বংশে সাদা কালো মিশিয়ে কোন রং আসেনি। তাহলে এমন সন্দেহ করা যেতে পারে যে মেণ্ডালের পদ্ধতি সব জায়গায় যে চলবে তা নয়, কোথাও কোথাও তা অচল। তখন সর্ব্বত্র ব্যাপক ভাবে পরীক্ষা আরম্ভ হল মেণ্ডালের পদ্ধতি নিয়ে। দেখা গেল দ্বিতীয় মিশ্র বংশেও প্রত্যাশিত ফলাফল আসছে না, ভিন্ন অনুপাতে আসছে। যেমন—
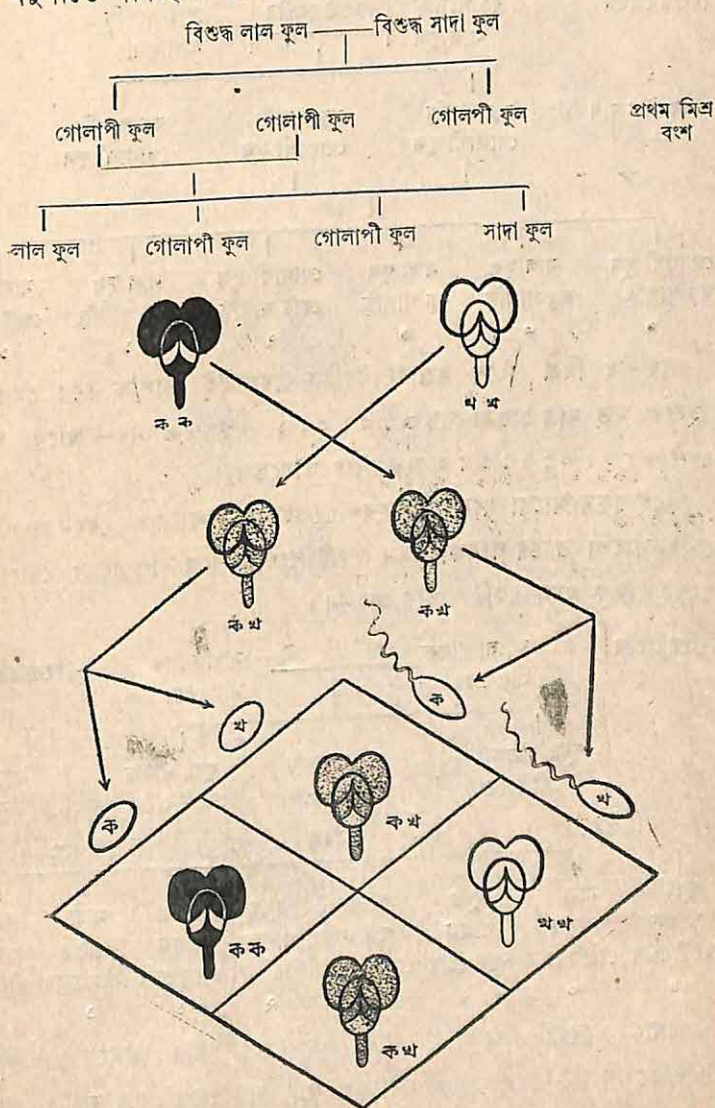
এখানে পাওয়া গেল নতুন অনুপাত ১ : ২ : ১, একটি লাল, দুইটি গোলাপী ও একটি সাদা। এখানে মাত্র একটি চরিত্র (অর্থাৎ লাল ফুল) ও তার বিপরীত গুন নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেল যে দুই বা তার বেশী চরিত্র নিয়েও এই ধরণের ফল পাওয়া যায় যা মেণ্ডালের পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না। যেমন—
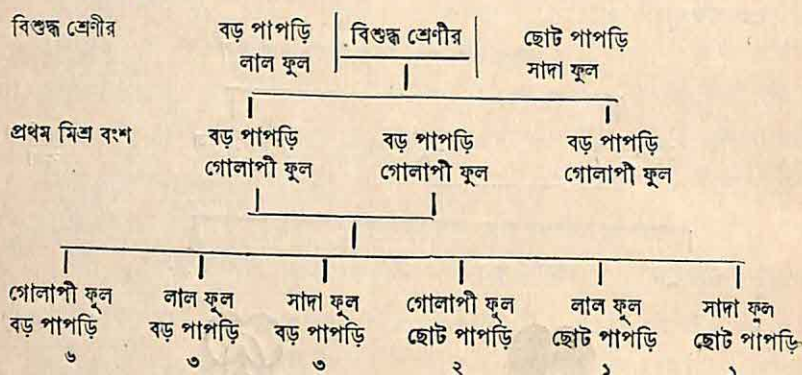
দ্বিতীয় মিশ্র বংশে সম্ভাব্য বৈচিত্র ষোলটিই আসছে তবে মেণ্ডালের হিসাব মত মাত্র চার প্রকার ৯ : ৩ : ৩ : ১ অনুপাতে নয়—আরো অনেক বেশী ৬ : ৩ : ৩ : ২ : ১ : ১ অনুপাতে আসছে।

এই রকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন লাল রঙের চোখ, কালো রঙের পালক এমন একটি পাখীর সঙ্গে নীল রঙের চোখে সাদা রঙের পালক এমন একটি পাখীর প্রজনন।
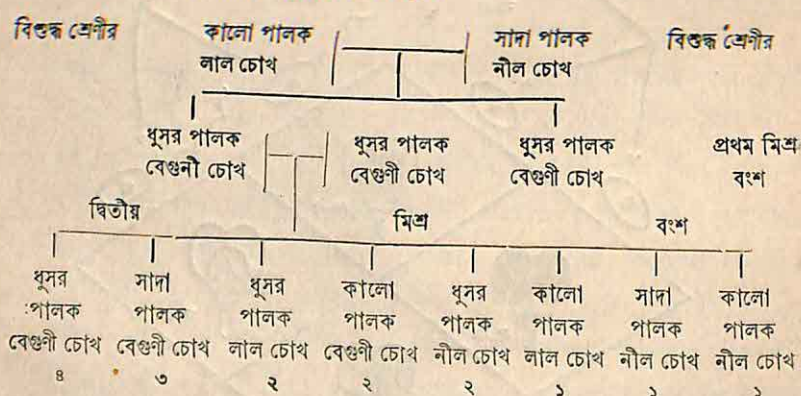
এখানেও দেখা গেল আবার আর এক রকম হিসাব আসছে যা আগের কোনটার সঙ্গেই মেলেনা। এখানেও তাহলে মেণ্ডালের পদ্ধতি অচল।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল, মেণ্ডালের পরীক্ষায় কি কোন ভুল ছিল ? আবার দেখা হল মটর ফুল ও গাছ (Pissum Sativum) নিয়ে পরীক্ষা করে, যার উপর মেণ্ডাল তাঁর পরীক্ষা করেন। দেখা গেল সেখানে ফলাফল আসছে
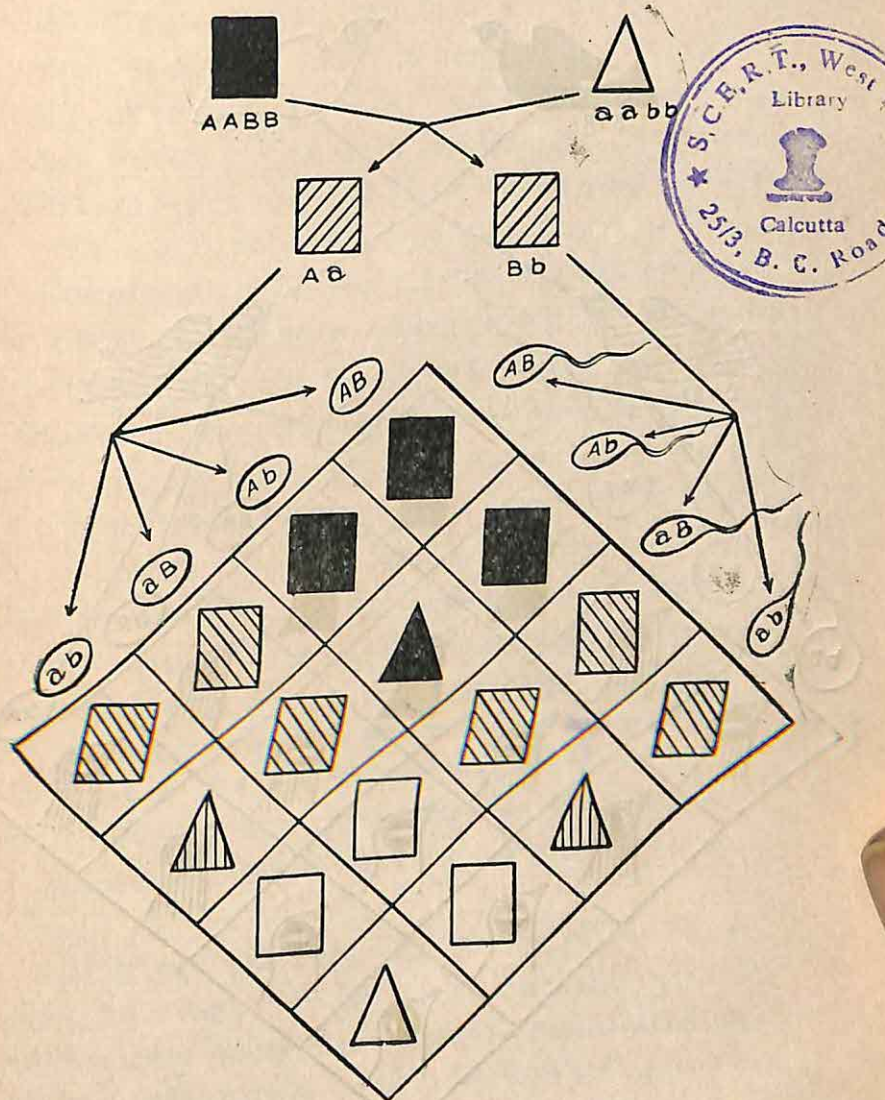
মেণ্ডালের নিয়ম অনুযায়ী। শুধু সেখানেই নয় আরো অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদেও ঐ নিয়ম অনুযায়ী ফল পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে ত মেণ্ডালের পদ্ধতি

একেবারে ভুল নয়। তবে সর্বত্র যে মেণ্ডালের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে তা নয়। ১৯০০ সালে মেণ্ডালের পদ্ধতি পুনরাবিষ্কারের পর হঠাৎ যে আলোড়ন উঠেছিল মেণ্ডালকে নিয়ে এইবার তা স্তিমিত হয়ে এল। অনেকের মনে এই
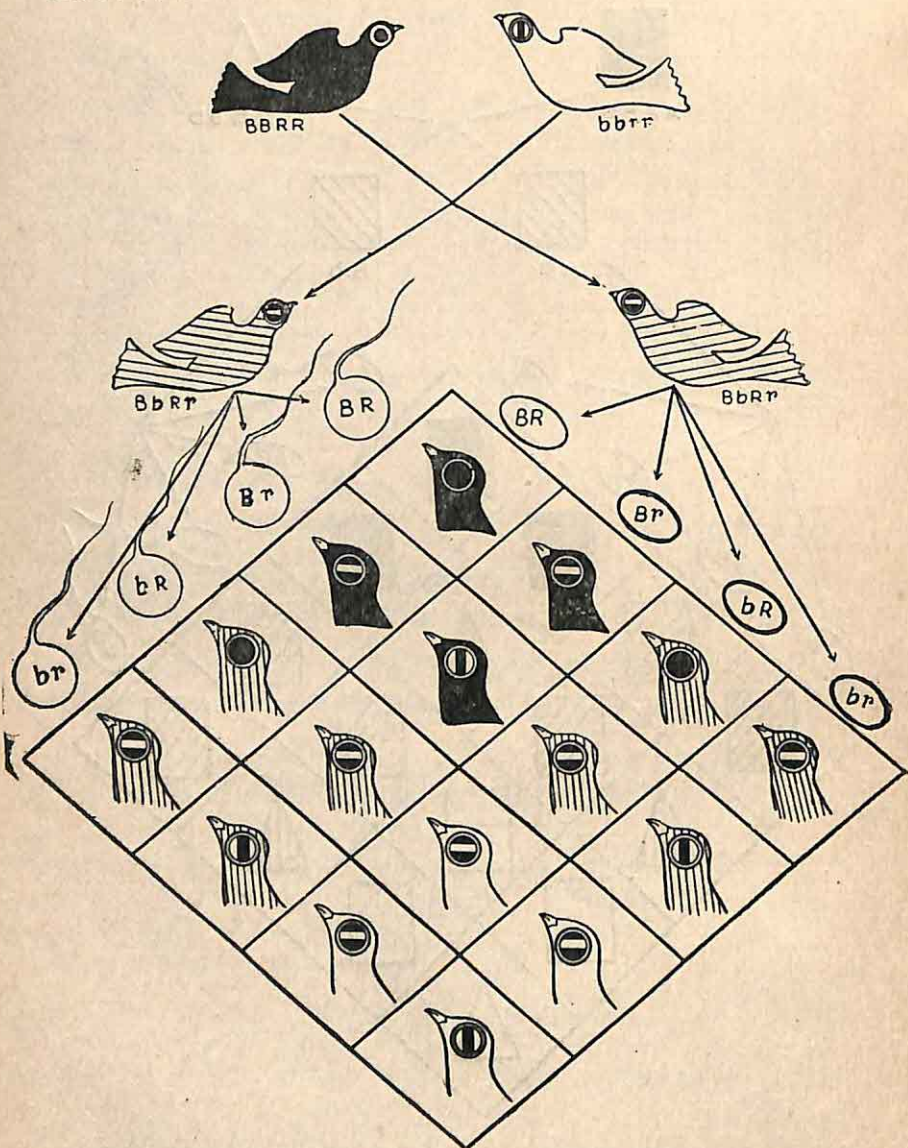
ধারণা হল যে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় মেণ্ডালের পদ্ধতি এখন খুবই সেকেলে এবং খুবই সীমাবদ্ধ তার প্রয়োগ।

যেখানে মেণ্ডালের পদ্ধতি অচল সেখানে প্রথম মিশ্রবংশে যে মিশ্র চরিত্রের উদ্ভব হচ্ছে তার কারণ কি? সত্যিই কি গুণ নির্ণায়ক পদার্থগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না? তারা কি পরস্পর মিশে যায়? তাই যদি হয় তাহলে কোথাও কোথাও আবার মেণ্ডালের সূত্র অনুযায়ী প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় কেন? এই সব পরীক্ষার ফলাফল দেখে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে চরিত্র নির্ণায়ক পদার্থগুলি আলাদাই থাকে, মিশে যায়না, তবে এই সব উদাহরণ-গুলিতে একটি চরিত্র আর একটি চরিত্রের উপর পূর্ণপ্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। প্রবল চরিত্রের প্রভাব পুরোপুরি কার্যকরী নয়। **(Dominance is incompleate)** এখানে। অতএব মেণ্ডালের প্রথম সূত্রটি এখানে অচল। প্রথম উদাহরণ ছিল লাল ফুল ও সাদা ফুলের প্রজননে তৈরী সঙ্কর শ্রেণীর গোলাপী ফুল। লাল রং এখানে সাদা ফুলের উপর অসম্পূর্ণ প্রভাবী **(Incompleately Dominent)** সেজন্য প্রথম মিশ্র বংশে যেখানে সবগুলিতেই লাল ও সাদা দুই রঙেরই নির্ণায়ক পদার্থ আছে সেখানে সব গোলাপী হবে কারণ সাদা রং ও কিছুটা প্রকাশ পাবে লালের সঙ্গে। এর পর দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ১ : ২ : ১ অনুপাত কেন এল তার বিশ্লেষণ করা কঠিন কাজ নয়। যদি লাল রঙের জন্য নির্ণায়ক পদার্থ 'ক' থাকে এবং সাদা রঙের জন্য নির্ণায়ক পদার্থ থাকে 'খ' তাহলে প্রথম মিশ্র বংশে যেখানে সব গোলাপী ফুল দেয়, সেগুলি 'কখ' শ্রেণীর। দ্বিতীয় মিশ্র বংশে যেখানে 'কক' প্রভৃতি সেখানে ফুলের রং লাল; যেখানে 'খখ' শ্রেণীর সেখানে ফুলের রং সাদা এবং যেখানে কখ প্রকৃতির সেখানে ফুলের রঙ গোলাপী। মেণ্ডালের পদ্ধতি অনুসারে কখ শ্রেণীর সব গুলিই লাল হত কারণ মেণ্ডাল পেয়েছেন সবল চরিত্র দুর্বল চরিত্রের উপর পূর্ণ প্রভাবশালী এবং তাহলেই আগেকার অনুপাতে ফলাফল পাওয়া যেত।

দ্বিতীয় উদাহরণে দুইটি চরিত্র ও তার বিপরীত গুণ নিয়ে কাজ করা হয়েছে। এখানে একটি চরিত্র ফুলের লাল রং তার বিপরীত অর্থাৎ সাদা রঙের উপর অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী **(Incomleately Dominent)** ফলে সঙ্কর শ্রেণীর (কখ প্রকৃতির) ফুলের রং গোলাপী। কিন্তু অন্য চরিত্রটি অর্থাৎ ফুলের বড় পাপড়ি আর বিপরীত অর্থাৎ ছোট পাপড়ি এই চরিত্রের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে, এবং তার বহিঃপ্রকাশকে সম্পূর্ণ দমন করে, **(Compleate Dominance)**, ফলে সঙ্কর শ্রেণীর (গঘ প্রকৃতির) ফুলের পাপড়ি বড়; এই

উদাহরণে অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী চরিত্র থাকার জন্য দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ৯ : ৩ : ৩ : ১ অনুপাতের পরিবর্তে ৬ : ৩ : ৩ : ২ : ১ : ১ এই অনুপাত এল।

তৃতীয় উদাহরণেও দুইটি চরিত্র ও তার বিপরীত গুণ নিয়ে কাজ করা হয়েছে। এখানে পালকের কাল রং এবং চোখের লাল রং এই দুই চরিত্রই এদের বিপরীত গুণ অর্থাৎ পালকের সাদা রং এবং চোখের নীল রঙের উপর অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী। সেইজন্য সঙ্কর শ্রেণীতে পালকের রং ধূসর কারণ কাল ও সাদা এই দুই রংই কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। ঐ একই কারণে সঙ্কর শ্রেণীর পাখীর চোখের রং বেগুনী কারণ লাল ও নীল এই দুই রংই কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। এখানে দুইটি চরিত্রই অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী (Incomplete Dominance) ফলে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে এর অনুপাত আবার অন্য রকম এল।

১৯০৫ সালে বেটিসন (Bateson), সণ্ডার্স (Saunders), পানেট (Punnett) ইত্যাদি প্রথম দেখালেন মেণ্ডালের পদ্ধতির ব্যতিক্রম এই অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী চরিত্রের উদাহরণ দিয়ে। এর পর এই ধরণের আরো অনেক উদাহরণ পাওয়া গেল এবং এঁদের বক্তব্যের যথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। মেণ্ডালের তথ্যাবলীর পুনরাবিষ্কারের পর বংশানুক্রমিকতা (Heredity) সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ এত প্রবল হল যে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হল। ১৯০৯ সালে বেটিসন (Bateson 1909) প্রায় দুইশত উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশধারার ইতিবৃত্ত প্রকাশ করলেন।

বেটিসন, পানেট ইত্যাদিরা অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের সঙ্গে গৃহপালিত মোরগের উপরও কিছু পরীক্ষা করেন। এর ফলে পাওয়া গেল আরো কিছু নূতন তথ্য যা আমরা আলোচনা করব পরবর্ত্তী অধ্যায়ে।

বিপরীত গুণনির্ণায়ক পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গৃহপালিত মোরগের উপর পরীক্ষা করতে গিয়ে বেটীসন এবং পানেট (**Bateson & Punnet**) এক আশ্চর্য্য ঘটনার সাক্ষী হলেন। মোরগের মাথার ঝুটি দুই রকম হয় গোলাপী ঝুটি (**Rose**) এবং মটরাকৃতি (**Pea**) ঝুটি। এই দুই চরিত্রের বিশুদ্ধ শ্রেণীর মোরগ এবং মুরগীর মিলনের ফলে দেখা গেল প্রথম মিশ্র বংশে সবগুলির মাথার ঝুটি এক নূতন আকৃতির হল যা গোলাপী ঝুটি (**Rose**) নয় এবং মটরাকৃতি ও (**Pea**) নয়, দেখতে অনেকটা আখরোট বাদামের মত। এই নতুন ঝুটির নাম দেওয়া হল বাদাম ঝুটি (**walnut**) কারণ এই নুতন ঝুটির আকৃতি আখরোট বাদামের মত। প্রথম মিশ্র বংশের এই ফলাফল বিজ্ঞানী-দের আবার সমস্যায় ফেলল। প্রথমতঃ মেণ্ডালের নিয়ম এখানে চলছেনা।

দ্বিতীয়তঃ মেণ্ডালের একটি নিয়মের কিছু সংস্কার করা হয়েছে যে প্রথম মিশ্র বংশে অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী পদার্থ (**Incompletely dominent factors**) মিশ্র রূপ দেবে, সে ব্যাখ্যাও এখানে অচল।

এর পর প্রথম মিশ্র বংশের স্ত্রীপুরুষের মিলনের ফলে যে দ্বিতীয় মিশ্র বংশ এল তার ফল হল আরো অদ্ভুত। দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ৯:৩:৩:১ অনুপাত এল। অর্থাৎ স্পষ্টই বোঝা গেল যে গোলাপী ঝুটি ও মটরাকৃতি ঝুটি (Rose and Pea Comb) এদের প্রত্যেকের জন্য দায়ী একটি করে নয় এক জোড়া করে নির্ণায়ক পদার্থ। তাছাড়া দ্বিতীয় মিশ্র বংশে আর একটি নূতন ধরণের ঝুটি দেখাগেল যা আকারে খুব বড় এবং অন্য তিনটি ধারার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এই নূতন ঝুটি আসছে সবচেয়ে কম হারে এবং এর নামকরণ করা হল একক (Single) ঝুটি। দ্বিতীয় মিশ্র বংশে অনুপাত এল বাদাম ঝুটি (walnut) সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ নয়টি, গোলাপী ঝুটি (Rose) তিনটি, মটরাকৃতি ঝুটি (Pea) তিনটি এবং নূতন চরিত্র একক ঝুটি (Single) সবচেয়ে কম অর্থাৎ একটি। সবশুদ্ধ মোট ষোলটি সম্ভাবনা।
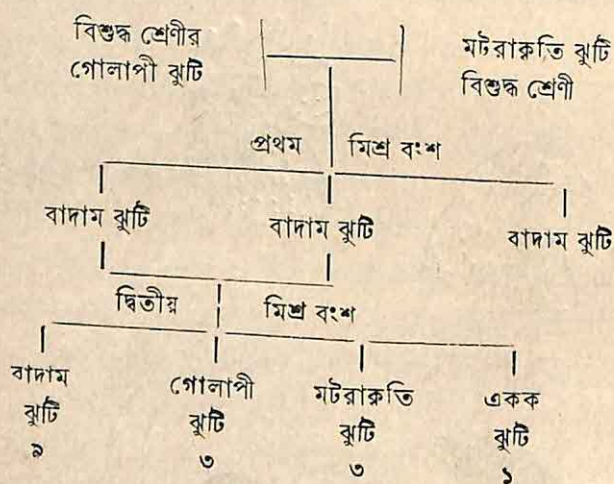
এইবার দেখাযাক নির্ণায়ক পদার্থের বিন্যাস কিরকম হলে এই ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। ধরা যাক নির্ণায়ক পদার্থ A গোলাপী ঝুটির জন্য দায়ী এবং নির্ণায়ক পদার্থ B মটরাকৃতি ঝুটির জন্য দায়ী। তাহলে বিশুদ্ধ গোলাপী ঝুটির প্রকৃতি হচ্ছে AA bb শ্রেণীর। এখানে b এই পদার্থটি মটরাকৃতি ঝুটি এই চরিত্রের অনুপস্থিতি বোঝাচ্ছে। বিশুদ্ধ মটরাকৃতি ঝুটির প্রকৃতি হচ্ছে BB aa শ্রেণীর। এখানে a এই পদার্থটি গোলাপী ঝুটি এই চরিত্রের অনুপস্থিতি নির্দেশ করছে। প্রথম মিশ্র বংশে বাদাম ঝুটি

হচ্ছে Aa Bb শ্রেণীর। বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করলেন যে এখানে A এবং B এই তুইটি পদার্থই প্রবল চরিত্র (Dominant character) বহন করছে। যেখানেই A এবং B এই তুই বিপরীতগুণ নির্ণায়ক প্রবল পদার্থ (Dominant factor) একত্রিত হচ্ছে, সেখানেই তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এই নূতন চরিত্র বাদাম ঝুটি।

দ্বিতীয় মিশ্র বংশে তাই দেখা যাচ্ছে যেখানেই A এবং B এই তুই প্রবল পদার্থ একসঙ্গে আসছে সেখানেই বাদাম আকৃতির ঝুটি দেখাযাচ্ছে। যেখানে শুধু A আসছে সেখানে গোলাপী ঝুটি। যেখানে শুধু B আসছে সেখানে মটরাকৃতি ঝুটি। কিন্তু দেখা গেল যে এমন একটি আসছে যেখানে A এবং B তুইই অনুপস্থিত। পরিবর্তে রয়েছে a এবং b পদার্থ। ফলে সেখানে গোলাপী হয়না, মটরাকৃতি হয়না, বাদাম ঝুটি হয়না অতএব নূতন চরিত্র এল যার নাম দেওয়া হল একক ঝুটি।

অন্যান্য ক্ষেত্রে আরো বিচিত্র উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে যেখানে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ৯ঃ ৩ঃ ৩ঃ ১ অনুপাত আসবেনা। যেমন সাদা ফুল দেয় এমন তুটি মটর গাছের মিশ্রণ করা হল। দেখা গেল এই মিশ্রণের ফলে যে গাছগুলি হল সেগুলি গোলাপী রঙের ফুল দেয়। কেন এমন হল? এর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে যে এখানে গুণ নির্ণায়ক পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই এর জন্য দায়ী। দ্বিতীয় মিশ্র বংশে দেখাগেল গোলাপী ও সাদাফুল ৯:৭ অনুপাতে আসছে।
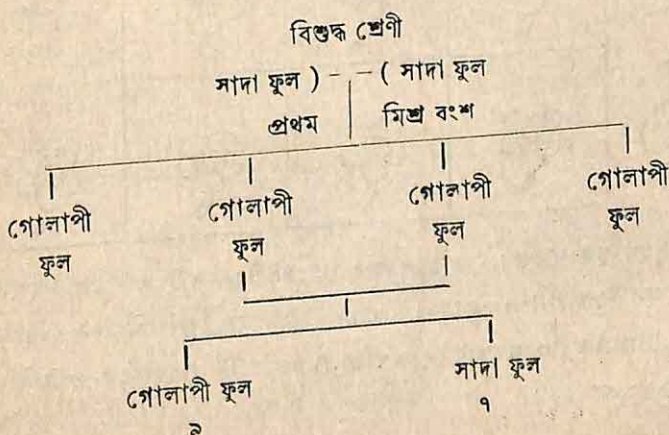
এখন আমরা সহজেই অনুমান করতে পারবো গুণ নির্ণায়ক পদার্থের বিন্যাস কিরকম হলে এই ধরণের অনুপাত আসতে পারে। প্রথম মিশ্রবংশে বর্ণ সমাগমের জন্য দায়ী দুইটি পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া। এই দুইটি পদার্থ ধরাযাক A এবং B বলে। বর্ণ বিহীন অবস্থায় এর যে কোন
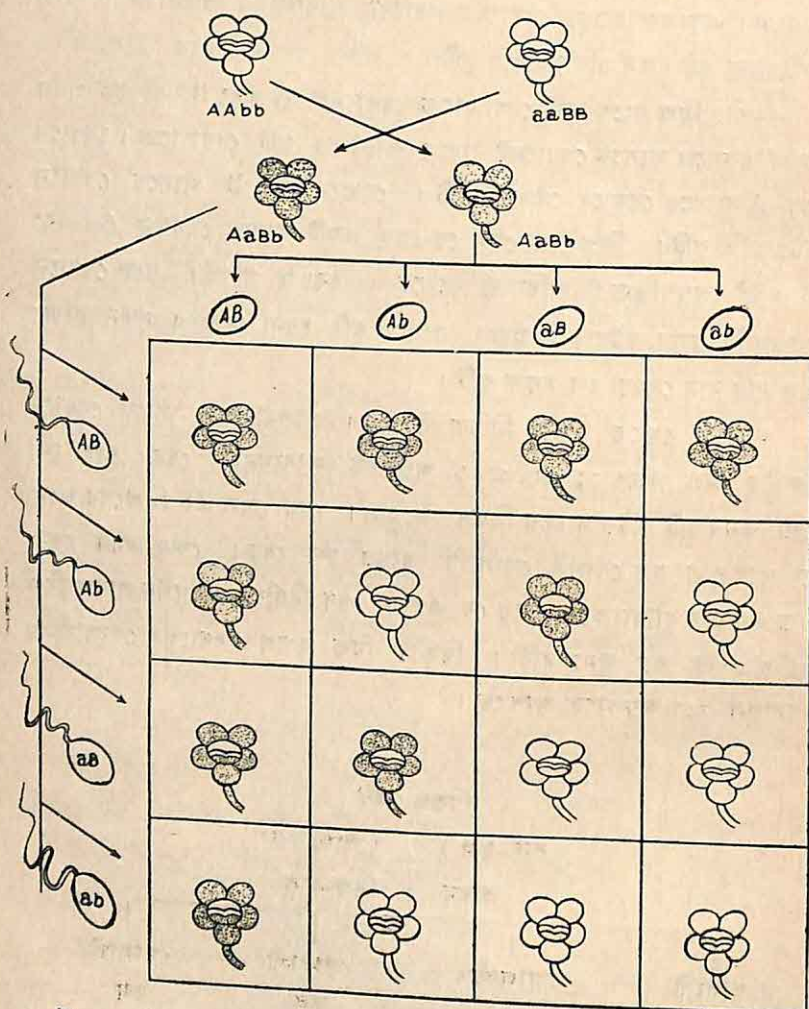
একটি অনুপ স্থিত থাকে। তাহলে সাদা ফুল দুইটির একটিতে ছিল AAbb অবস্থা অন্যটিতে BBaa অবস্থা। প্রথম মিশ্রবংশে গুণ নির্ণায়ক পদার্থের বিন্যাস ছিল Aa Bb অবস্থায়। এখানে A এবং B পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় গোলাপী রং এনেছে।

প্রথম মিশ্র বংশের গাছগুলির যৌনকোষ হবে চার প্রকার। এদের মিলনে যেখানে A এবং B এই দুইটি পদার্থই উপস্থিত থাকবে একমাত্র সেখানেই বর্ণ বিন্যাস দেখা যাবে। যেখানেই শুধু A অথবা শুধু B অথবা উভয়েই অনুপস্থিত সেখানে ফুলের রং হবে সাদা অর্থাৎ বর্ণহ

গুণ নির্ণায়ক পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ আরো বিচিত্র হতে পারে। যেমন দুইটি সাদা পাখীর (fowl) প্রজননে প্রথম মিশ্র বংশ হল সবগুলি সাদা। সাধারণতঃ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দুইটি পাখীই বিশুদ্ধ সাদা প্রকৃতির ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মিশ্র বংশে দেখাগেল যে ষোলটির মধ্যে মাত্র তিনটি রঙ্গিন অন্যগুলি সাদা এই অনুপাত আসছে। কেন এমন হল? এখানেও ঐ একই ব্যাখ্যা, গুণ নির্ণায়ক পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই এর জন্য দায়ী।
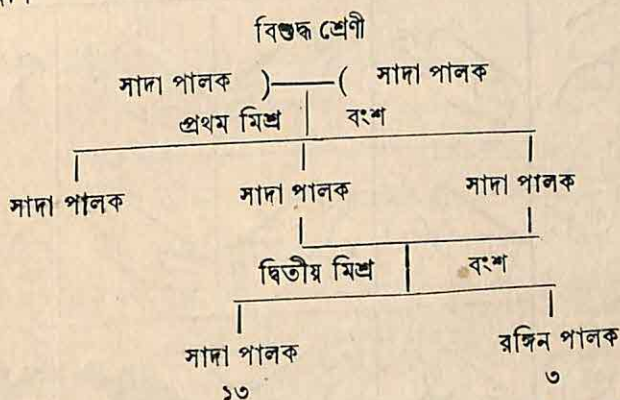
এখানে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে একটি সাদা পাখী বর্ণ নির্ণায়ক পদার্থ B বহন করছে। ঐ পাখীটিই আবার বর্ণনিরোধক পদার্থ A বহন করছে যার কাজ হল বর্ণ বিন্যাস প্রতিরোধ করা। এর ফলে AA BB শ্রেণীর এই পাখীটির রং সাদা। অন্য একটি পাখীর দেহে বর্ণ নির্ণায়ক এবং বর্ণ-প্রতিরোধক এই দুইটি পদার্থই অনুপস্থিত। সেই জায়গায় রয়েছে A এবং B পাদার্থ দুইটির পরিবর্তীত প্রকাশহীনরূপ (Mutated recessive form) a এবং b পদার্থ। এই পাখীটি aabb শ্রেণীর এরা সেই জন্য বর্ণহীন অর্থাৎ সাদা।

দেখাযাচ্ছে যেখানে A এবং B একসঙ্গে আছে সেখানে বর্ণবিন্যাস নেই। সেজন্য প্রথম মিশ্র বংশে আমরা সব সাদা পাই। এর কারণ A পদার্থটি বর্ণবিন্যাস প্রতিরোধ করে। যেখানে B পদার্থ অনুপস্থিত সেখানে বর্ণবিন্যাসের

প্রশ্নই আসেনা কারণ বর্ণনির্ণায়ক পদার্থটি নেই। শুধুমাত্র যেখানে B পদার্থ আছে কিন্তু A পদার্থ অনুপস্থিত সেখানে বর্ণপ্রতিরোধক না থাকার ফলে বর্ণ-বিন্যাস হতে পারে।
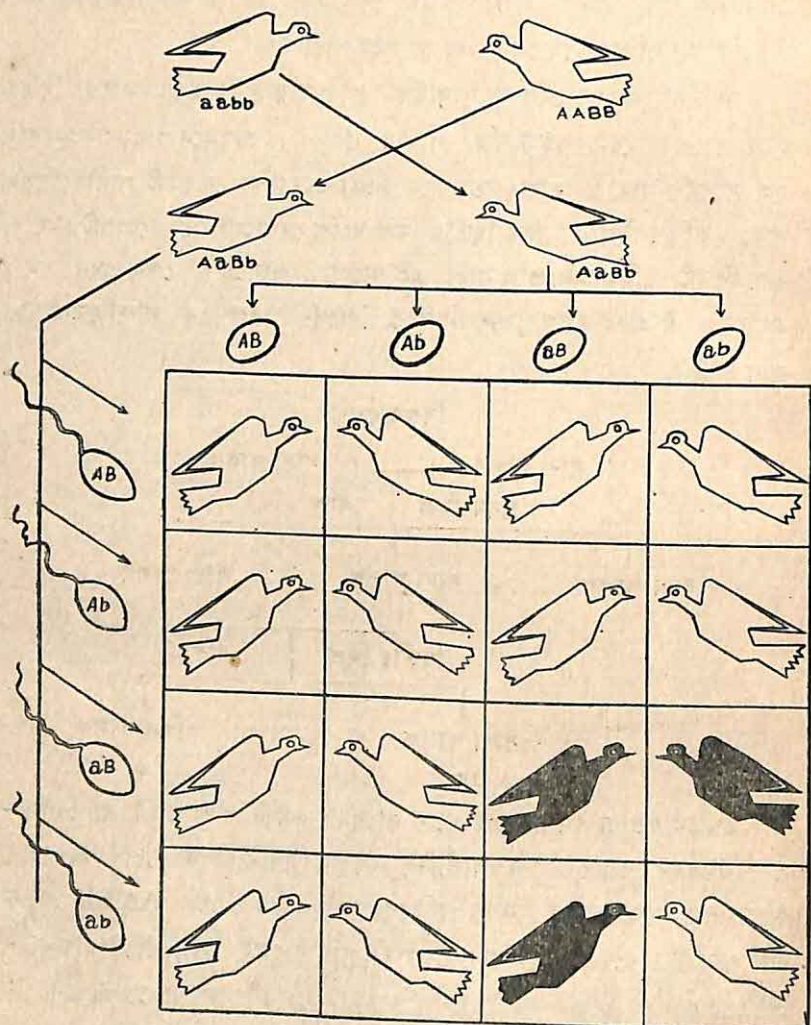
প্রথম মিশ্র বংশের পাখীদের যৌনকোষ চার প্রকার হতে পারে। তাদের মিলনে দ্বিতীয় মিশ্র বংশের ষোলটি সম্ভাবনার মধ্যে মাত্র তিনটিতে B পদার্থটির সঙ্গে A পদার্থের পরিবর্তে a পদার্থটি আছে। বর্ণ প্রতিরোধক না থাকায় এই তিনটি জায়গায় মাত্র বর্ণ বিন্যাস হয়েছে এবং ১৩ঃ ৩ অনুপাত আসছে।

গুণ নির্ণায়ক পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার আর একটি উদাহরণ আমরা পাই সাদা ও কালো ইঁদুরের মিশ্রণের বংশ তালিকায়। সাদা ও কালো ইঁদুরের মিলনে প্রথম মিশ্র বংশে পাওয়া যায় সবগুলি প্রাণীই ধূসর বর্ণের। আবার দুইটি ধূসর বর্ণের ইঁদুরের মিলনে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে পাওয়া যায় ধূসর, সাদা ও কালো ইঁদুর ৯: ৪: ৩ অনুপাতে।
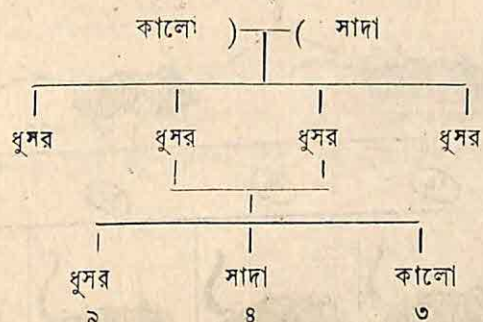
এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কালো অথবা সাদা এই চরিত্রগুলির প্রত্যেকটির জন্য দায়ী দুইটি করে পদার্থ। ধূসর বর্ণের জন্য দায়ী দুইটি পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া। ধূসর বর্ণের ইঁদুরের শুক্র অথবা ডিম্বকোষ চাররকমের যার ফলে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ষোলটি সম্ভাবনা দেখা যায়।

ধূসর বর্ণের জন্য দায়ী দুইটি পদার্থের একটি বর্ণবিন্যাসকারী অন্যটি বর্ণ-বিন্যাস আংশিক প্রতিরোধ করে। মনে করা যাক A পদার্থটি কালো রঙের জন্য দায়ী এবং [illegible]টি বর্ণবিন্যাস আংশিক প্রতিরোধ করে। এই দুইএর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল ধূসর বর্ণ।

ধূসর বর্ণের উৎপত্তি একটি কালো ও একটি সাদার মিশ্রনে। এখানে স্পষ্টই দেখাযাচ্ছে কলোটিতে B পদার্থটি অনুপস্থিত। অর্থাৎ এখানে পদার্থের বিন্যাস AA bb শুধু। আবার সাদাটিতে বর্ণবিন্যাসকারী পদার্থ A অনুপস্থিত এবং সেখানে পদার্থের বিন্যাস BB aa শ্রেণীর। প্রথম মিশ্র বংশে পদার্থের বিন্যাস Aa Bb শ্রেণীর। এখানে A এবং B পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ধূসর বর্ণের সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় মিশ্র বংশে যেখানে শুধুমাত্র A আছে এবং B অনুপস্থিত সেখানে কালো রং প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে A অনুপস্থিত সেখানে সাদা রং এবং যেখানে দুইটিই আছে সেখানে তাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে ধূসর বর্ণ

প্রকাশ পেয়েছে। এইবার সহজেই বোঝা যাবে ৯: ৪: ৩ অনুপাত কিভাবে এল।
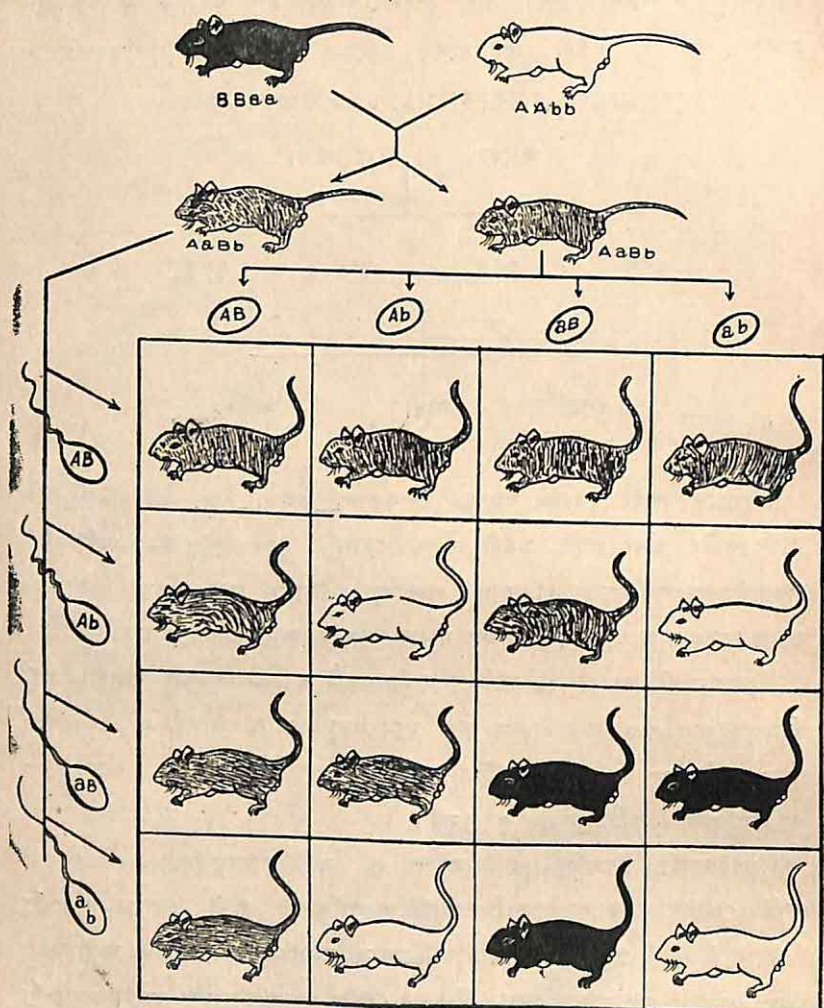
এই পরীক্ষাগুলির ফলাফলে আমরা পাই—

(১) মেণ্ডালের স্থত্রের আরো সংস্কার প্রয়োজন কারণ বিপরীত ধর্ম্মী দুই প্রবল পদার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নূতন চরিত্র আসতে পারে।

(২) কোন চরিত্র নির্ণায়ক পদার্থের উপস্থিতি যেমন প্রতিক্রিয়া ঘটায় তেমনি তার অনুপস্থিতি অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত কর্ম্মহীন রূপ (Mutated in

active foım) নূতন কোন প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। ঠিক এই ভাবেই সম্ভব হয়েছে একক (S.ngle) ঝুটির প্রকাশ।

(৩) মেণ্ডালের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূত্রের মুল কথা অর্থাৎ নির্ণায়ক পদার্থ সমূহের স্বাধীন পৃথকী করণ (free segregation) এবং যৌন কোষ সৃষ্টির সময় স্বাধীন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলন (Independent assortment) এখানে আবার প্রমাণিত হল।

(৪) মেণ্ডালের প্রদত্ত অনুপাতে ফলাফল সর্ব্বত্র আশাকরা যাবেনা কারণ চরিত্র নির্ণায়ক পদার্থের প্রকৃতি বৈচিত্র, সম্মেলনের বৈচিত্র, পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির জন্য ভিন্ন অনুপাত আসতে পারে যা ঠিক মেণ্ডালের হিসাব মত আসেনা।

বহু পদার্থের একত্রিত প্রভাব

মেণ্ডাল তাঁর পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মটর গাছের যে বৈচিত্রগুলি নির্বাচন করেন সেগুলির পার্থক্য ছিল খুব সহজভাবে চোখে পড়বার মতন। যেমন ফুলের রং লাল ও সাদা, গাছের কাণ্ড বড় ও ছোট, অথবা বীজের রং হলুদ কিম্বা সবুজ ইত্যাদি। বংশধারানুক্রমের জটিল তথ্যের বিশ্লেষণ মেণ্ডাল যে অত সহজে করতে পেরেছিলেন তার কারণ তাঁর পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত বৈচিত্রগুলি নির্ভুলভাবে হিসাব নিকাশ করার পক্ষে আদর্শ ছিল। মেণ্ডালের পরবর্ত্তীরাও ঠিক একই পথে এগিয়েছেন এবং বংশধারানুক্রমের আরো অনেক জটিল তথ্যের বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

অবশ্য বংশগত বৈশিষ্টের সব কিছু বৈচিত্রই যে ঠিক এই রকম তা নয়। এমন অনেক বৈচিত্র আছে যার প্রকাশ আরো অনেক জটিলতম কারণে হতে পারে। মানুষের গায়ের রং, বুদ্ধির কম বেশী, দৈহিক গঠন ইত্যাদি, অথবা কোন গাছ কি রকম ফল দেবে, কোন গরু কি পরিমান দুধ দেবে, কোন পাখী কি রকম ডিম দেবে ইত্যাদি বৈচিত্রগুলিতে দেখা যায় গুণগত প্রভেদ নয়, পরিমাণ গত প্রভেদটাই বেশি। অনেক সময় দেখা যায় লাল এবং সাদা ফুলের মধ্যে অনেকগুলি বৈচিত্র যেমন গাঢ় লাল, লাল, হাল্কা লাল, ফিকে লাল গোলাপী, ইত্যাদি। মেণ্ডালের বিশ্লেষণ পদ্ধতি এখানে কোনভাবেই প্রয়োগ করা যায় না। মেণ্ডাল বলেছেন গুণ নির্ণায়ক পদার্থগুলি কখনই মিশে যায় না, তারা স্বাতন্ত্র বজায় রাখে এবং সেইভাবে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের গায়ের রঙের যে বিভিন্ন বৈচিত্র তা মনে হয় সাদা ও কালোর বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণের ফল। লাল এবং সাদা ফুলের মিশ্রণে যেখানে গাঢ় লাল থেকে ফিকে লাল পর্যন্ত এবং তারও পরে সাদা রং পর্য্যন্ত যে বিভিন্ন বৈচিত্র পাওয়া যায় সেখানে মনে হয় মিশ্রণ ঘটছে।

ঘন কালো নিগ্রো এবং শ্বেত শুভ্র ইওরোপীয়ানের বিয়ে হলে যখন দেখা যায় যে তাদের বংশে নিগ্রোর মত কালো, ইওরোপীয়ানের মত ফর্সা, এবং

সেই সঙ্গে কালো থেকে ক্রমশঃ সাদার দিকে বিভিন্ন বৈচিত্র পাওয়া যায় তখনো এই কথাই মনে হয় যে সাদা কালোর কম বেশী মিশ্রণ ঘটছে।

অর্থাৎ মেণ্ডাল যে বলেছিলেন পদার্থের মিশ্রণ হয়না সে ব্যাখ্যা মনে হয় এখানে অচল। এখানে মনে হয় মিশ্রণের পরিমাণ গত প্রভেদের ফলেই এত বৈচিত্র আসছে। আপাত দৃষ্টিতে যে গুলিকে মিশ্রণ বলে মনে হচ্ছে ১৯০৮ সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী নিলসন এইলি এবং ১৯১০ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী ইস্ট (**Nilson Ehle 1908, East 1910**) তার প্রকৃত তথ্য বিশ্লেষণ করলেন।

এই দুই বিজ্ঞানী বললেন যে এতদিন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে একটি পদার্থ একটি চরিত্রের জন্য দায়ী। সেইসব ক্ষেত্রে একই চরিত্রের এতগুলি বৈচিত্র থাকা সম্ভব নয়। যদি এমন হয় যে অনেকগুলি পদার্থ একটি চরিত্রের জন্য দায়ী অর্থাৎ তাদের সম্মিলিত প্রভাবে ঐ চরিত্রটি প্রকাশ হচ্ছে তাহলেই একমাত্র এতগুলি বৈচিত্র সম্ভব হতে পারে।

নিলসন এইলি পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্বাচন করেন লাল এবং সাদা গম। দেখা যায় লাল রংটি প্রবল এবং সাদার উপর অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী। প্রথম মিশ্র বংশের গমগুলি লাল তবে গাঢ় লাল নয়। নিলসন এইলি বিভিন্ন ধরণের গম নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেল দ্বিতীয় মিশ্র বংশে তিনটি লাল একটি সাদা এই অনুপাত এল। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে লাল রঙের জন্য দায়ী একটি মাত্র পদার্থ। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেল দ্বিতীয় মিশ্র বংশে পনেরটি লাল একটি সাদা এই অনুপাত এল। তই লাল গমগুলির মধ্যে লাল রঙের বিভিন্ন বৈচিত্র দেখা গেল। এই সব ক্ষেত্রে যেখানে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ষোলটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে সেখানে লাল রঙের জন্য যে দুইটি পদার্থ প্রভাব বিস্তার করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।
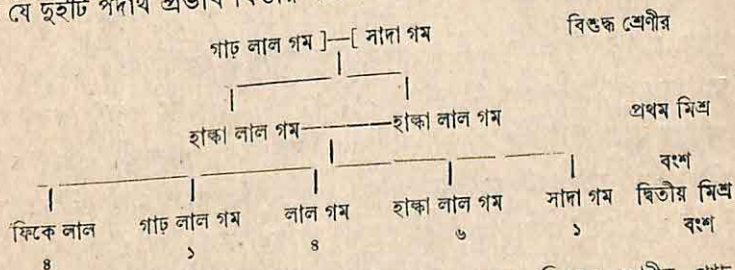
দুইটি পদার্থ যদি লাল রঙের জন্য দায়ী হয় তাহলে বিশুদ্ধ শ্রেণীর গাঢ়

লাল গমে পদার্থের বিন্যাস A_1 A_1 A_2 A_2 হবে। এখানে লাল রঙের জন্য দায়ী পদার্থ হিসাবে A অক্ষরটিকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।
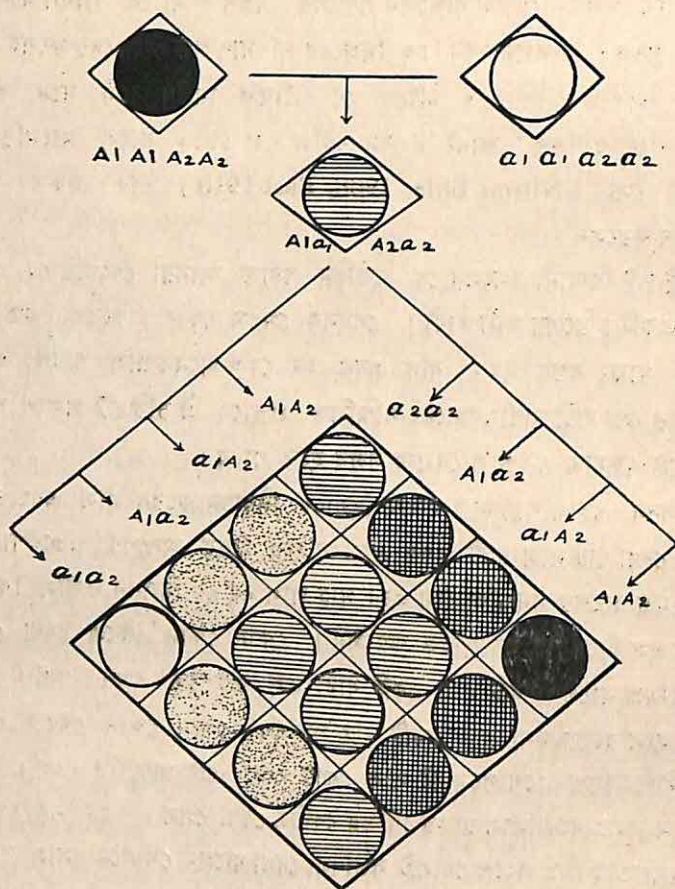
তাহলে সাদা গমের পদার্থের বিন্যাস a_1 a_1 a_2 a_2 হবে। এখানে A পদার্থের পরিবর্ত্তিত রূপ a লাল রঙের অনুপস্থিতি বোঝাচ্ছে। প্রথম মিশ্র বংশের পদার্থের বিন্যাস A_1 a_1 A_2 a_2 হবে। এইগুলি একটু কম লাল। আগের বংশে (Parental genaration) লাল রং নির্ণয়কারী পদার্থ চারটে ছিল এবং রং হয়েছিল গাঢ় লাল। প্রথম মিশ্র বংশে লাল রং নির্ণয়কারী পদার্থ মাত্র দুইটি রয়েছে, এর রং সেজন্য হাল্কা লাল। দ্বিতীয় মিশ্র বংশে দেখা গেল মাত্র একটিতে লাল রং নির্ণয়কারী পদার্থ চারটে আসতে পারে এবং সেইটি গাঢ় লাল প্রকৃতির। চারটি সম্ভাবনায় লাল রং নির্ণয়কারী

পদার্থ তিনটি করে আসে, সেইগুলি লাল। ছয়টি সম্ভাবনায় লাল রং নির্ণয়কারী পদার্থ দুইটি করে আসে, সেইগুলি হাল্কা লাল, (প্রথম মিশ্র বংশের মত), চারটি সম্ভাবনায় লাল রং নির্ণয়কারী পদার্থ একটি করে আসে সেইগুলি ফিকে লাল। মাত্র একটি সম্ভাবনায় লাল রং নির্ণায়ক কোন পদার্থ থাকবে না, তার রং হবে সাদা। তাহলে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে গাঢ় লাল ১; লাল ৪; হাল্কা লাল ৬; ফিকে লাল ৪; এবং সাদা ১ আসছে। অর্থাৎ ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১ এই অনুপাত পাওয়া যাচ্ছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেল যে লাল রং নির্ণয় করে তিনটি পদার্থের প্রভাব একত্র হয়ে। এখানে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ৬৪টি সম্ভাবনার মধ্যে একটি আসে সাদা, বাকি ৬৪টি লাল রঙের বিভিন্ন বৈচিত্র।

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে লাল রং নির্ণায়ক পদার্থের সংখ্যা বা পরিমাণের উপর রং এর ঘনত্ব নির্ভর করছে। এখানে বৈচিত্র সম্পূর্ণ পরিমাণগত।

এইবার আমরা এক বিচিত্র উদাহরণ বিশ্লেষণ করবো। এক নিগ্রো যদি কোন মেমসাহেবকে বিয়ে করে তাহলে কি হবে? নিগ্রোর গায়ের রং ঘন কালো। মেম সাহেবের রং একেবারে সাদা। এদের ছেলে মেয়েরা সাদা কালোর মাঝামাঝি ধুসর বর্ণের (Mullatto) হবে। এখন এমনি এক ধুসর বর্ণের ছেলে যদি এক ধুসর বর্ণের মেয়েকে বিয়ে করে? অর্থাৎ একটি নিগ্রো মেম দম্পতির ছেলে যদি আর একটি নিগ্রো মেম দম্পতির মেয়েকে বিয়ে করে? এদের সন্তানদের মধ্যে দেখা যাবে পাঁচ রকম মিলিয়ে ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১ অনুপাতে ষোলটি সম্ভাবনা রয়েছে। ষোলটির মধ্যে একটি হবে নিগ্রো অর্থাৎ ঘন কালো; একটি হবে মেমসাহেবের মত ফর্সা অর্থাৎ সাদা, চারটি হবে কালো, ছয়টি হবে মা বাবার মত ধুসর অর্থাৎ আর একটু কম কালো, এবং চারটি হবে খুবই কম কালো বা হাল্কা কালো।
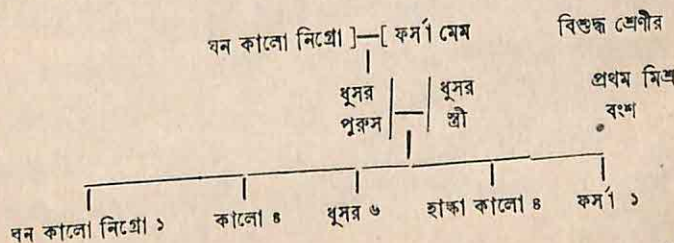
এখানেও কালো রং নির্ণায়ক পদার্থ রয়েছে এক জোড়া। ঘন কালো নিগ্রোর দেহে $A_1 A_1 A_2 A_2$ রয়েছে। এখানে A প্রতীক ধরা হচ্ছে কালো রং নির্ণয় কারী পদার্থের। মেমসাহেবের দেহে a_1 a_1 a_2 a_2 আছে। অর্থাৎ কালো হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। এদের পৌত্র বা দৌহিত্রদের মধ্যে কালো রং নির্ণয়কারী পদার্থ চারটি, তিনটি, দুইটি ও একটি করে থাকায় অথবা একেবারে না থাকায় কালো ও সাদার মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্র আসছে।

১৯১৩ সালে ড্যাভেন পোর্ট (Davenport 1913) নিগ্রো এবং মেমসাহেবের বংশ তালিকার এই বিচিত্র তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে যেখানে চারটি কালো রং নির্ণয়কারী পদার্থ আছে সেখানে ঘন কালো নিগ্রো, যেখানে তিনটি পদার্থ আছে সেখানে কালো, যেখানে দুইটি সেখানে ধূসর যেখানে একটি সেখানে কালো রঙের অংশ খুবই কম, এবং যেখানে কালো রং নির্ণায়ক পদার্থ একটিও নেই সেখানে মেমসাহেবের মত ফর্সা রং আসছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে গায়ের রং তাহলে পরিমাণগত পার্থক্যের বৈচিত্র। আমাদের গায়ের রঙের বিভিন্ন বৈচিত্রের কারণ তাই। প্রথমতঃ অনেকগুলি পদার্থ রং প্রকাশের জন্য দায়ী ; দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ধরণের মধ্যে মিলনের ফলে অসংখ্য বৈচিত্র আসছে।

মেণ্ডালের কাজের সঙ্গে এখানে আমরা একটি বিশেষ পার্থক্য দেখতে পাই। মেণ্ডালের কাজ ছিল গুণগত বৈচিত্র নিয়ে। এখানে আমরা দেখছি যে কিছু চরিত্র এমনও আছে যা পরিমাণগত বৈচিত্র প্রকাশ করে।

কোষ বিভাজন

জীবকোষ সাধারণতঃ দুই অবস্থায় দেখা যায়। সাধারণ অবস্থা অর্থাৎ বিরাম পর্ব্ব (Resting Stage) বা বিশ্রাম রত অবস্থায় অথবা বিভাজন পর্ব্ব (Divisional Stage) অর্থাৎ কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্ব্বে।

কোষ বিভাজন হয় দুই রকম প্রক্রিয়ায়, (১) দেহকোষ বিভাগ (Mitosis or Somatic cell divission) ও (২) যৌন কোষ বিভাগ (Meiosis or germ cell divission) শুক্র বা ডিম্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

সাধারণ অবস্থায় জীবকোষে দেখাযায় কোষ আবরণী (Plasmamembrane or cell wall) দিয়ে ঘেরা কিছু জীবপঙ্ক বা প্রোটোপ্লাজমের (Protoplasm) মাঝখানে নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা প্রাণকেন্দ্র। জীবকোষের কেন্দ্রস্থলে প্রায় গোলাকার প্রাণকেন্দ্রের মধ্যে — কেন্দ্রমণি বা নিউক্লিওলাস (Neucleclus) একটি বড় আকারের বিন্দুর মত দেখায়। বিরাম পর্ব্বে প্রাণকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ছড়ানো কিছু গাঢ় রঙের দানার মত ক্রোমাটিন বিন্দু (Chromatin granules) দেখা যায়।

বিভাজন পর্ব্বে প্রাণকেন্দ্রের অভ্যন্তরে সরু সুতার মত কিছু পদার্থ দেখা যায়—যেগুলিকে ক্রমোসোম সূত্র (chromosome thread) বলা হয়। বিরাম পর্বে এই ক্রমোসোমগুলি অদৃশ্য থাকে।

জীবদেহে সজীব কোষগুলির সর্ব্বদাই সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। পুরাতন জীর্ণ-অক্ষম কোষগুলির পরিবর্ত্তন হচ্ছে নূতন সজীব কোষ দিয়ে। দেহ কোষ (Somatic cell) বিভক্ত হয়ে যে নূতন দেহ-কোষের সৃষ্টি করে তা বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গের জীর্ণ কোষ পরিবর্ত্তনের কাজে লাগে। যৌন কোষ (Germ cell) বিভাগের ফলে উৎপন্ন হয় শুক্র অথবা ডিম্বকোষ। এদের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় নূতন প্রাণের। এই দুই শ্রেণীর কোষ বিভাজনের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কিছু আছে।

দেহকোষে একটি কোষ বিভক্ত হয়ে দুইটি হয়। কোষ বিভাগের প্রস্তুতির অবস্থায় ক্রমোসোম সংখ্যা দ্বিগুনিত হয়ে যায় ফলে নূতন কোষ

দুইটিতে ক্রমোসোম সংখ্যা থাকে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক কোন পতঙ্গের ক্রমোসোম সংখ্যা আট অর্থাৎ চার জোড়া। ঐ পতঙ্গের দেহের প্রতিটি কোষেই ক্রমোসোম সংখ্যা আট। দেহকোষ বিভাগের সময় প্রস্তুতিপর্ব্বে ক্রমোসোম সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে হল ষোল অর্থাৎ আট জোড়া। এর পর ঐ কোষটি দুইভাগ হয়ে যে নূতন দুইটি দেহকোষ সৃষ্টি করল তার প্রত্যেকটিতে ক্রমোসোম সংখ্যা হল ষোলর অর্দ্ধেক আট অর্থাৎ চার জোড়া। ক্রমোসোমের মূল সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হলনা। এখানে একটি কোষ বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হল দুইটি এবং ক্রমোসোমেরা জোড় সংখ্যাতেই (Diploid number) রইল।

যৌনকোষ বিভাগের সময় প্রতিকোষ দুইবার বিভক্ত হয়, ফলে একটি কোষ বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় চারিটি কোষের। সর্ব্বশেষ অবস্থায় দেখাযায় যে ক্রমোসোম সংখ্যা দেহকোষের ক্রমোসোম সংখ্যার অথাৎ মূল সংখ্যার অর্দ্ধেক এবং জোড় সংখ্যায় নয় একক (Haploid) অবস্থায়। আগের. উদাহরণ নিয়েই দেখাযাক বিশ্লেষণ করে। একটি পতঙ্গের দেহে মূল ক্রমোসোম সংখ্যা আট অর্থাৎ চার জোড়া। একটি যৌনকোষ বিভাগের সময় প্রথম বিভাগের প্রস্তুতি পর্ব্বে ক্রমোসোম সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে হল ষোল অর্থাৎ আট জোড়া। এর পর দুই ভাগ হয়ে যে দুইটি নূতন কোষ সৃষ্টি হল তার প্রত্যেকটিতে ক্রমোসোম সংখ্যা আট অর্থাৎ চার জোড়া। এইবার দ্বিতীয়বার বিভাজনের প্রস্তুতি পর্ব্ব। এই সময় কিন্তু অন্যবারের মত ক্রমোসোম সংখ্যা দ্বিগুন হলনা। ফলে এইবার ঐ দুইটি কোষ বিভক্ত হয়ে যে নূতন চারিটি কোষের সৃষ্টি হল তাদের ক্রমোসোম সংখ্যা হল মাত্র চার, অর্থাৎ মূল সংখ্যার অর্দ্ধেক। এই চারিটি ক্রমোসোম কিন্তু প্রতি জোড়ার একটি করে অর্থাৎ একক (Haploid) অবস্থায়।

এখানে তাহলে আমরা দেখছি যে যৌনকোষ যদিও দুইবার বিভক্ত হয় ক্রমোসোমেরা দ্বিগুনিত হয় শুধু একবার এবং সেই সময় কোষ বিভাজন হয় কতকটা দেহকোষ বিভাজনের পদ্ধতিতেই। অন্যবারে ক্রমোসোমেরা দ্বিগুনিত হয়না ফলে উৎপন্ন কোষগুলিতে ক্রমোসোমেরা থাকে একক (Haploid) অবস্থায়।

এখানে উভয় প্রকার কোষ বিভাজনের মধ্যে একটি পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে দেহ কোষ বিভাজনের ফলে উৎপন্ন কোষগুলির ক্রমোসোম

সংখ্যা থাকে জোড় সংখ্যায় এবং যৌনকোষ বিভাগের ফলে উৎপন্ন কোষগুলির ক্রমোসোম সংখ্যা থাকে একক অবস্থায়। এছাড়া দেহকোষ একটি বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় দুইটি। যৌনকোষ একটি বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় চারটি, অবশ্য ডিম্বকোষের ক্ষেত্রে একটি। কারন অন্যগুলি নষ্ট হয়ে যায়।
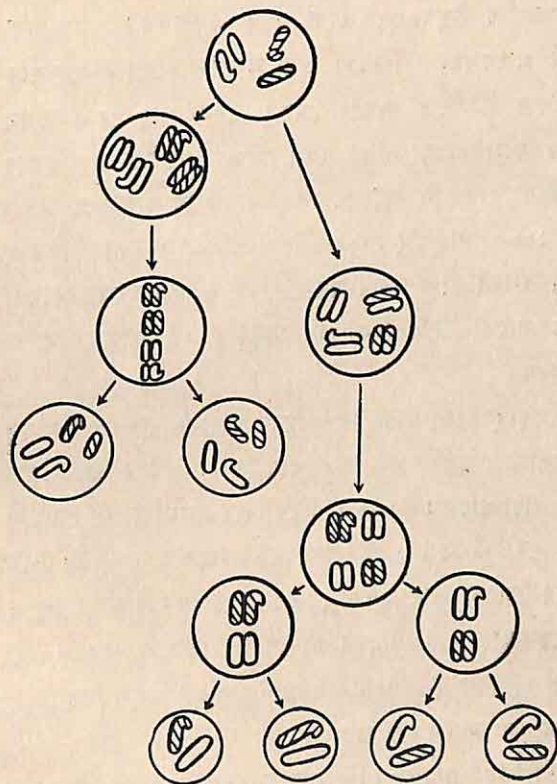
কোষ বিভাজনের প্রধান অবস্থা চারটি। প্রথমাবস্থা (Prophase) মধ্যাবস্থা (Metaphase), অন্ত অবস্থা (Anaphase) এবং শেষ অবস্থা (Telophase)।

দেহ কোষ বিভাজন :—

দেহকোষ বিভাজন প্রথম পর্য্যবেক্ষণ করেন ফ্লেমিং, স্ত্রাসবার্জার এবং ভনবেনডেন। ১৮৮২ সালে ফ্লেমিং (Flemming 1882) চিত্রিত স্যালা-ম্যণ্ডারের দেহকোষ বিভাজন পর্য্যবেক্ষন করেন। স্ত্রাসবার্জার ঐ বৎসরই (Strasburgar 1882) বিভিন্ন উদ্ভিদে দেহকোষ বিভাজন লক্ষ্য করেন। ভন বেনডেন এলেন এঁদের একবৎসর পরে (Von Benden 1883) অর্থাৎ

১৮৮৩ সালে। এই তিনজন বিজ্ঞানীই দেহকোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্য্যায় নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুশীলন ও আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন। ফ্লেমিং প্রথম আবিষ্কার করেন যে একটি ক্রমোসোম লম্বাভাবে চিরেগিয়ে দুখানা হয়ে যায়। ভন বেনডেনও দেখেন যে এইভাবে একটি ক্রমোসোম থেকে যে অন্যটির উদ্ভব হয় তারা হুবহু একরকম। সামান্যতম পার্থক্যও তাদের মধ্যে থাকেনা। তা-ছাড়া এরা আলাদা হয়ে দুইদিকে সরে যায় এবং নূতন প্রাণকেন্দ্র দুইটিতে আশ্রয় নেয়। দেখা যায় যে এইভাবে লম্বাভাবে চিরে যাবার ফলে ক্রমোসোম সংখ্যা দ্বিগুন হয়েযায় এবং কোষ বিভাগের সময় এই ক্রমোসোমগুলি দুই প্রান্তে সমানভাবে ভাগ হয়ে সরে যায়। পরে স্ত্রাসবার্জার ১৮৮৪ সালে (Strasburger 1884) কোষ বিভাজনের বিশদ বিবরণ দিয়ে আলোচনা করলেন প্রথম, মধ্যে, ও অন্ত অবস্থা নিয়ে। হাইডেন-হাইন ১৮৯৪ সালে (Heidenhain 1894) এর সঙ্গে যোগ করলেন শেষ অবস্থার বিবরণ।

প্রথম অবস্থা (Prophase) :—কোষ মধ্যে প্রাণকেন্দ্রের আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমোসোম সূত্র গুলি ক্রমশঃ দৃশ্যমান হয়। প্রথমে ক্রমোসোম সূত্রগুলি খুব সরু এবং লম্বা থাকে। এরপর ধিরে ধিরে ক্রমোসোম সূত্রগুলি আকারে ছোট এবং মোটা হয়। এই সময় দেখাযায় যে প্রতিটি ক্রমোসোম সূত্র দ্বিগুনিত হয়ে গেছে এবং সেগুলি এখনও তাদের স্থিতি বিন্দু (Centromere) দিয়ে জোড়া। এই সময় প্রাণকেন্দ্র আয়তনে এতবড় হয়ে যায় যে প্রাণকেন্দ্রের আবরণী (Nuclearmembrane) বিলুপ্ত হয়। প্রথমাবস্থার এখানেই শেষ এবং মধ্যাবস্থার শুরু।

মধ্যাবস্থা (Metaphase) :—প্রাণকেন্দ্রের আবরণী বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে কোষমধ্যে অবস্থিত মেরুবিন্দু (centriole) বিভক্ত হয়ে দুই প্রান্তে চলে যায় এবং ঐ দুই বিন্দু থেকে প্রোটিন স্তর দিয়ে সৃষ্টি একটি বক্রপৃষ্ঠ (Spindle) সৃষ্টি হয়। এই বক্রপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে অনেকগুলি প্রোটিন স্তর থাকে। ক্রমোসোমগুলি প্রত্যেকটি একটি করে প্রোটিন স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ক্রমোসোমের স্থিতি বিন্দুই শুধু প্রোটিন স্তরের সঙ্গে লেগে থাকে। এই সময় ক্রমোসোমগুলি ঐ বক্র পৃষ্ঠের ঠিক মধ্য রেখায় অবস্থান করে। মধ্যাবস্থার প্রধান কাজ হল মেরুবিন্দু বিভাজন, বক্রপৃষ্ঠ সৃষ্টি, এবং মধ্য রেখায় ক্রমোসোম-গুলির সংযোজন।

অন্ত অবস্থা (Anaphase) :—অন্ত অবস্থার প্রারম্ভে দেখাযায় যে ক্রমোসোমগুলির স্থিতিবিন্দু বিভক্ত হয়ে গেছে। এখন প্রতিটি ক্রমোসোমই পৃথক। এরপর ক্রমোসোমগুলি দুই দিকের দুই মেরু বিন্দুর দিকে ধিরে ধিরে ক্রমশঃ সরে যেতে থাকে। অন্ত-অবস্থার প্রধান কাজ হল এই ক্রমোসোম গুলির অতি মন্থর সঞ্চরণ। অন্ত অবস্থার শেষে দেখা যায় যে ক্রমোসোমগুলি মেরুপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে।

শেষ অবস্থা (Telophase)।

শেষ অবস্থায় দেখাযায় যে মেরুপ্রান্তে ক্রমোসোমগুলি সব এসে জড় হয়েছে। ক্রমোসোমগুলি তখন আর আলাদা ভাবে চেনা যায়না। এই সময় এই ক্রমোসোম সংগ্রহের চারিদিকে আবরণী সৃষ্টি হয়ে নূতন প্রাণকেন্দ্রের উদ্ভব হয় এবং কোষটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুইটি নূতন কোষ সৃষ্টি করে।

এরপর এই নূতন কোষ দুইটির বিরামপর্ব্ব, যতক্ষণ না আবার কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্ব আসছে।

যৌনকোষ বিভাজন।

শুক্র বা ডিম্বকোষে ক্রমোসোম সূত্র যে একক অবস্থায় থাকে এ তথ্য প্রথম আবিস্কার করেন ভন বেনডেন (Von Benden 1883) ১৮৮৩ সালে। ১৮৮৭ সালে ওয়াইস ম্যান বললেন (Weis mann 1887) যে এক বিশেষ ধরণের কোষ বিভাজন প্রতি বংশ ধারায় হয়ে থাকে যেখানে ক্রমোসোম সংখ্যা হয়ে যায় অর্দ্ধেক। ১৮৮৭ সালে ফ্লেমিং, ১৮৮৮ সালে স্ত্রাস বার্জার, ১৯০৫ সালে ফার্মার এবং মূর এবং ১৯০৪সালে গ্রেগয়ের দেখলেন (Flemming 1887, stras burger 1888, Farmer & Moorc 1905, Gregoire 1904) যে যৌন কোষগুলি কোষ বিভাজনের সময় দুইবার বিভক্ত হয়। ১৯০০ সালে উইনিওয়ার্টার আবিস্কার করলেন (Winiwarter 1900) যে খরগোসের ডিম্বকোষের বিভাজন হয় দীর্ঘ সময় ধরে এবং যৌনকোষ বিভাজন পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে তা আদর্শ স্থানীয়।

দেহ কোষ বিভাগ ও যৌনকোষ বিভাগের কিছু পার্থক্যের কথা আমরা আগেই বলেছি। যৌনকোষ বিভাগের সময় দেখা যায় প্রথম বিভাগের প্রথম অবস্থা (Prophase) বেশ বিলম্বিত। ফলে সেই সময়ের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। শুধু তাই নয় বিভিন্ন কার্য্যক্রম অনুসারে এই

প্রথম অবস্থাকে আরো পাঁচটি অংশে ভাগ করা যায়। এই পাঁচটি অংশ যথাক্রমে (১) আবির্ভাব (Leptotene), (২) নির্বাচন (Zegotene), (৩) সম্মিলন (Paehetene), (৪) আকর্ষণ (Dip otene), (৫) বিকর্ষণ (D:akinesis) নামে পরিচিত।
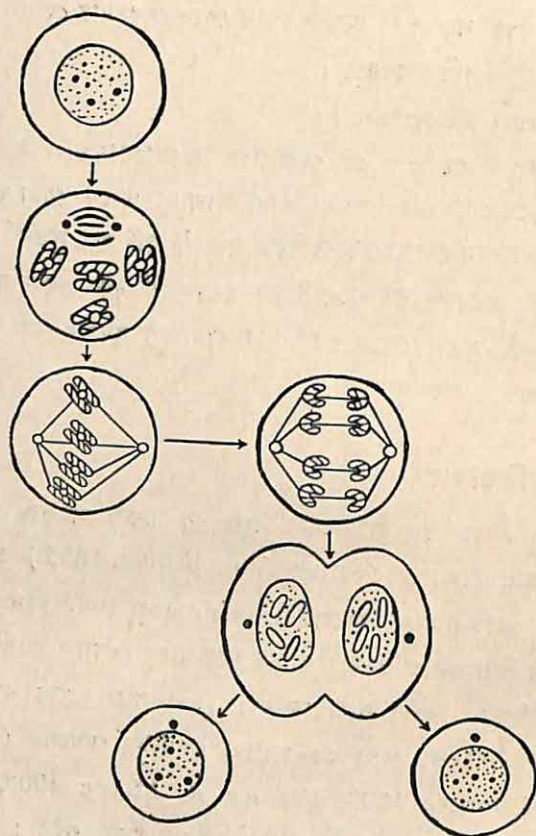
প্রথম অবস্থা (**Prophase**) :—

(১) আবির্ভাব (**Leptotene**) :—

যৌনকোষে প্রাণকেন্দ্রের অভ্যন্তরে এই সময় ক্রমোসোম সুত্রগুলি ক্রমশঃ দৃশ্যমান হয়। প্রথমে ক্রমোসোম সুত্রগুলিকে মনে হয় এলোমেলো ভাবে জড়ান সুতার একটি দলা প্রাণ কেন্দ্রের সমস্ত অংশ ভরে রয়েছে। এই সময় ক্রমোসোম সুত্রগুলি থাকে খুব সরু এবং খুব লম্বা। ক্রমশঃ এই সরু ও লম্বা ক্রমোসোমগুলি আকারে ছোটও মোটা হতে থাকে। এর কারণ ক্রমোসোম

সূত্রের অভ্যন্তরের জলীয় অংশ ক্রমশঃ নিস্কাষিত হতে থাকে। এখন স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে ক্রমোসোমগুলি প্রাণকেন্দ্রের অভ্যন্তরে অদৃশ্য ছিল কেন এবং কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্ব্বে হঠাৎ দৃশ্যমান হয়ে উঠল তার কারণই বা কি।

কোষ বিভাজনের অন্তবর্ত্তী অবস্থা বা বিরাম পর্ব্বে (**Resting stage**) ক্রমোসোমগুলি খুব বেশি পরিমাণ জলীয় পদার্থ শোষণ করে ফলে তাদের আকার অত্যন্ত সরু ও লম্বা হয়ে যায়। এই সময় ক্রমোসোমগুলির আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতা (**Refractive Index**) প্রাণকেন্দ্রের ঘন পদার্থের (**Nucleoplasm**) আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতার সমান হয়ে যায়। এর ফলে বিরাম পর্ব্বে ক্রমোসোমগুলিকে প্রাণকেন্দ্রের ঘন পদার্থ থেকে আলাদা করে বোঝা যায় না। তবে ক্রমোসোম সূত্রের কোন কোন অংশ খুব অল্প পরিমাণ জলীয় পদার্থ গ্রহণ করে কারণ ক্রমোসোমের সব অংশগুলি সমান প্রকৃতির নয়। ফলে ক্রমোসোমের সেই অংশ গুলির আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতা অন্য অংশের এবং প্রাণকেন্দ্রের ঘন পদার্থের আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতা থেকে পৃথক। সেই জন্য ক্রমোসোমের ঐ অংশ গুলি দৃশ্যমান হয় এবং সেইগুলিই ক্রোমাটিন বিন্দু (**Cnromatin granules**) নামে পরিচিত।

কোষ বিভাগের প্রথম অবস্থায় ক্রমোসোম সূত্র থেকে জলীয় অংশ নিস্কাষিত হতে আরম্ভ হলে তাদের আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতা প্রাণকেন্দ্রের ঘন পদার্থের আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতা থেকে পৃথক হয় এবং তারা ক্রমশঃ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। জলীয় অংশ যত বেশী নিস্কাষিত হয় ক্রমোসোমগুলি তত মোটা ও আকারে ছোট হতে থাকে। আকারে বড় থাকা অবস্থায় প্রাণকেন্দ্রের স্বল্প পরিসরে তাদের একসঙ্গে জড়ান সুতার দলার মত মনে হয়। ক্রমোসোমগুলি আকারে যখন ছোট হয়ে আসে তখন তাদের পরিস্কার আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যায়। এই সময়ে ক্রমোসোম সংখ্যা গণনা করা যায়। বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন সুনির্দ্দিষ্ট ক্রমোসোম সংখ্যা এই সময় নির্ণয় করা সহজ।

জলীয় পদার্থ নিষ্কাষিত হবার সময়েই প্রতি ক্রমোসোমে স্প্রীং-এর মত পাক ধরে। ক্রমোসোমের আকারে ক্রমশঃ ছোট হবার এটিও একটি প্রধান কারণ। এই সময়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে একই আকারের ক্রমোসোম দুইটি করে আছে। এই একই আকারের ক্রমোসোমগুলি

আকৃতি, প্রকৃতি, স্থিতিবিন্দুর অবস্থান প্রভৃতিতে একটি হুবহু আর একটির অনুরূপ। এই সময় আরো দেখা যায় যে প্রত্যেক ক্রমোসোম দুইটি ক্রোমাটিড (Chromatid) দিয়ে তৈরী। অর্থাৎ কোষ বিভাগের প্রস্তুতির আগেই বিরাম পর্ব্বে ক্রমোসোমগুলি দ্বিগুনিত হয়েছে। অল্প কিছুদিন আগেও এই ধারণা ছিল যে ক্রমোসোমগুলি দ্বিগুনিত হয় কোষ বিভাগের প্রথম অবস্থার কোন এক স্তরে। কিন্তু তেজস্ক্রীয় পদার্থের প্রয়োগে পরীক্ষার ফলে (Radioactive isotope :—G. H. Tylor) বর্ত্তমানে সন্দেহাতীত ভাবে জানাগেছে যে ক্রমোসোম দ্বিগুনিত হয় অন্তবর্ত্তীকালে বা বিরাম পর্ব্বে।

আবির্ভাব (Leptotene) অংশে আমরা দেখছি যে ক্রমোসোমগুলি ক্রমশঃ দৃষ্টিগোচর হবার পরে আকারে ছোট ও মোটা হচ্ছে, একই জাতীয় ক্রমোসোম একজোড়া করে আছে ; এবং প্রতি ক্রমোসোমে দুইটি ক্রমাটিড স্থিতি বিন্দু দিয়ে জোড়া।

নির্ব্বাচন (Zygotene) :—

—এইপর্ব্বে দেখাযায় যে একই আকারের ক্রমোসোমগুলি পরস্পর কাছে আসছে এবং একসঙ্গে জোড়া বাঁধছে। বিপরীত আকৃতির ক্রমোসোমগুলি কখনও ঘনিষ্ট হয় না। দেহ কোষ বিভাগের সঙ্গে যৌনকোষ বিভাগের আর একটি প্রধান পার্থক্য এইখানে। দেহকোষ বিভাগে ক্রমোসোমেরা কখনই জোড়া বাঁধেনা।

নির্ব্বাচনপর্ব্বে ক্রমোসোমগুলি জোড়া বাঁধে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। একটি ক্রমোসোমের প্রতিটি বিন্দু যেন অন্য ক্রমোসোমের প্রতিটি বিন্দুর সঙ্গে মিলতে চায়। এই সময় ক্রমোসোমগুলি আরো ছোট ও মোটা হয়। এই জোড়া বাঁধার রহস্য এখনো পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায়নি।

সম্মিলন (Pacheten) :—

এই পর্ব্বে ক্রমোসোমগুলির জোড়া বাঁধা সম্পূর্ণ হয়েগেছে। প্রতি জোড়ার ক্রমোসোমগুলি এই সময় মনে হয় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে লিপ্ত হয়ে আছে। মনে হয় একটি আর একটির সঙ্গে শক্তভাবে পাকানো। এই সময় ক্রমোসোমগুলি আরো ছোট ও মোটা হয় এবং ক্রমোসোমগুলির বাইরেটা অত্যন্ত রুক্ষ (Bushy) মনে হয়। জোড়ায় জোড়ায় ক্রমোসোমগুলি এই সময় কেন্দ্রমণিকে ঘিরে সাজান থাকে।

আকর্ষণ (Diplotene) :—

এই পর্ব্বে ক্রমোসোম জোড়াগুলি লম্বালম্বি ভাবে আলাদা হয়ে যায়। প্রতি জোড়ার চারটি ক্রোমাটিড বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। স্থিতিবিন্দু কিন্তু এখনো বিভক্ত হয়নি, ক্রোমাটিডগুলিকে ধরে রেখেছে।

এই সময় ক্রমোসোমগুলি যে একেবারে আলাদা হয়ে যায় তা নয়, কোথাও কোথাও পরস্পরের সঙ্গে লেগেথাকে, মনে হয় একটি আর একটির উপর দিয়ে আছে। এই লেগেথাকা অংশগুলি বন্ধনী (Chiasmata) নামে পরিচিত। ক্রমোসোমের কোন জোড়ায় একটি, কোন জোড়ায় দুইটি, কোন জোড়ায় আরো বেশি এমনি বন্ধনী (Chiasmata) দেখা যায়। এই বন্ধনীগুলির উৎপত্তি হয় ক্রমোসোমের দেহে কিছু ভাঙ্গা গড়ার ফলে।

ক্রমোসোমগুলি যখন স্প্রীংএর মত পাক খায় তখন কখনও কখনও কোন ক্রমোসোমের কোন অংশ এই চাপের ফলে ভেঙ্গে যায়। একটি ক্রোমোসোম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে যে বিপরীত চাপের সৃষ্টি হয় তার ফলে সঙ্গী ক্রমোসোমটিরও ঐ অংশটি ভেঙ্গে যায়। ক্রমোসোমের প্রকৃতি গত বৈশিষ্ঠ এই যে মাঝে কোথাও ভেঙ্গে গেলে খুব সহজে আবার জোড়া লেগে যায়, ভাঙ্গা অবস্থায় থাকতে পারেনা। এখন ক্রমোসোমগুলি একদিকে পাক খাচ্ছিল তার কোন জায়গা ভেঙ্গে যাবার ফলে এর দুটি অংশ দুই বিপরীত দিকে ঘুরে যায় এবং সঙ্গী ক্রমোসোমটিরও ঐ একই অবস্থা হয়। এর ফলে একটি ক্রমোসোমের ভাঙ্গাটুকরো অন্য ক্রমোসোমের ভাঙ্গাটুকরোর খুব কাছাকাছি আসে এবং জুড়ে যায়। এই ভাবেই বন্ধনীর সৃষ্টি এবং এই সময় একটি ক্রমোসোমের অংশ অন্য ক্রমোসোমে জুড়ে যায়, এবং সেই ক্রমোসোমের অংশ এই ক্রমোসোমে আসে। এই ভাবে ক্রমোসোমের যে অংশ বিনিময় হয় তার প্রভাব বংশানুক্রম তত্ত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কোন অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে।

বিকর্ষণ (Diakinesis) :—

এর আগের পর্ব্বগুলিতে ক্রমোসোমগুলি ক্রমশঃ ছোট ও মোটা হতে দেখা গেছে ; এই পর্ব্বে তা সম্পূর্ণ হয়। শুধু তাই নয় এই পর্ব্বে দেখা যায় যে প্রতি জোড়াতেই ক্রমোসোমগুলি পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেষ্টা করছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতি জোড়ায় ক্রমোসোমগুলি পরস্পর

পরস্পরের সঙ্গে থাকতে চেয়েছে। এই পর্ব্বে সেই আকর্ষণ আর নেই। এই পর্ব্বে তারা বিচ্ছিন্ন হতে চেষ্টা করে।

এই বিচ্ছিন্ন হবার প্রচেষ্টার ফলে বন্ধনী (**Chiasmata**) গুলি ক্রমশঃ সরে সরে ক্রমোসোমের প্রান্তের দিকে চলে যায়। ক্রমশঃ যখন বিকর্ষণ সম্পূর্ণ
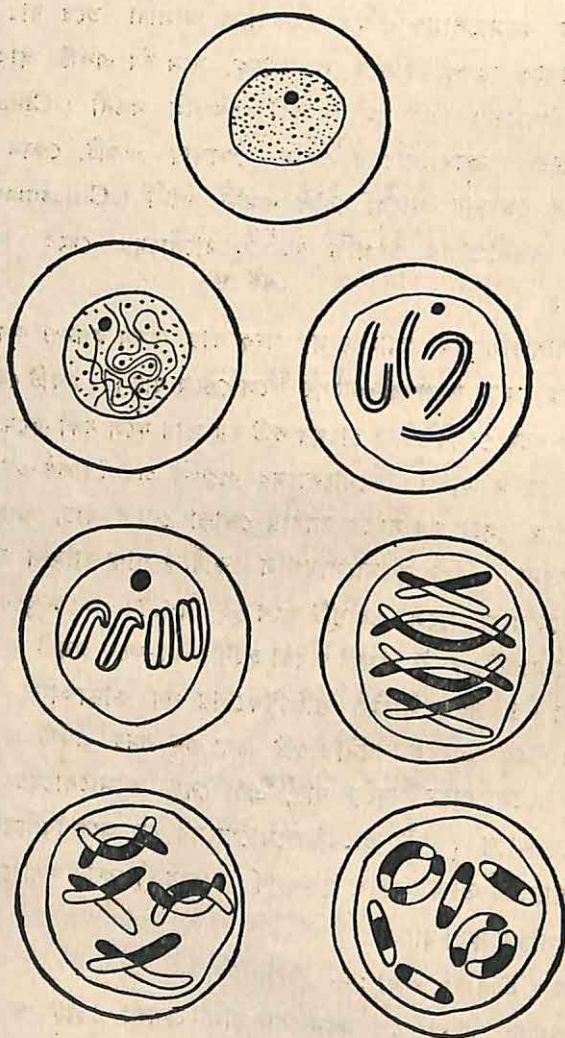
হয় দেখাযায় বন্ধনীগুলি একেবারে প্রান্ত সীমায় এসে গেছে, এবং এর পরেই ক্রমোসোমগুলি আলাদা হয়ে যাবে। বিকর্ষণ (**Diakinesis**) পর্ব্বেই বন্ধনীগুলির পূর্ণ সম্প্রসারণ হয়।

বিকর্ষণ (Diakinesis) পর্ব্বের শেষে প্রাণকেন্দ্রের আবরণী বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইখানেই যৌনকোষ বিভাগের প্রথমাবস্থার সমাপ্তি এবং মধ্যাবস্থার (Metaphase I) শুরু।

মধ্যাবস্থা (Metaphase I)—

প্রাণকেন্দ্রের আবরণী বিলুপ্ত হবার পরেই ক্রমোসোমগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোষ মধ্যে অবস্থিত মেরুবিন্দু (Centriole) বিভক্ত হয়ে দুইপ্রান্তে চলে যায়। মেরুপ্রান্ত থেকে প্রটিন স্তর দিয়ে তৈরী একটি বক্র পৃষ্ঠের (Spindle) সৃষ্টি হয়। ক্রমোসোমগুলি এই সময় বক্র পৃষ্ঠের মধ্যরেখার কাছাকাছি অবস্থান করে। বক্র পৃষ্ঠের প্রোটিন স্তরের সঙ্গে ক্রমোসোমগুলির স্থিতি বিন্দুই শুধু সংযুক্ত থাকে, অন্য কোন অংশ নয়। এই সময় ক্রমোসোমে কোন বন্ধনী নেই শুধু ক্রোমাটিডগুলি স্থিতি বিন্দু দিয়ে জোড়া।

মধ্যাবস্থার প্রধান কাজ হল বক্র পৃষ্ঠের সংগঠন এবং বক্রপৃষ্ঠের মধ্যরেখায় ক্রমোসোমগুলির সম্মিলন।

অন্ত অবস্থা (Anaphase) :—

এই সময় ক্রমোসোমগুলি বিপরীত মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে। স্থিতি বিন্দু কিন্তু এখনো বিভক্ত হয়নি এবং ক্রোমাটিডগুলি স্থিতিবিন্দু দিয়ে জোড়া অবস্থায় মেরু বিন্দুর দিকে সরে যেতে থাকে। এই অবস্থাতেই ক্রমেসোমগুলি মেরু প্রান্তে গিয়ে পৌছায়। অন্ত অবস্থায় দেখা যায় ক্রমোসোমগুলি মন্থর গতিতে মেরু প্রান্তের দিকে সরে সরে যাচ্ছে।

শেষ অবস্থা (Telophase) :—

ক্রমোসোমগুলি মেরু প্রান্তে পৌছালে কোন কোন প্রাণী এবং উদ্ভিদে প্রাণকেন্দ্রের আবরণী সৃষ্টি হয় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই অবস্থাতেই প্রাণকেন্দ্রের আবরণী সৃষ্টি হয় না। মেরুপ্রান্তে ক্রমোসোমগুলি একসঙ্গে থাকে এবং এখানে ক্রমোসোমগুলিকে আলাদাভাবে বোঝা যায় না।

এর পরে যৌনকোষটি দুইভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং দুইটি নূতন কোষের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় বিভাগ

প্রথম বিভাগ ও দ্বিতীয় বিভাগের মাঝে বিরামপর্ব খুব অল্প সময় নেয়।

দ্বিতীয় বিভাগ হয় অত্যন্ত দ্রুত। প্রথম বিভাগের শেষ অবস্থার পরই স্বল্প বিরতীর সুযোগে দ্বিতীয় বিভাগের প্রস্তুতি হয়।

দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম অবস্থা (Prophase) অত্যন্ত স্বল্প মেয়াদী। প্রথমাবস্থা, মধ্যাবস্থা, অন্ত অবস্থা, ইত্যাদি প্রায় দেহকোষ বিভাগের মতই। শুধুমাত্র এই দ্বিতীয় বিভাগের অন্তপর্বে স্থিতিবিন্দু বিভক্ত হয়ে যায়। সংলগ্ন ক্রোমটিডগুলি এই সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরস্পরের কাছ থেকে। ক্রোমাটিডগুলি বক্রপৃষ্ঠের প্রোটিন স্তরের সঙ্গে স্থিতিবিন্দু দিয়ে সংযুক্ত অবস্থায় বিপরীত মেরুবিন্দুর দিকে সরে সরে যায়। দ্বিতীয় বিভাগের শেষ অবস্থার ক্রমোসোমগুলি মেরুবিন্দুর কাছাকাছি পৌছালে প্রাণকেন্দ্রের আবরণী সৃষ্টি হয়। এর পরে যৌনকোষটি দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এখানে বিভিন্ন পর্য্যায় অত্যন্ত দ্রুতবলে তার বিশদ তথ্য পাওয়া যায়না এবং ক্রমোসোম দ্বিগুনিত হয়না। এর ফলে যৌনকোষ বিভাগের ফলে উৎপন্ন কোষগুলিতে ক্রমোসোম থাকে একক অবস্থায়।

ক্রমোসোম

মেণ্ডাল জানতেননা যে জীবদেহে বিভিন্ন কোষের মধ্যে কি আছে না আছে তার কারণ সে সময়ে এ-সম্বন্ধে বিশেষ কোনই কাজ হয়নি। কাজেই মেণ্ডাল যে পদার্থের (factor) কথা বলতেন, তাছিল মেণ্ডালের সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মেণ্ডালের ধারণা ছিল যে জীবদেহের অভ্যন্তরে কোথাও কিছু থাকে যা যৌনকোষের মাধ্যমে পিতামাতার দেহ থেকে আসে এবং যৌন কোষের মাধ্যমেই আবার সন্তানদের দেহে যায় পরবর্ত্তী বংশে। বংশানুক্রমিক ভাবে এই পদার্থগুলি বিভিন্ন চরিত্র বহন করে চলে। এখন বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই জিজ্ঞাস্য হবে কি এই পদার্থ এবং জীবদেহের কোথায় কি ভাবে থাকে এবং কিভাবেই বা যৌন কোষ তা বহন করে বংশানুক্রমিক ভাবে। মেণ্ডালের যুগে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিলনা কিন্তু এখন আমাদের পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ।

১৯১১ সালে জোহানসেন (Johansen 1911) মেণ্ডালের কল্পিত পদার্থের নাম দিলেন জীন (Genes)। এই জীন হল বিভিন্ন ক্রমোসোমের বিশেষ অংশের নাম। এই ক্রমোসোম সূত্রগুলি জীব কোষে জোড় সংখ্যায় থাকে। প্রত্যেক প্রজাতির ক্রমোসোম সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট। যৌন কোষে এই ক্রমোসোম সূত্র আসে একক ভাবে অর্থাৎ প্রতি জোড়ার একটি। অর্থাৎ যৌন কোষে ক্রমোসোম সংখ্যা হয়ে যায় দেহ কোষের ক্রমোসোম সংখ্যার অর্দ্ধেক। শুক্র ও ডিম্ব কোষ এই দুইয়ের মিলনে জীব দেহ সৃষ্টির সময়ে ক্রমোসোম সংখ্যা আবার আগের সংখ্যায় পরিণত হয়। যেমন কোন প্রাণীর হয়ত ক্রমোসোম সংখ্যা আটচল্লিশ অর্থাৎ চব্বিশ জোড়া। শুক্র বা ডিম্ব কোষ বহন করে প্রতি জোড়ার একটি অর্থাৎ চব্বিশটি। শুক্র বা ডিম্বের মিলনে যে সন্তান সৃষ্টি হয় তার দেহে, ক্রমোসোম সংখ্যা হয় চব্বিশ জোড়া অর্থাৎ আটচল্লিশটি। অর্থাৎ যৌন প্রজননের ফলে সৃষ্ট প্রত্যেক প্রাণীদেহে ক্রমোসোম সংখ্যার অর্দ্ধেক থাকে মাতৃদত্ত ও বাকি অর্দ্ধেক পিতৃদত্ত।

জীব কোষের উপর বিশ্লেষণ মূলক কাজ যত বেশি আরম্ভ হল দেখাগেল

যে জীবকোষের বিভিন্ন কাজে ক্রমোসোম সূত্রের প্রভাব অবিচ্ছেদ্য। শুধু তাই নয় বংশধারানুক্রমে ক্রমোসোম সূত্রই নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার বাহক। জীবদেহের স্ত্রী পুরুষ সংগা নির্ণয় ও ক্রমোসোম সূত্রই করে। অবশ্য স্ত্রী পুরুষ সংগা নির্ণয় জটিল তত্ব। সেখানে অন্যান্য অনেক কিছুই আছে যা প্রভাব বিস্তার করে এমন কি জীব পঙ্ক (**Cytoplasm**) পর্য্যন্ত। এ সম্পর্কে গোল্ডস্মিডটের (**Gold schmidt**) সারা জীবনের সাধনা ও তার অমূল্য ফলাফল জীপসি মথের (**Lymantria dispar**) উপরে প্রমাণিত, তবে তার অলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখা ভাল যে স্ত্রী পুরুষ সংগা নির্ণয়ে ক্রমোসেমের প্রভাবও অপরিহার্য্য। তবে সব কিছুর মিলিত ফল কার্য্যকরী হয়।

১৯০১ সালে ম্যাকক্লাং (**Mc clung 1901**) দেখলেন যে ফড়িং জাতীয় পতঙ্গের জীব কোষে ক্রমোসোম সংখ্যা ঠিক জোড় সংখ্যায় নেই, একটি কম এবং তা পুরুষ প্রাণীর দেহে শুধু। স্ত্রী ফড়িংয়ে তিনি দেখলেন যে একটি ক্রমোসোম বেশি হয়ে ঠিক জোড় সংখ্যায় আছে। পুরুষের ক্ষেত্রে তিনি দেখলেন শুধু একটি ক্রমোসোমের জোড়াটি নেই অন্যগুলি ঠিক জোড়ায় জোড়ায় আছে। স্ত্রী ফড়িংয়ের দেহে ঐ একক ক্রমোসোমটিও সঙ্গী সহ অর্থাৎ জোড় সংখ্যায় আছে। এর ফলে স্ত্রী ও পুরুষের দেহে ক্রমোসোম সংখ্যা এক নয়, একটিতে যদি সতের হয় অন্যটিতে আঠার। ম্যাকক্লাং ঐ ক্রমোসোমটির নামকরণ করলেন যৌন ক্রমোসোম (**Sex chromosome**) কারন স্ত্রী পুরুষের সংগা নির্ণয়ের সাহায্য করে ঐ ক্রমোসোমটি। পরে আরো দেখা গেল যে যৌন ক্রমোসোম কোন কোন প্রাণীর দেহে স্ত্রী প্রাণীর কোষে একক অবস্থায় থাকে, পুরুষ প্রাণীর দেহে সঙ্গী সহ। আবার কোন কোন প্রাণীর দেহে এমনও দেখা গেল যে যৌন কোষ স্ত্রী পুরুষ কোন দেহেই একক নয় তবে যে কোন একটিতে অসম জোড় অর্থাৎ সঙ্গী ক্রমোসোমটি আকারে ও প্রকৃতিতে পৃথক।

ক্রমোসোম সংখ্যা প্রত্যেক প্রজাতীর একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা। যেমন কোন কোন পতঙ্গের ক্রমোসোম সংখ্যা ষোল, আঠার, কুড়ি, ড্রসোফিলা পতঙ্গের (**Drosophila**) আট, পাখীদের হয়ত একশ পঞ্চাশ, একশ কুড়ি, এমিবার পাঁচশ অথবা আরো বেশি, ইত্যাদি। আবার এই ক্রমোসোম সূত্র গুলির প্রতি জোড়ারই নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট

থাকার দরুণ এই ক্রমোসোমগুলি নিজের জোড় ক্রমোসোমটির সঙ্গে ছাড়া একত্র মেলেনা। এই জোড়ার ক্রমোসোমগুলি কিন্তু পরস্পর হুবহু অনুরূপ এবং শুধুমাত্র হুবহু অনুরূপ ক্রমোসোমেরাই একসঙ্গে জোড়া বেঁধে থাকে। ক্রমোসোম সূত্রের এই আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য ভিন্ন প্রজাতীর সঙ্কর সম্ভব নয়, অথবা কোথাও সম্ভব হলেও তার বংশ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কেন নয় তার পূর্ণ বিশ্লেষণ আমরা করব, কারণ তার আগে জানা প্রয়োজন ক্রমোসোমের সম্পূর্ণ পরিচয়।

জীব কোষে প্রাণকেন্দ্রের অভ্যন্তরে এই সরু সূতার মত আকৃতির পদার্থ-গুলির ক্রমোসোম নাম দেন ওয়ালডেয়ার (Waldeyer 1888) ১৮৮৮ সালে। এর অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা এগুলি লক্ষ্য করেছেন এবং সতর্কতার সঙ্গে এদের পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হয় ১৮৮২ সাল থেকে ফ্লেমিং, ভনবেনডেন, স্রাসবার্জার (Fleming 1882, Strasburger 1882, Von Benden 1883) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের কাজে।

১৯০৩ সালে যখন সাটন তাঁর নিজের কাজ এবং বোভেরী ও মণ্টগোমেরীর কাজ (Sutton, Bovery and Montgomery 1903) একত্র করে বিশ্লেষণ করলেন যে মেণ্ডালের অনুসৃত বংশধারানুক্রমের নিয়মগুলি ক্রমোসোমদিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তখন বিজ্ঞানীরা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হলেন ক্রমোসোমের দিকে। এই সময় থেকে ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হল ক্রমোসোম নিয়ে গবেষণা। ডর্লিংটন, সোয়ানসন, হোয়াইট, মরগ্যান, মূলার, স্টার্টেভাণ্ট, বীজেস, ক্রীক, ওয়াটসন, টাইলর, ইত্যাদি অসংখ্য বিজ্ঞানী ও গবেষক (Darlington, Swanson, White, Morgan, Muller, Stowtevant, Bridges, Crick, Watson, Tylor) ক্রমোসোম নিয়ে গবেষণা করেছেন, এখনো করছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এবং হয়ত আরো অনেকদিন বিজ্ঞানীদের কৌতূহল নিরসন করে চলবে এই ক্রমোসোম সূত্রগুলি।

ক্রমোসোম নিয়ে গবেষণায় এশিয়ার ছুটি দেশ জাপান এবং ভারতবর্ষের নাম করা যেতে পারে। জাপানে মিরস্কি, ইয়ামাসিনা, সুয়েত্তকা, ইওশিকাওয়া, কাইয়ানো, নাকামুরা (Mirsky, Yamashina, Sueoka, Yoshikaoa, Kayano, Nakamura) প্রভৃতির কাজ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে ১৯৩৮ সালে অধ্যাপক মিশ্র (A. B. Misra 1938) এবং তিনজন জাপানী গবেষক ক্রমোসোম নিয়ে কাজ করেন। ক্রমোসোম নিয়ে ব্যাপক ভাবে কাজ

করেন অধ্যাপক রায়চৌধুরী, অধ্যাপক মান্না ও এঁদের শিষ্যবর্গেরা (S. P. Roychowdhury, G. K. Manna) এবং এখনো করছেন। এছাড়া শেষাচার, রাও, শর্মা, প্রভৃতিও (G. P. Sharma, Rao, Seshachar) ক্রমোসোম নিয়ে কাজ করেছেন।

ক্রমোসোম যে বংশধারা বহন করে এই কথা সুনিশ্চিত ভাবে প্রথম জানালেন মরগ্যান (T. H. Morgan 1910 on *Drosophila Melanoguster*) ১৯১০ সালে ড্রসোফিলা পতঙ্গের উপর কাজ করে। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এইবার ক্রমোসোমের দিকে আকৃষ্ট হল বিশেষ ভাবে। দেখা গেল শুধু বংশধারা বহন করে তাই নয় ক্রমোসোমের আকৃতি ও প্রকৃতি গত বৈচিত্র ও গভীর আকর্ষণের বিষয়। সেইজন্য জীবকোষের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তার মধ্যে ক্রমোসোমের উপর কাজ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। অথচ তা সত্বেও ক্রমোসোম সম্বন্ধে অনেক তথ্যই আমাদের কাছে আজো অজানাই রয়েছে। ক্রমোসোম জীব কোষের সমস্ত কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যদিও আমরা জানি যে প্রোটিন কিভাবে কোথায় তৈরী হচ্ছে, অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া কোথায় কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার শক্তির উৎস কোথায় ইত্যাদি অনেক কিছু, কিন্তু কিভাবে ক্রমোসোম এই সব কিছুর নিয়ামক তা এখনো আমাদের সম্পূর্ণ জানা নেই। ক্রমোসোম যে বংশধারানুক্রম নিয়ন্ত্রণ করছে এ তথ্য আজ প্রশ্নের অতীত ভাবে প্রমানিত কিন্তু সেখানেও এই নিয়ন্ত্রণ ঠিক কিভাবে হচ্ছে তার সামান্য রহস্যই এখন পর্য্যন্ত আমরা জানি।

জীব কোষের মধ্যে সব সময় যে কাজকর্ম্ম চলছে তার প্রধান অংশ আকৃষ্ট করে রসায়নবিদদের, কিছু অংশ পদার্থ বিজ্ঞানীদেরও। ক্রমোসোম সংক্রান্ত যা কিছু তথ্য এখন আমরা জানি তা হল জীববিজ্ঞানী, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন গবেষণা একত্র করে।

এর আগে পর্য্যন্ত আমরা বলেছি যে ক্রমোসোমের আকৃতি লম্বা সুতার মত। কিন্তু ক্রমোসোমগুলি যখন কোষ বিভাগের সময় দুই মেরু প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে তখন তাদের সবগুলির আকৃতি এক হয় না। ক্রমোসোমের এই লম্বা আকারের একটি অংশে স্থিতি বিন্দু (Centromere) থাকে। এই স্থিতি বিন্দুর অবস্থানের উপর সঞ্চরণশীল ক্রমোসোমের আকৃতি নির্ভর করে। কোন ক্রমোসোমে এই স্থিতি বিন্দু থাকে ক্রমোসোমের মাঝখানে। এই ধরণের ক্রমোসোমকে বলা হয় মধ্যবিন্দু (Metacentric)

ক্রমোসোম। সঞ্চরণশীল অবস্থায় এদের আকৃতি হয় সমান এক জোড়া সরু পাতার মত। এদের বলা হয় জোড়পত্র ক্রমোসোম (অথবা ইংরাজী V অক্ষরের মত—'V' shaped)।

কোন ক্রমোসোমে এই স্থিতি বিন্দু থাকে কোন এক প্রান্তের দিকে কিছুটা সরে। এদের বলা হয় উপপ্রান্ত বিন্দু (Submeta centric) ক্রমোসোম। সঞ্চরণ কালে এদের আকৃতি হয় অসমান একজোড়া পাতার মত (ইংরাজী L অক্ষরের মত —L Shaped) অর্থাৎ একটি অংশ বড় অন্যটি ছোট। এদের বলাহয়—অসম পত্র ক্রমোসোম।
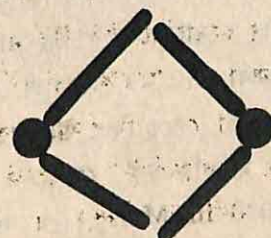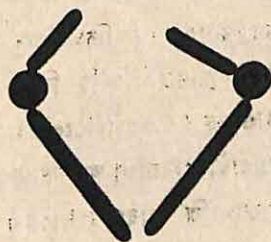
কোন কোন ক্রমোসোমে দেখা যায় স্থিতি বিন্দুটি আছে একেবারে প্রান্ত সীমার কাছে। এদের বলাহয় প্রান্ত বিন্দু (Acrocentric or Telocentric) ক্রমোসোম। সঞ্চরণকালে এদের দেখায় দণ্ডাকৃতি (Rodshaped)।

এই স্থিতিবিন্দু ক্রমোসোমটিকে কোষ বিভাগের মধ্যাবস্থায় (Metaphase Stage) মেরু বিন্দু দুইটির সংযোজক বক্রপৃষ্ঠের প্রোটিন স্তরের সঙ্গে ধরে রাখে। স্থিতি বিন্দুর কাজ হল ক্রমোসোমটিকে প্রোটিন স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করা। কোন কোন ক্রমোসোমে স্থিতি বিন্দু হিসাবে আলাদা কোন অংশ থাকেনা। সঞ্চরণকালে দেখাযায় যে এই ক্রমোসোমগুলি লম্বালম্বি ভাবে বক্রপৃষ্ঠের (Spindle) প্রোটিন স্তরের সঙ্গে লেগে আছে। অর্থাৎ ক্রমোসোমটির সম্পূর্ণ দেহটাই এই ভাবে সংযোগের কাজ করছে। বিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করেন এই ক্রমোসোমগুলির সর্ব্বত্র এই স্থিতি বিন্দুর মূল পদার্থ মিশ্রিত (Diffused centromere) থাকে। এই ধরণের ক্রমোসোমগুলিও দণ্ডাকৃতি তবে প্রান্ত বিন্দু ক্রমোসোমের সঙ্গে পার্থক্য এই যে প্রান্ত বিন্দু ক্রমোসোমগুলি সঞ্চরণশীল অবস্থায় মধ্য রেখার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে থাকে ; এবং এইগুলি থাকে লম্ব ভাবে।

সঞ্চরণশীল অবস্থায় ক্রমোসোমের আকৃতি নির্ভর করে প্রধানতঃ স্থিতি বিন্দুর অবস্থান ও প্রকৃতির উপর। স্থিতি বিন্দু দেহকোষ বিভাজনের মধ্যাবস্থায় স্পষ্টভাবে দেখা যায়না। স্থিতি বিন্দু যেখানে থাকে সেখানে ক্রমোসোমগুলি একটু চাপা ও সরু (Constricted) মনে হয়।

স্থিতিবিন্দুর অবস্থান অনুযায়ী এই চাপা অংশটি কখনও মাঝখানে কখনও একপ্রান্তে কখনও দুইএর মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। কোন কোন উদ্ভিদে এবং প্রাণীতে (In Maize and Drosophila) বলয়াকৃতি ক্রমোসোমও দেখা গেছে, তবে স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। এই অস্বাভাবিক অবস্থার ক্রমোসোমগুলি বেশিদিন থাকেনা। অবশ্য বলয়াকৃতি এক্স ক্রমোসোম আছে (X chromosome.—যৌন ক্রমোসোমের বড়টির নাম এক্স এবং ছোটটির নাম ওয়াই) এমন ড্রসোফিলা পতঙ্গের বংশধারা গবেষণাগারে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় স্থায়ী হয় এমন দেখা গেছে কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্কোয়ার্জ এবং ম্যাকক্লিনটক দেখেছেন (Schwartz 1953, Mc clintock 1932, 1938 in Maize) যে বলয়াকৃতি ক্রমোসোমের আকারের পরিবর্ত্তন হয় এবং প্রায়শঃই তারা নষ্ট হয়ে যায় অথবা হারিয়ে যায়।

কোন ক্রমোসোম যদি হারিয়ে অথবা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই ক্রমোসোমের কোন জীনের প্রভাব যদি বহির্মুখী হয় তাহলে ঐ জীনটির অভাবে বাইরের সেই চরিত্রটির পরিবর্ত্তন হয়। যেমন কোন উদ্ভিদ লাল রঙের ফুল দেয়। ফুলের রং নিয়ন্ত্রণ করে যে জীন (Gene) সেইটি যে ক্রমোসোমে আছে সেই ক্রমোসোমটি হারিয়ে যাওয়ার ফলে ফুলের রং হয়ে গেল সাদা। এই পার্থক্য হল একটি ক্রমোসোমের অভাবের ফলে। একটি ক্রমোসোমে একাধিক জীন থাকে, ফলে হয় ত আরো অনেক চরিত্রই হারিয়ে গেল। কোন ক্রমোসোম নষ্ট হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে আমরা অনুবিক্ষণ যন্ত্রে জীবকোষ পরীক্ষা করেও বুঝতে পারবো আবার বংশধারা পর্যবেক্ষণ করলে অনেক সময় বাইরে থেকে দেখেও বুঝতে পারব।

প্রান্তবিন্দু ক্রমোসোম বিভিন্ন পতঙ্গের কয়েকটি প্রজাতিতে পাওয়া যায়। খুব সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করলে মনে হয় স্থিতি বিন্দুটি ক্রমোসোমের শেষ প্রান্তে রয়েছে। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে স্থিতি বিন্দুর পরে ক্রমোসোমের খুব সামান্য অংশ আছে যা খুবই ছোট। অর্থাৎ এই স্থিতি বিন্দুটি একেবারে শেষ প্রান্তে নয় কিছু আগে। এধরণের চিন্তাধারার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। ড্রসোফিলা পতঙ্গের এক্স ক্রমোসোমটিই একথা প্রমাণ করেছে। আগে মনে করা হত এই ক্রমোসোমটির স্থিতি বিন্দু একেবারে শেষ প্রান্তে রয়েছে।

কোন কোন প্রাণীতে যে প্রকৃত প্রান্তবিন্দু ক্রমোসোম পাওয়া যায় তা পরিস্কার ভাবে দেখিয়েছেন ক্লীভল্যাণ্ড (Cleve land 1949) ১৯৪৯ সালে। অবশ্য তারও আগে একশ্রেণীর পতঙ্গের বিভিন্ন প্রজাতিতে এই ধরণের ক্রমোসোমের সন্ধান প্রথম পাওয়া যায় এবং তা ১৯৪১ সালে হিউজেস এবং রিসএর গবেষণায়। পরে আরো অনেকেই যেমন স্রাভার, হিউজেস স্রাভার, ম্যালহীরস, ডি কাস্ত্রো, ক্যামারা, অষ্টার গ্রেন, ব্রাউন প্রভৃতি (Hughes & Ris 1941, Hughes Schradar 1948, Schradar 1953 in Hemiptera ; Malheiros, deCastro and Camara 1947, Ostergren 1949, Brown 1954 in Plants) এই ধরণের ক্রমোসোমের সন্ধান দেন পতঙ্গে এবং উদ্ভিদেও।

কোন কোন ক্রমোসোমে দেখাযায় একপ্রান্তে একটি ছোট্ট অংশ মূল ক্রমোসোমের সঙ্গে খুব সরু সুতার মত অংশ দিয়ে জোড়া। এই ছোট্ট

অংশটিকে উপপ্রান্ত (**Tarbants or Satellites**) বলা হয়। এই উপপ্রান্ত কেন্দ্রমণি সৃষ্টির সহায়তা করে।

ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্য এবং সংখ্যা এক এক প্রজাতিতে এক এক রকম। কোথাও ক্রমোসোম সংখ্যা কম, আকারে বেশ বড়। কোথাও আকারেও বড় সংখ্যাতেও বেশী, কোথাও আকারে খুবই ছোট এবং সংখ্যায় অনেক। কোথাও ছোট বড় মিলিয়ে।

একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে জীনের সংখ্যা বেশী হলেই ক্রমোসোম আকারে বড় হবে। একথা মনে করার পেছনে যে যুক্তি দেওয়া যায়না তা নয়। ড্রসোফিলা পতঙ্গের তিনটি বড় ক্রমোসোমই সবচেয়ে বেশী জীন বহন করে,— এবং এখানে জীনের সংখ্যা দৈর্ঘ্যের অনুপাতেই। আবার ঐ পতঙ্গেই ওয়াই ক্রমোসোম আকারে যথেষ্ট বড় হওয়া সত্বেও তাতে কোন জীন নেই বললেই চলে। অতএব জীনের সংখ্যার সঙ্গে ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্যের কোন সম্পর্ক নেই।

কোষ বিভাজন যদি কম উত্তাপে হয় তাহলে ক্রমোসোমের আকার ছোট হয়। এর কারণ সম্ভবতঃ কম উত্তাপের প্রভাবে ক্রমোসোমের সঙ্কোচন। কোষ বিভাজন যদি খুব দ্রুত হয় তাহলেও ক্রমোসোম আকারে ছোট হয়। ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য যে কারণেই হোক একই গোষ্ঠি ভুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতিতে অনেক সময় গভীর তারতম্য দেখা যায়। সাধারণতঃ ছত্রাক শ্রেণীর উদ্ভিদে ক্রমোসোমগুলি সংখ্যায় ক্ষুদ্রতম। কিন্তু নিউরোস্পোরা (**Neurospora**) ছত্রাক হলেও তার ক্রমোসোম আকারে যথেষ্ট বড় এবং গবেষণার পক্ষে আদর্শ। সাধারণতঃ একবীজপত্রী উদ্ভিদে (**Monocot plant**) ক্রমোসোমের আকার বড় হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। প্রাণী জগতে 'বিভিন্ন প্রজাতির ফড়িং এর দেহে ক্রমোসোম খুব বড়। উভচর প্রাণীর দেহেও ক্রমোসোম খুব বড়। মানব দেহের ক্রমোসোম ও আকারে খুব ছোট নয়।

ক্রমোসোমের আকার :—

প্রাণী বা উদ্ভিদ	ক্রমোসোম সংখ্যা	আকার
ড্রসোফিলা	৮/১০	৩·৫ মাইক্রন গড়ে
ভুট্টা	১০	৮—১০ মাইক্রন
মানব দেহ	৪৮/৪৬	৪—৬ মাইক্রন

অনেক সময় দেখা যায় যে ক্রমোসোমের আকার খুব ছোট, হয়ত একটি বিন্দুর মত। তাহলে সাধারণ অনুবিক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়না এমন ক্রমোসোমও ত থাকতে পারে। ১৯৪৬ সালে ড্রসোফিলা পতঙ্গে কোদানী এবং স্টার্ণ (Kodani & Stern 1946) এই ধরণের এক অদৃশ্য ক্রমোসোমের কথা বলেছেন। তাহলে ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্যের সীমা কি? বড় ক্রমোসোমের আকারের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করা যায় অনেক সময়। কোন এক মেরু প্রান্ত থেকে মধ্যরেখা পর্য্যন্ত (Equatorial plane) যে দূরত্ব তার চেয়ে বড় কোন ক্রমোসোম হতে পারে না। যদি তা হয় তাহলে কোষ বিভাজনের সময় অঙ্গ হানির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আকারে ছোট ক্রমোসোম যে কত ছোট হতে পারে তার কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব নয়।

ক্রমোসোম সংখ্যা সবচেয়ে কম এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তা হল মাত্র তিন (in *Crepic Capillaris*) এবং সবচেয়ে বেশী ১৬০০ (in Aula cantha-a radiolarian) অর্থাৎ ৮০০ জোড়া। অনেক সময় একই গোষ্ঠি ভুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রমোসোম সংখ্যা বিভিন্ন হয়। যেমন গমের বিভিন্ন প্রজাতিতে ১৪, ২৮ অথবা ৪২টি ক্রমোসোম দেখা যায়। অর্থাৎ ৭, ১৪ ও ২১ হল এদের একক (Haploid) সংখ্যা। এখানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ৭ হল মূল সংখ্যা যার চারগুন ও ছয় গুন হবার ফলে অন্য দুটি প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। অতএব বিবর্ত্তন বাদের তথ্যে ক্রমোসোম সংখ্যার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমোসোম লম্বালম্বি ভাবে দুই বা তার বেশী ক্রমোণিমা দিয়ে গড়া। স্থিতিবিন্দু এই ক্রমোণিমাগুলিকে একত্র করে রাখে। এই ক্রমোণিমা হল জীন বহনকারী অংশ। অবশ্য ক্রমোণিমাতে যে শুধু জীন থাকে তা নয়, জীন নেই এমন অংশও আছে। তবে জীন নেই এমন অংশগুলি জীন অংশ-গুলিকে একত্রে ধরে রাখতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন একটি হালকা আবরণী দিয়ে ঘেরা কিছু ঘন পদার্থের মধ্যে এই ক্রমোসোমগুলি থাকে। এই ঘন পদার্থটি (Matrix) জীন নয় এমন কিছু দিয়ে তৈরী। এই ঘন পদার্থের উপস্থিতি উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন অনেকেই। ১৯৩৪ সালে ম্যাকক্লিনটক, ১৯৪০ সালে ইওয়াটা, ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালে সোয়ানসন ১৯৩৬ সালে ম্যাকিনো প্রভৃতি (McClintock 1934, Iwata 1940, Swanson 1942-43

Makino 1036) বিজ্ঞানীরা ক্রমোসোমে ঘন পদার্থের উপস্থিতির স্বপক্ষে প্রমাণ ও যুক্তি তর্ক প্রয়োগে আলোচনা করেন। কিন্তু ডার্লিংটন ১৯৩৭ সালে এবং রিস ১৯৪৫ সালে (Darlington 1937, Ris 1945) এই ঘন পদার্থের (Matrix) অস্তিত্ব অস্বীকার করে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ক্রমোসোমের বাইরের আবরণী ও ঘন পদার্থের (Matrix) উপস্থিতির কথা ১৯৪১ সালে পেইণ্টার বলেছেন ড্রসোফিলা পতঙ্গের ক্রমোসোম বিশ্লেষণ করে। ক্রমোসোমের বাইরের আবরণী যে কিছু আছে একথা মনে হয় যখন কোষবিভাজনের মধ্য অবস্থায় (Metaphase Stage) দেখা যায় যে ক্রমোসোমের বাইরেটা বেশ সমান (Plane)। স্রাডার ১৯৫৩ সালে বলেছেন (Schradar 1953) তিনি মনে করেন যে ঘন পদার্থই ক্রমোসোমের প্রধান অংশ। এ বিষয়ে তিনি জীগার, রিস এবং সেরার সঙ্গে (Jaeger 1939, Ris 1942, Serra 1947) একমত।

এই ঘন পদার্থের প্রকৃতি কি বা এর কাজ কি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়না। তবে মনে হয় এই ঘন পদার্থের সম্ভাব্য কাজ হতে পারে ক্রমোণিমা Chromonema) গুলিকে একসঙ্গে ধরে রাখা এবং কোষ বিভাগের সময় কোন রকম সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। তেজস্ক্রীয় রসায়ন প্রয়োগে ক্রমোসোমের প্রকৃতি বিশ্লেষণের যে আধুনিক প্রচেষ্টা বর্ত্তমানে চলেছে তার ফলাফল কিন্তু ঘন পদার্থের উপস্থিতির স্বপক্ষে নয়।

বংশ ধারানুক্রমের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করে আমরা জেনেছি যে ক্রমোসোমে কিছু জীন পর পর সাজান থাকে। অনেকে পরিস্কার ভাবে বোঝানোর জন্য বলে থাকেন যে ক্রমোসোম এবং জীন হল যেন সরু সুতায় গাঁথা কিছু মুক্তার মালা। কথাটায় কিছুটা সত্য আছে কারণ জীনগুলি এমনি লম্বালম্বি ভাবেই সাজান থাকে। কিন্তু এই অর্থে যদি কেউ মনে করেন যে জীন বলতে সত্যিই এমনি আলাদা প্রকৃতির কিছু পর পর গাঁথা অথবা সাজান, তাহলে ভুল হবে। জীন (Gene) হল ক্রমোসোমের এক একটি বিশেষ অংশ যার প্রভাব এক এক রকম। তবে জীন বা বংশ ধারানুক্রম জানবার অনেক আগে থেকেই কোষ তত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে আলাদা আলাদা কিছু অংশ একত্র হয়ে একটি ক্রমোসোমে থাকে এবং ক্রমোমেয়ার (Chromomere) বলা হয় এই অংশগুলিকে। একথা প্রথম বলেন ১৮৭৬ সালে ব্যালবিনি (Balbini 1876, Pfitzner 1881) এবং তাঁর পরে ১৮৮১ সালে ফিজনার।

বেলিং ১৯২৮ সালে (Belling 1928) এই ক্রমোমেয়ারগুলিকে জীন বলে ভুল করেছিলেন।

ক্রমোমেয়ার সম্পর্কে তুরকম ধারণার প্রচলন আছে। পন্টিকর্ভো, কফম্যান ইত্যাদিরা (Pontecorvo 1944, Kaufmann 1948) মনে করেন যে ক্রমোমেয়ার এবং ক্রমোণিমা আলাদা জিনিষ। এঁরা এই ধারণার কারণ হিসাবে বলেছেন যে ক্রমোণিমা বেশী পরিমাণে নিউক্লিক এসিড তৈরী করতে পারে ক্রমোমেয়ারের তুলনায়।

অন্য একদল বিজ্ঞানী মনে করেন যে ক্রমোসোম যখন স্প্রিংয়ের মত পাক খায় তখনই এই পাকানো অবস্থায় ক্রমোসোমের দেহে কোন কোন অংশ উচু উচু মনে হয়। এঁরা বলেন যে এই ক্রমোমেয়ার কল্পনার মূল কথা। ১৯৪৫ সালে রিস এই দ্বিতীয় মতবাদ (Ris 1945) নিয়ে এলেন। অতিসূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতিতে (Micro dissection) ক্রমোসোমগুলিকে দুপাশ থেকে টেনে লম্বা করে দেওয়া যায়। তখন দেখা যায় যে বস্তুটিকে আগে মনে হচ্ছিল গোল গোল কিছু গাঁথা এখন তার আকৃতি একটি পরিস্কার সোজা সূতার মতন। কোন কোন বিশেষ ধরণের ক্রমোসোমের ক্ষেত্রে যেমন গ্রন্থিবদ্ধ ক্রমোসোম এবং লালাগ্রন্থি ক্রমোসোমে (Lampbrush Chromosome and Salivary gland Chromosome) কিন্তু ক্রমোমেয়ার সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা চলেনা।

ক্রমোসোমের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল স্থিতিবিন্দু। এই স্থিতিবিন্দুটি একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় থাকে। সঞ্চরণশীল অবস্থায় ক্রমোসোমের আকৃতি নির্ভর করে স্থিতিবিন্দুর অবস্থানের উপর। এই স্থিতিবিন্দুর প্রধান কাজ হল মেরুবিন্দুর সংযোজক প্রোটিন স্তরের সঙ্গে ক্রমোসোমকে ধরে রাখা।

কোষ বিভাগের প্রথম অবস্থায় ক্রমোসোমে থাকে দুইটি ক্রোমাটিড্। স্থিতিবিন্দু এই ক্রোমাটিড্ দুটিকে একসঙ্গে জুড়ে রাখে। একটি ক্রোমাটিড থেকে অন্য ক্রোমাটিডটি তৈরী হয়। কোষ বিভাগের মধ্য অবস্থায় এই স্থিতি বিন্দুটিও বিভক্ত হয়ে যায় এবং দুইটি ক্রোমাটিড তখন দুইটি আলাদা ক্রমোসোম হিসাবে ধরা হয়।

কোষ বিজ্ঞানীরা আরো গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে ক্রমোণিমা, ক্রমোমেয়ার ইত্যাদি পর্য্যায়ে এসেছেন। বংশধারানুক্রমের পর্য্যবেক্ষকরা কিন্তু ক্রোমা-

টিডের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট। এর কারণ ক্রোমাটিডের কোন অংশের ভাঙ্গাগড়া, অংশ বিনিময় ইত্যাদির ফলে বংশানুক্রমের অনেক বৈচিত্র আসতে পারে।

মূলার ১৯৩৮ সালে ক্রমোসোম সম্বন্ধে আর একটি তথ্য সংযোজন করেন যে (Muller 1938) ক্রমোসোমের উভয় প্রান্তের শেষতম বিন্দুটিকে অন্তবিন্দু (Telomere) বলা যেতে পারে। দেখা যায় যে ক্রমোসোমের মাঝের কোন অংশ যদি ভাঙ্গা অবস্থায় থাকে, তার প্রধান প্রচেষ্টা হয় অনুরূপ কোন কিছুর সঙ্গে জুড়ে যাওয়া। অর্থাৎ মাঝের কোন অংশের স্বাভাবিক স্থায়িত্ব (Stability) নেই। অন্তবিন্দু (Telomere) ক্রমোসোমকে এই স্থায়িত্ব (Stability) দেয়। অন্তবিন্দু আছে বলেই পুর্ণাঙ্গ একটি ক্রমোসোম অন্যটির সঙ্গে জুড়ে যায় না।

এপর্য্যন্ত ক্রমোসোম সম্বন্ধে যে আলোচনা আমরা করেছি তা হল সাধারণ দেহকোষ এবং যৌনকোষে যে ক্রমোসোম দেখা যায় সেই সম্বন্ধে। এ ছাড়া কিছু বিশেষ ধরণের ক্রমোসোম আছে যেগুলি সাধারণ ক্রমোসোম থেকে আকৃতি ও গঠনে সম্পূর্ণ পৃথক। এই বিশেষ ধরণের ক্রমোসোম পর্য্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে লালা গ্রন্থি ক্রমোসোম (Salivary gland Chromosome or Giant Chromosome) এবং গ্রন্থিবদ্ধ (Lampbrush Chromosome) ক্রমোসোমের।

গ্রন্থিবদ্ধ ক্রমোসোম :—মেরুদণ্ডি প্রাণীর দেহকোষে এবং যৌন কোষে যে সাধারণ ক্রমোসোম থাকে কোন কোন অবস্থায় তারা বিশেষ রূপ নেয়। যে সব ডিম্বকোষে কুসুমের অংশ (Yolk portion) বেশী, সেখানে কোষ বিভাগের আকর্ষণ পর্ব্বে (Diplotene Stage) সাধারণ ক্রমোসোমগুলির বিচিত্র পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমোসোমের যে উচু নিচু অংশ বা ক্রমোমেয়ার, সেগুলি থেকে ক্রমোসোমের দুই পাশে সুতার ফাঁসের মত আকৃতি (Loops) গড়ে ওঠে। ক্রমোসোমগুলি এই সময় আকারে খুব বড় হয়ে যায়। শুধু মেরুদণ্ডি প্রাণীর ডিম্বকোষেই নয় কিছু কিছু অমেরুদণ্ডি প্রাণীর শুক্রকোষে ও এই ক্রমোসোম দেখা যায়। মেরুদণ্ডি প্রাণীর ডিম্বকোষে এই ক্রমোসোম দেখিয়েছেন ডিউরী, গল এবং এলফার্ত (Duryee 1941, 1950, Gall 1952, 54, 56, Altert 1954), প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। ১৯৪৫ সালে রিস (Ris 1945) অমেরুদণ্ডি প্রাণীর শুক্রকোষে এই ক্রমোসোম দেখান।

ডিউরী মনে করেন যে ক্রমোসোমে ছোট বড় কিছু দানার মত অংশ

থাকে। প্রতিজোড়া ক্রমোসোমে ১৫০ থেকে ২০০ এই দানা থাকে। এর মধ্যে যেগুলি ছোট সেগুলিকে বলা হয় ক্রোমিওল (**Chromiole**) এবং বড়গুলিকে ক্রোমাটিড (**Chromatid**) বলা হয়। ক্রোমাটিডগুলি কখন কখন ডিম্বাকৃতিও হয়। এই ক্রোমাটিডগুলি থেকেই দুই পাশে সুতার ফাঁসের মত (**Loops**) আকৃতি গড়ে ওঠে।

ডিম্বকোষে দেখা যায় যে ক্রমোসোমের দুই পাশের এই গ্রন্থিগুলি আকারে ও সংখ্যায় সবচেয়ে বড় হয় কোষ বিভাগের প্রথমাবস্থার আকর্ষণ (**Diplotene**) পর্ব্বে। এর পর ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং মধ্যাবস্থায় (**Metaphase**) খুবই কম হয়ে যায় অথবা থাকেনা। একটি ক্রমোমেয়ারে নয়টি পর্য্যন্ত এমনি গ্রন্থি দেখা যায়। এই গ্রন্থির (**Loops**) সংখ্যা ও দৈর্ঘ্যের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। উভচর শ্রেণীর (**Amphibian**) প্রাণীতেই কোন কোন প্রজাতিতে এই গ্রন্থির দৈর্ঘ্য ৯·৫ মাইক্রন আবার কোন প্রজাতিতে ২০০ মাইক্রন। গ্রন্থিসংখ্যা কোষ বিভাগের পরবর্ত্তী পর্ব্বে কমে যায়। এগুলি আবার সঙ্কুচিত হয়ে ক্রমোসোমের দেহে মিশে যায় না। গ্রন্থিগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এই গ্রন্থিগুলি ক্রমোসোমের দুই পাশে জোড়ায় জোড়ায় থাকে। প্রত্যেক গ্রন্থির একপাশের অংশ মোটা এবং ভারী হয় অন্য পাশের অংশটি সরু এবং হাল্কা থাকে। গ্রন্থিবদ্ধ ক্রমোসোমে সাধারণ ক্রমোসোমের মতই ভাঙ্গাগড়া, অংশ পরিবর্ত্তন ইত্যাদিও (**Chiasmata & Crossingover**) দেখা যায়।

গ্রন্থিবদ্ধ ক্রমোসোমের আর একটি প্রকৃতি হল সম্প্রসারনশীলতা। দেখা যায় এই অবস্থায় ক্রমোসোমগুলির সম্প্রসারণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। অতিসূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতিতে (**Micro dissection**) ক্রমোসোমগুলিকে দুই পাশ থেকে টেনে ধরলে দেখা যায় ক্রমোসোমগুলিকে স্বাভাবিক দৈর্ঘের বহুগুণ পর্য্যন্ত লম্বা করা যায়। এইভাবে টেনে লম্বা করে রাখার পর আবার ছেড়ে দিলে ক্রমোসোমগুলি আবার আগেকার মত হয়ে যায়। দৈর্ঘ্য অথবা আকৃতির একটু ও পরিবর্ত্তন হয় না।

বিভিন্ন রসায়ণ প্রয়োগে ক্রমোসোমগুলি সঙ্কুচিত হয়। দেখা যায় যে স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের এক পঞ্চমাংশ পর্যন্ত এই সঙ্কোচন হতে পারে। সম্প্রসারন বা সঙ্কোচনের ফলে ক্রমোমেয়ারগুলির স্বাতন্ত্র কিন্তু নষ্ট হয় না। অবশ্য সঙ্কোচনের ফলে দেখা যায় ক্রমোমেয়ারগুলি একত্র হয়ে এসেছে। এই থেকে স্বভাবতঃই মনে হয় যে সম্প্রসারনশীলতা বা সঙ্কোচনশীলতা ক্রমোমেয়ারগুলির

মাঝের অংশেরই প্রকৃতি। লালাগ্রন্থি ক্রমোসোমেও (Salivary gland Chromosome) দেখা যায় এই একই প্রকৃতি। গ্রন্থিবদ্ধ ক্রমোসোমের (Lamp brush Chromosome) দুই পাশের গ্রন্থিগুলি কিন্তু ভঙ্গুর। সম্প্রসারনের সময়ে দেখা যায় এগুলি প্রায় সময়েই ভেঙ্গে যায়।
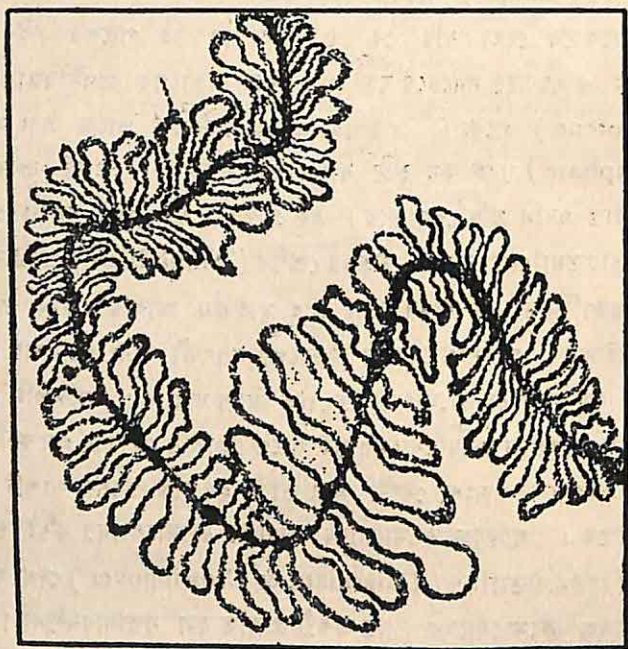
আকৃতি ও প্রকৃতির বিশেষত্বে গ্রন্থিবদ্ধ ক্রমোসোম যে কোষ বিজ্ঞানে আগ্রহীদের কাছে আকর্ষণীয় তাতে সন্দেহ নেই।

লালাগ্রন্থি ক্রমোসোম :—

কোন কোন প্রজাতির পতঙ্গের লালাগ্রন্থিতে (Salivary gland) এক ধরনের বড় ক্রমোসোম (Giant Chromosome) পাওয়া যায়। এদের আকার সাধারণ ক্রমোসোমের তুলনায় বহুগুণ এবং আকৃতিতেও অনেক বিশেষত্ব আছে।

এই অতিকায় ডোরাকাটা ক্রমোসোমগুলি আবিষ্কার করেন ব্যালবিয়ানী ১৮৮১ সালে (Bal Biani 1881) এক শ্রেণীর পতঙ্গের লালাগ্রন্থির কোষে। বিজ্ঞানীরা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে উদাসীন ছিলেন এই বিশেষ শ্রেণীর ক্রমোসোমগুলির বিষয়ে। ১৯৩০ সালে কোসতফ্ বললেন যে (Kostoff 1930)

ক্রমোসোমে জীনগুলি পরপর সাজান থাকে। এই বিশেষ ধরনের ক্রমোসোমে দেখা যাচ্ছে যে সরু মোটা দাগগুলিও পর পর সাজান থাকে। পর পর সাজান জীন এবং পর পর সাজান আড়াআড়ি ভাবে রেখা চিহ্নিত অংশ এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকা কি সম্ভাব্য বলে মনে হয়না? কোসতফ্ যে প্রশ্নটি তুলে ধরলেন বিজ্ঞানীদের মনে তা সাড়া জাগাল গভীর ভাবে। লালাগ্রন্থি ক্রমোসোম নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন অনেকেই।

হিৎস এবং বাউয়ার ১৯৩৩ সালে এবং পেইন্টার ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ সালে (Heitz and Bauer 1933, Painter 1933, 34) জানালেন যে এই ক্রমোসোমগুলি প্রত্যেকটিই আসলে ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় একজোড়া ক্রমোসোম।

বংশধারানুক্রম এবং কোষ বিজ্ঞানের গবেষনার জন্য লালা গ্রন্থিক্রমোসোম খুবই উপযোগি কারন আকারে এগুলি সবচেয়ে বড়। ড্রসোফিলা পতঙ্গের সাধারণ দেহকোষের ক্রমোসোমের তুলনায় লালাগ্রন্থি ক্রমোসোম প্রায় একশ গুণ বড়। এই বিশেষ ধরনের ক্রমোসোমগুলির দুটি প্রধান চরিত্র হল অতিঘন সন্নিবদ্ধতা ও আড়াআড়ি ভাবে রেখা চিহ্নিত দেহ। এই ক্রমোসোমগুলিতে গাঢ়রঙের এবং হাল্কা রঙের অংশগুলি (Chromatic and achromatic) পর পর সাজান থাকে। এই রেখাগুলির প্রস্থ এবং আকৃতিগত পার্থক্য প্রত্যেকটি রেখার স্বাতন্ত্র বজায় রাখে। সেজন্য এই ক্রমোসোমের যে কোন অংশ সহজে চিনে রাখা যায়। ক্রমোসোমের উপর জীনের অবস্থান চিহ্নিত করে ক্রমোসোমের মানচিত্র প্রস্তুতের কাজে এই গুণটি বিশেষ প্রয়োজনে লাগে। একই ক্রমোসোমের দেহে যখন খুব সামান্য কোন পরিবর্ত্তন হয় সাধারণ ক্রমোসোমে তা বোঝা যায় না, কিন্তু এই বিশেষ ধরনের ক্রমোসোমে সূক্ষ্মতম দৈহিক পরিবর্ত্তন ও সহজেই ধরা পড়ে।

ড্রসোফিলা পতঙ্গের লালাগ্রন্থি কোষের প্রাণকেন্দ্রে দেখা যায় যে একটি কেন্দ্রাংশ থেকে (Chromocentre) পাঁচটি বড় ফিতার মত অংশ জড়িয়ে রয়েছে এবং কেন্দ্রাংশের কাছে একটি খুবই ছোট গোল অংশ রয়েছে। এই ছোট অংশটি ড্রসোফিলা পতঙ্গের চতুর্থ ক্রমোসোম। বড় অংশ পাঁচটির একটি এক্স ক্রমোসোম। অন্য চারটি অংশ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্রমোসোমের দুই বাহু। দেহকোষে ওয়াই ক্রমোসোমের আকার যদিও খুবই বড়, লালা গ্রন্থি কোষে নয়। লালাগ্রন্থি কোষে দেখা যায় যে কেন্দ্রাংশে ওয়াই ক্রমোসোমের অল্প দুই একটি রেখা দেখা যাচ্ছে।

চতুর্থ ক্রমোসোমটি আকারেও ছোট এবং এর দেহে শুধু অল্প কয়েকটি রেখা দেখা যায়। ওয়াই ক্রমোসোমের প্রায় সবটাই ঘন ক্রোমোটিন (Hetero Chromatin) দিয়ে তৈরী এবং অন্য ক্রমোসোমগুলির ঘন ক্রোমাটিন অংশ কেন্দ্রাংশের কাছাকাছিই থাকে। লালাগ্রন্থি ক্রমোসোমগুলিকে এইভাবে
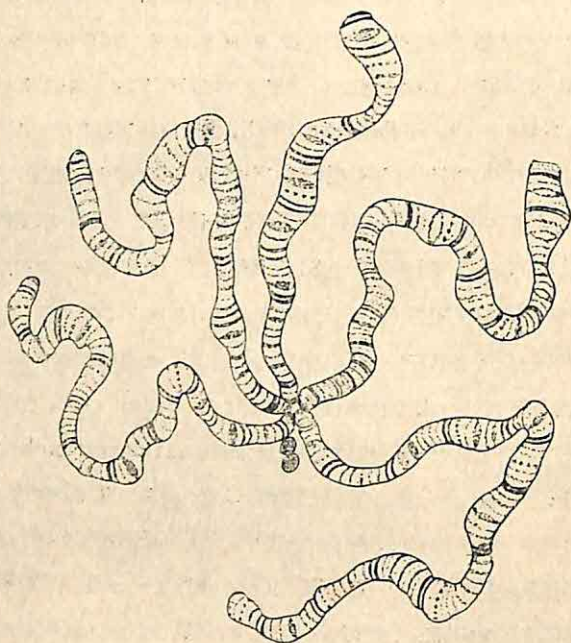
একত্রিত অবস্থায় শুধু ড্রসোফিলা পতঙ্গেই দেখা যায়। অথচ একই গোষ্ঠির অন্যান্য প্রজাতিতে Chironomus, Sciara, Comptomy etc) এধরণের একাগ্রতা দেখা যায় না।

লালাগ্রন্থি ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্যের এই বিশালতার কারণ কি তা খুব সহজে বলা সম্ভব নয়। সাধারণ ক্রমোসোমের পাকান অংশগুলি খুলে সোজা হয়ে গেলেও এতবড় আকৃতি পাওয়া যাবেনা। অবশ্য ক্রমোসোমগুলির রাসায়নিক সংগঠনের অনুপরমানুর ঘন সন্নিবদ্ধতা সরল হয়ে যাবার ফলে এই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়েছে কিনা বলা সম্ভব নয়।

সাধারণ ক্রমোসোম কিভাবে এই বিশেষ অবস্থায় পরিণত হয় সে সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন বহু বিজ্ঞানীই, যেমন ১৯৩৭ সালে বাক্, ১৯৩৮ সালে কুপার ১৯৪১ সালে পেইণ্টার, ১৯৪১ সালে মেৎজ, ১৯৪২ সালে কোদানী, ১৯৪২

সালে মেল্যাণ্ড (Buck 1937, Cooper 1938, Painter 1941, Metz 1941, Kodani 1942, Melland 1942) ইত্যাদি।

১৯৫৪ সালে বিখ্যাত কোষ বিজ্ঞানী হোয়াইট বলেছেন (White 1954) এই রেখাচিহ্নিত অংশগুলি সাধারণ ক্রমোসোমে যে অংশগুলিকে আমরা ক্রমোমেয়ার বলে চিহ্নিত করি সেই অংশ। অবশ্য সাধারণ ক্রমোসোমে আমরা যতগুলি ক্রমোমেয়ার দেখতে পাই এখানে কিন্তু তারচেয়ে অনেক বেশী রেখা চিহ্ন দেখা যায়। ব্রীজেস্ ১৯৩৫ এবং ১৯৩৮ সালে (Bridges 1935, 38) ড্রসোফিলা পতঙ্গের এক্স ক্রমোসোমে এক হাজারের ও বেশী এই রেখা নির্ণয় করেছেন।

রেখা চিহ্নিত ক্রমোসোম যে শুধু লালাগ্রন্থিতেই পাওয়া যায় তা নয় ডিম্বাশয়ের কিছু কোষে, অন্ত্রের কিছু কোষে, এবং দেহের অন্যান্য কোন কোন অংশেও (Malpighian tubules, Fatbodies etc) পাওয়া যায়। এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন ম্যাকিনো ১৯৩৮ সালে, কুপার ১৯৩৮ সালে, বীরমান ১৯৫২ সালে, ষ্টকার ১৯৫৪ সালে ক্রয়ার এবং পাভাস ১৯৫৫ সালে (Makino 1938, Cooper 1938, Beermann 1952, Stalker 1954, Breuer and Pavan 1955) কিন্তু সেগুলি সহজে পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী নয়।

রেখা চিহ্নিত ক্রমোসোম লালাগ্রন্থি কোষেই সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। এই কোষে পর্য্যবেক্ষণ করাও সহজ। রেখাচিহ্নগুলির জন্য ক্রমোসোমের দেহে সামান্য তম পরিবর্ত্তন ও সহজে নির্ণয় করা যায়। ক্রমোসোমের দেহের সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনও বংশধারানুক্রমে উল্লেখযোগ্য তারতম্য আনে সেজন্য লালাগ্রন্থি ক্রমোসোম গবেষকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়।

ক্রমোসোমের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা এপর্য্যন্ত যা আলোচনা করেছি তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ক্রমোসোম এমন কিছু বহন করে যার প্রভাব বংশানুক্রমিকতার জন্য দায়ী। এই প্রভাবশালী পদার্থ টি কি ? মেণ্ডাল কল্পনা করেছিলেন কিছু পদার্থ যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোন সংশয় ছিলনা। কোষ বিজ্ঞান তাঁর সময়ে এমন কোন তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি যা থেকে এই পদার্থ যে সত্যিকারের কি সে সম্বন্ধে মেণ্ডাল একটা ধারণা অন্ততঃ পাবেন। কাজেই ঐ পদার্থ (Factors) এবং জীবকোষে তার সুনিশ্চিত উপস্থিতির বৈপ্লবিক পরিকল্পনাটি ছিল মেণ্ডালের সম্পূর্ণ নিজস্ব। পরবর্ত্তীকালে তার নামকরণ হয়েছে জীন (Gene) যা হল ক্রমোসোমের

বিশেষ বিশেষ অংশ সমূহ। মেণ্ডালের কল্পিত পদার্থ যে কি এবং কোথায় তার অবস্থান সে সম্বন্ধে আমরা এখন আরো কিছু জেনেছি এবং বংশ ধারানুক্রম পরিবহনের দায়ীত্ব আমরা দিয়েছি ক্রমোসোমের উপর। আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রেই প্রশ্ন করবেন যে ক্রমোসোমের কোন কোন অংশ যখন বংশগত বৈশিষ্টের জন্য দায়ী, সেই সব অংশে কি আছে? অর্থাৎ আসল বস্তুটি কি যার প্রভাবের উপর সব কিছু নির্ভর করে। কেউ হয়ত আরো কিছুদূর চিন্তা করে প্রশ্ন করবেন যে ক্রমোসোমই কি একমাত্র বস্তু যা বহন করে বংশগত বৈশিষ্ট? অর্থাৎ তার বাইরে কি কিছুই নয়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা রসায়নবিদের সাহায্য নিয়ে বলব যে আসল বস্তুটি হল নিউক্লীক এসিড। ক্রমোসোমের মূল উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান তম হল এই নিউক্লিক এসিড। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমরা বলব ক্রমোসোমই সব নয়। এর বাইরেও অনেক কিছু আছে বইকি। এমন কিছুও আছে যেখানে প্রাণকেন্দ্র নেই, ক্রমোসোমও নেই অথচ তারা প্রাণবন্ত বলে মনে করার কারণ রয়েছে যথেষ্ট। এদের ও বংশানুক্রম আছে। আবার এমন প্রাণীও আছে যার প্রাণকেন্দ্র আছে, ক্রমোসোম আছে, অথচ প্রাণকেন্দ্রের বাইরে এমন কিছু আছে যা বংশক্রম বহন করে। তাহলে বংশানুক্রমের তথ্যে ক্রমোসোমই সব কথার শেষ নয়। এ সম্বন্ধে আমরা আরো বিশদ আলোচনা করব পরে। এখন দেখা যাক ক্রমোসোমে কি আছে।

ক্রমোসোমের গঠন সম্পর্কে আমরা বলব দুই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। বাইরে থেকে দেখে বলব ক্রমোসোম এক ধরনের রসায়ণে গড়া যার নাম হল ক্রোমাটিন (Chromatin)। এই ক্রোমাটিনের সব অংশটা সমান নয়। বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে কোন অংশ বেশ গাঢ় রং নেয় আবার কোন অংশ খুব হাল্কা রং নেয়। অর্থাৎ ক্রমোসোমের গঠন হয় দুই প্রকৃতির ক্রোমাটিন দিয়ে। এক ধরনের, যা গাঢ় রং নেয় তা হল ঘনক্রোমাটিন (Hetero Chromatin) যে অংশ হাল্কা রং নেয় তা হল স্বল্প ক্রোমাটিন (En Chromatin)। বংশধারানুক্রম বহন করে স্বল্প ক্রোমাটিন (En Chromatin) অংশ শুধু। ক্রমোসোম সম্পর্কে এই হল এক ধরনের বিশ্লেষণ।

আর এক দৃষ্টিভঙ্গীতে গবেষকরা সন্ধান করলেন ক্রমোসোমের ভেতরের গঠন সম্পর্কে। তাঁরা বললেন ক্রমোসোমে আছে কিছু প্রোটিন, কিছু

ক্যালসিয়াম এবং দু রকমের নিউক্লিক এসিড। পর পর লম্বাভাবে সাজান নিউক্লিক এসিডগুলি ক্যালসিয়াম দিয়ে জোড়া থাকে। সবটার উপরে থাকে প্রোটিনের আবরণী। এর মধ্যে বংশ ধারা বহন করে নিউক্লিক এসিড অংশটি।

হেইৎস ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সালে (Heitz 1928, 1929) ক্রমোসোম সম্বন্ধে প্রথম বিশ্লেষণ করলেন এই ঘন ক্রোমাটিন এবং স্বল্প ক্রোমাটিন কথা দুটি। ঘনক্রোমাটিন অঞ্চল স্থিতি বিন্দুর কাছে অথবা দূরে যে কোন অংশেই হতে পারে। 'ড্রসেরা'তে ক্রমোসোমগুলির প্রান্ত দেশ ঘন ক্রোমাটিন দিয়ে গড়া। ড্রসোফিলা, টমাটো ইত্যাদিতে ক্রমোসোমের স্থিতি বিন্দুর কাছের অংশগুলি ঘন ক্রোমাটিন দিয়ে গড়া। আবার কোথাও এমন হতে পারে যে কোনও ক্রমোসোমের সবটাই ঘন ক্রোমাটিনে গড়া। পতঙ্গের বিভিন্ন প্রজাতিতে এক্স ক্রমোসোম এব, ড্রসোফিলাতে ওয়াই ক্রমোসোম এই প্রকৃতির।

ঘন ক্রোমাটিন ও স্বল্প ক্রোমাটিনের গুণগত পার্থক্যের কথা আমরা প্রথমেই একবার উল্লেখ করেছি। স্বল্প ক্রোমাটিন অংশ বংশধারানুক্রম বহন করে। রাসায়নিক গঠন ভঙ্গীর পার্থক্য হল গুণগত নয় পরিমাণ গত। ঘন ক্রোমাটিন অংশে নিউক্লিক এসিডের পরিমাণ খুব বেশী। কোলম্যান ১৯৪৩ সালে (Coleman 1943) দেখিয়েছেন যে ফড়িং জাতিয় প্রাণীদের ক্রমোসোমের ঘন ক্রোমাটিন অংশে নিউক্লিক এসিডের পরিমাণ বেশী থাকার কারণ হল ক্রমোনিমাটা (Chromonimata) গুলির ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় জড়িয়ে থাকা। ঐ সময় অন্যান্য ক্রমোসোমগুলির ক্রমোনিমাটা (Chromonimata) পরস্পরের সঙ্গে জড়ান অবস্থায় থাকেনা। রীস ১৯৪৫ সালে (Ris 1945) এই বিশ্লেষণ সমর্থন করেছেন। তাঁর অভিমত এই যে যেখানেই ক্রমোসোমের কোন অংশ গাঢ় এবং কোন অংশ হাল্কা রংয়ের মনে হয় সেখানেই এই একই বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা যায়।

ঘন ক্রোমাটিন অংশ যে বংশধারাক্রম পরিবহনের কাজে একেবারেই প্রয়োজনীয় নয় সে কথা কিন্তু সর্ব্বাংশে সত্য নয়। অবশ্য সাধারণতঃ তাই বলা হয়ে থাকে কারণ ঘন ক্রোমাটিন অংশ বংশানুক্রমের কাজে প্রায়শঃই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঘন ক্রোমাটিন অংশের প্রভাবের উপর বংশধারানুক্রমের সামান্য কিছু অংশ নির্ভর করে।

ড্রসোফিলার ওয়াই ক্রমোসোম একটি জীন বহন করে যার প্রভাব পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। মানব দেহে পুরুষের কানের উপর লোম জন্মায় ওয়াই ক্রমোসোমের একটি জীনের প্রভাবে। ১৯৪৪ সালে মাথের দেখিয়েছেন যে (Mather 1944) ড্রসোফিলার ওয়াই ক্রমোসোমে কিছু জীন আছে যার প্রভাব ড্রসোফিলার দেহে লোমের (Bristles) সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। তাহলে আমরা দেখছি যে ঘন ক্রোমাটিন অংশে একেবারেই কোন জীন থাকেনা তা নয়। অল্প কিছু জীন থাকে। অবশ্য তাদের প্রকৃতি স্বল্প ক্রোমাটিন অংশের জীনগুলির প্রকৃতির মত নয়।

রীস ১৯৫৭ সালে (Ris 1957) ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ ব্যবহার করে ঘন ক্রোমাটিনের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন। দেখাগেল যে অতি সূক্ষ্ম সূতার মত লম্বা কিছু দিয়ে স্বল্প ক্রোমাটিন ও ঘন ক্রোমাটিন অংশ গড়া। গঠন তত্বের দিক দিয়ে দুই রকম ক্রোমাটিনে পার্থক্য কিছু নেই। প্রভেদ শুধু এই সূক্ষ্ম সূতার মত অংশগুলি কিভাবে জড়ান থাকবে তার উপর। ঘন ক্রোমাটিন অংশে এইগুলি বেশ জটিল ভাবে জড়ান।

ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ ব্যবহার করে রীস এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ক্রমোসোম একটি লম্বা সূতার মত আকৃতির মনে হলেও আসলে তা অনেক-গুলি সূক্ষ্ম সূতার সমষ্টি। কফ্‌ম্যান এবং ম্যাক ডোনাল্ডও ১৯৫৭ সালে এই একই সিদ্ধান্তে এলেন (Kaufman and McDonald 1957) এবং রীসকে সমর্থন জানালেন।

ক্রোমাটিন তত্ব ছেড়ে এবার আমরা আসবো নিউক্লিক এসিডের কথায়। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন বংশধারানুক্রম পরিবহনের কাজে এই নিউক্লিক এসিডের ভূমিকাই প্রধান। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্দ্ধে মিয়েস্‌চার বলেছিলেন যে (Miescher 1871-97) প্রাণকেন্দ্রের প্রধান অংশ হল নিউক্লিও প্রোটিন। অর্থাৎ নিউক্লিক এসিড এবং প্রোটিনের সমন্বয়। পরে আরো জানা গেছে যে ব্যাকটিরিয়াতে (Bacteria) নিউক্লিক এসিড আছে কিন্তু সেখানে তারসঙ্গে প্রোটিন নেই অথবা থাকলেও খুবই সামান্য।

নিউক্লিক এসিড আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের আরো অন্ততঃ প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছে বংশধারা পরিবহনের কাজে তার ভূমিকা নির্ণয় করতে। ১৯২৮ সালে গ্রিফিথ (F. Griffith 1928) নিউমোনিয়া রোগের

জন্য দায়ী ব্যাকটিরিয়া নিয়ে গবেষণা করে দেখান যে বংশধারা বহন করে নিউক্লিক এসিড।

নিউক্লিক এসিড দু রকমের, (১) ডেসঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড— সংক্ষেপে ডি. এন. এ. (Desoxy Rhibose Nucleic acid or D. N. A.) (২) রাইবোজ নিউক্লিক এসিড— সংক্ষেপে আর এন. এ. (Rhibose Nucleic acid or R. N. A.)। এইদুরকম নিউক্লিক এসিডের মধ্যে ডি. এন. এ বংশধারা বহনকারী জীনগুলির মূল উপাদান। ডি. এন. এ-র প্রভাবই জীবদেহে বিভিন্ন চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণ জীবকোষে ডি. এন. এ. থাকে প্রানকেন্দ্রের অভ্যন্তরে। আর. এন. এ. প্রাণকেন্দ্রের ভিতরেও পাওয়া যায় বাইরেও পাওয়া যায়। প্রাণকেন্দ্রের আবরণীর মধ্য দিয়ে আর এন এ সহজে যাওয়া আসা করতে পারে কিন্তু আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হওয়ায় ডি. এন. এ'র পক্ষে তা সম্ভব নয়।

রাইবোজ নিউক্লিক এসিডের প্রধান কাজ হল প্রোটিন তৈরী করা। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে বংশধারা পরিবহনের কাজ কি রাইবোজ নিউক্লিক এসিডের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়? এর উত্তরে আমরা বলব সাধারণতঃ—একেবারেই সম্ভব নয় বিশেষতঃ যেখানে ডেসঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড উপস্থিত থাকে। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হতে পারে একটি ভাইরাস (Tobacomossoic Virus or T. M. V.) যা তামাক গাছে এক ধরণের রোগ আনে যার ফলে তামাকের পাতাগুলির উপর নক্সা কাটা দাগ হয় এবং গাছ নষ্ট হয়। এই ভাইরাসের মূল উপাদান রাইবোজ নিউক্লিক এসিড এবং প্রোটিন। এই ভাইরাসটি নিয়ে একটি বিচিত্র পরীক্ষা করা যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই ভাইরাসের প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড আলাদা করা যায়। কাঁচের পাত্রে এই প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড একত্র করলে তা থেকে আবার কিন্তু ঐ ভাইরাস তৈরী হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলাদা করার সময় কিন্তু ঐ প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিডগুলি নষ্ট হয়ে যায় না। ঐ প্রোটিন তামাক গাছের পাতায় প্রবিষ্ট করালে কিছুই হয় না। কিন্তু নিউক্লিক এসিড (R. N. A.) প্রবিষ্ট করালে আবার রোগ জন্মায়। দেখাযায় অনেক ভাইরাস তৈরী হয়েগেছে। স্পষ্টই বোঝাযাচ্ছে যে এই আর. এন. এ.

এমন ক্ষমতা বহন করে যারফলে প্রোটিন এবং আর. এন. এ. দুইই তৈরি করে ভাইরাসের বংশ বৃদ্ধি করা তার পক্ষে সম্ভব।

অনেক ভাইরাসেই ডি. এন. এর পরিবর্তে আর. এন. এ. থাকে। তামাকের ভাইরাসের (T. M. V.) মত সেইসব ভাইরাসেও দেখা যায় আর. এন. এ. বংশবৃদ্ধি করাতে পারে। অতএব বংশধারা পরিবহনের কাজে আর. এন. এ. অপ্রয়োজনীয় এমন কথা আমরা বলতে পারিনা।

যে সমস্ত জীবকোষে প্রাণকেন্দ্র আছে সেখানেই ডি. এন. এ. বংশধারা বহনের জন্য দায়ী। প্রাণকেন্দ্র নেই এমন অনেক কোষেও যেখানে ডি. এন. এ. উপস্থিত থাকে সেখানে ডি. এন. এ.'ই বংশধারা বহন করে।

এখন দেখাযাক এই ডেসঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড বা ডি. এন. এ জিনিষটা কি। ডেসঅক্সিরাইবোজ সুগার, ফসফেট, এবং কয়েকটি জৈবক্ষার জাতিয় (Organic base) রসায়নের সমন্বয়ে গড়া এই ডি. এন. এ. নাইট্রোজেনযুক্ত এই জৈবক্ষারগুলি চাররকম।

(১) এডেনাইন (Adenine) (২) থায়ামাইন (Thiamine) (৩) সাইটো-সাইন (Cytosine) এবং (৪) গোয়ানাইন (Goanine)।

এদের মধ্যে প্রথম দুটি এবং শেষ দুটি পরস্পরের পরিপূরক।

সুগার এবং ফসফেট মিলিত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খল রচনা করে। এই শৃঙ্খলে জৈবক্ষারগুলি সুগার অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সুগার এবং ফসফেটের তৈরী দুইটি শৃঙ্খল পরস্পর জড়ান অবস্থায় থাকে এবং দুই শৃঙ্খলের মধ্যবর্তী নাইট্রোজেন সমন্বিত ক্ষার জাতিয় রসায়নগুলি পরস্পরের সঙ্গে হাইড্রোজেন পরমাণুদিয়ে জোড়া থাকে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে একটি শৃঙ্খলে যেখানে এডেনাইন আছে অন্য শৃঙ্খলে সেখানে তার পরিপূরক থায়ামাইন থাকবে। এই দুইটি জোড়া থাকবে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে। আবার যেখানে গোয়ানাইন আছে একটি শৃঙ্খলে অন্য শৃঙ্খলে ঐ জায়গায় থাকবে তার পরিপূরক সাইটোসাইন এবং এরা জোড়া থাকবে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে। জৈবক্ষার জাতিয় পদার্থের এই জোড়াগুলিকে নিউক্লিওটাইড (Nuecleotide) বলা হয়।

দেখাযাচ্ছে যে ডি. এন. এ.'র গঠনে বিভিন্ন রসায়নের অবস্থানের একট নির্দ্দিষ্ট ক্রম আছে। বিশেষতঃ জৈবক্ষারগুলি এই নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে পারেনা, কারণ একটি তার পরিপূরকটির সঙ্গেই শুধু মিলিত হতে পারে

দুইটি নিউক্লিক এসিডেরই গঠন প্রণালী প্রায় এক আর. এন. এ.'তে সুগার অংশটির প্রকৃতি একটু অন্য অর্থাৎ রাইবোজ সুগার এবং নাইট্রোজেন সমন্বিত ক্ষার জাতীয় পদার্থগুলির মধ্যে থায়ামাইনের পরিবর্তে থাকে ইউরাসিল (Euracil) নামে আর একটি রসায়ন। থায়ামাইনের মতই ইউরাসিল ও এডেনাইনের পরিপূরক কাজেই তাদের মিলনে কোন বাধা জন্মায় না।

১৯৫৩ সালে ক্রীক এবং ওয়াটসন (Crick & Watson 1953) নিউক্লিক এসিডের এই শৃঙ্খলিত রূপ (Double Helix Structure) বিশ্লেষণ করেন। এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানী মহলের ধারণা যে নিউক্লিক এসিডের এইটাই সঠিক পরিচয়। তেজস্ক্রীয় পদার্থের প্রয়োগে ও ইলেক্‌ট্রনিক মাইক্রোসকোপের ব্যবহারে ক্রমোসোমের যে পরিচয় এখন ক্রমশঃ পাওয়া যাচ্ছে তা আগেকার অনেক ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন এনে দিচ্ছে। কোষ বিজ্ঞান ও বংশানু-ক্রমে আগ্রহীদের তাই ক্রমোসোম সম্বন্ধে খোলা মনে একটা ধারণা গড়ে নিতে হবে এবং নূতন তথ্যের আগমনের সঙ্গে নিজস্ব ধারণার সামঞ্জস্য অথবা পরিবর্ত্তন আনতে হবে। ক্রমোসোম সম্বন্ধে একটা সহজ ধারণা যাতে গড়ে উঠতে পারে তার জন্যেই এই বিষয়টি নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি এবং সে আলোচনার আপাততঃ এখানেই সমাপ্তি।

ঘনিষ্ঠতা ও বিচ্ছেদ

বংশ ধারানুক্রমের তথ্যে কোন একটি বিষয়ের আবিস্কারকে যদি সব-চেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ বলতে হয় তাহলে বলবো কিছু জীন যে একসঙ্গে থেকে নিজেদের একটা গোষ্ঠি তৈয়ারী করে, এবং সাধারণতঃ আলাদা হয়ে যায় না অথবা খুব কম সময়েই তাদের আলাদা হতে দেখা যায় এই বিষয়টির আবিষ্কার।

যখন দেখা গেল যে মেণ্ডালের কল্পিত চারিত্রিক বিশেষত্ব নির্ণায়ক পদার্থ ক্রমোসোমের কোন বিশেষ অংশমাত্র জোহানসেন যার নামকরণ করলেন জীন (gene) তখন প্রশ্ন উঠল যে কোন কোন ক্ষেত্রে যে মেণ্ডালের নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে তার কারন কি। একট ক্রমোসোমের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কার্য্য ও কারনের জন্য দায়ী হতে পারে। অর্থাৎ একই ক্রমোসোমে বিভিন্ন জীন থাকতে পারে যাদের প্রভাব সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে কাজ করে। এখন একই ক্রমোসোমে যে সব জীন আছে তারা সব সময়ে একই সঙ্গে থাকবে কারন একই ক্রমোসোম তাদের বহন করছে। ফলে মেণ্ডালের যেনিয়ম "গুণ নির্ণায়ক পদার্থ সমূহ জীবদেহে স্বাধীন ভাবে পৃথকী-করণ হয় (Free segregation)," সে নিয়ম এখানে অচল। এর ফলে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে মেণ্ডালের পদ্ধতি অনুযায়ী যে ফল পাবার আশা ছিল তা পাওয়া যাবে না। যেমন ধরা যাক্ দুইটি পাখীর মিলন হল একটি পাখী হলুদ পালক লাল চোখ অন্যটি বাদামী পালক সাদা চোখ এবং এরা দুইটিই বিশুদ্ধ শ্রেণীর।

'ক' জীনের প্রভাবের ফল হলুদ পালক এবং 'খ' জীনের প্রভাবের ফল লাল চোখ। এই দুইটি জীনের প্রভাবই প্রবল (Dominant) প্রকৃতির এবং তারা একই ক্রমোসোমে আছে। দ্বিতীয় পাখিটির দুই চরিত্রের জন্য জীন 'গ' এবং 'ঙ'। 'গ' জীনের প্রভাবের ফল বাদামী পালক, এবং 'ঙ' জীনের প্রভাবের ফল সাদা চোখ। এই দুই জীনের প্রভাব দুর্ব্বল (Recessive) প্রকৃতির এবং এদের প্রভাব দুর্ব্বল। ফলে প্রথম মিশ্রবংশে সবগুলি পাখী লাল চোখ হলুদ পালক নিয়ে জন্মাল। দ্বিতীয় মিশ্র বংশে আমরা আশা

করব ৯ : ৩ : ৩ : ১ অনুপাত কারন মেণ্ডালের পদ্ধতি অনুসারে তুইটি চরিত্র ও তার বিপরীত গুণের সমন্বয়ে ঐ অনুপাত আসে। কিন্তু এখানে তা হবে না যদি ক্রমোসোমের অংশ বিনিময় ও বন্ধনীর সৃষ্টি (Crossing over and chiasma formation) একেবারে বন্ধ থাকে তাহলে শতকরা পঁচিশ ভাগ জন্মাবে বাদামী পালক ও সাদা চোখ নিয়ে এবং বাকি পঁচাত্তর ভাগ জন্মাবে লালচোখ হলুদ পালক নিয়ে। মেণ্ডালের পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যাশিত হলুদ পালক সাদা চোখ অথবা বাদামী পালক লাল চোখ নিয়ে একটি পাখীও জন্মাবেনা।
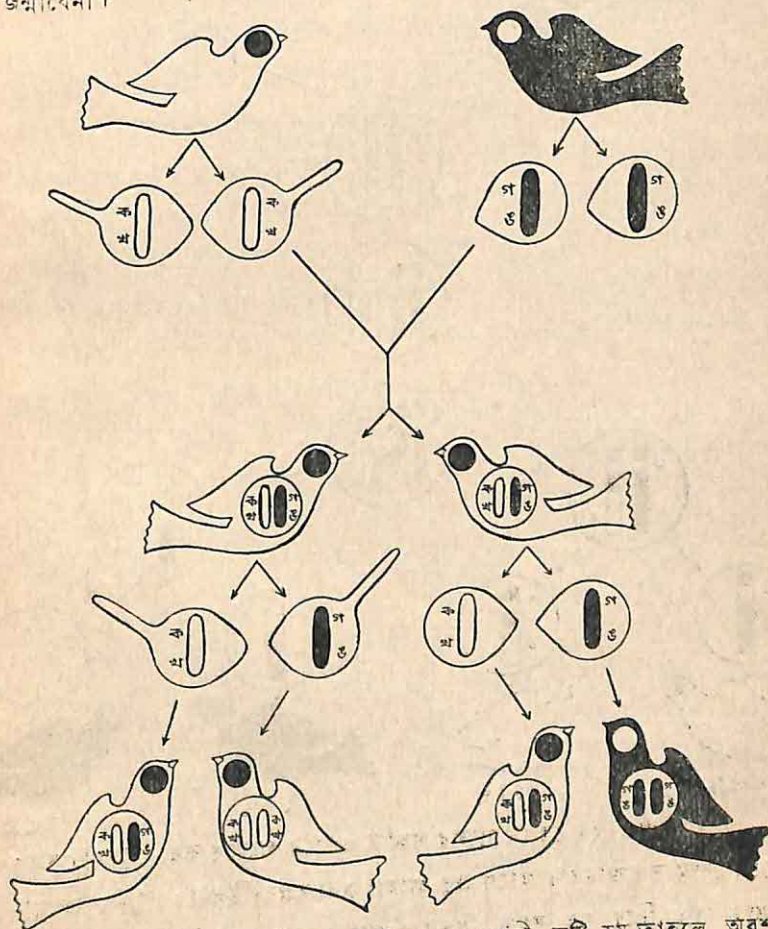
যদি ক্রমোসোমের অংশ বিনিময় ও বন্ধনী সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্য দেখা যাবে যে হলুদ পালক সাদা চোখ এবং বাদামী পালক লাল চোখ নিয়ে

খুব অল্প সংখ্যক পাখী জন্মাচ্ছে এবং মেণ্ডালের পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যাশিত অনুপাত একেবারেই পাওয়া যাচ্ছেনা। —এই অল্পসংখ্যক বাদামী পালক লাল চোখ এবং হলুদ পালক সাদা চোখের পাখীর সংখ্যা নির্ভর করবে ঐ ক্রমোসোম গুলিতে ঐ দুইজোড়া জীনের মধ্যের অংশে বন্ধনী সৃষ্টি ও অংশ বিনিময় কি অনুপাতে হয় তার উপর।
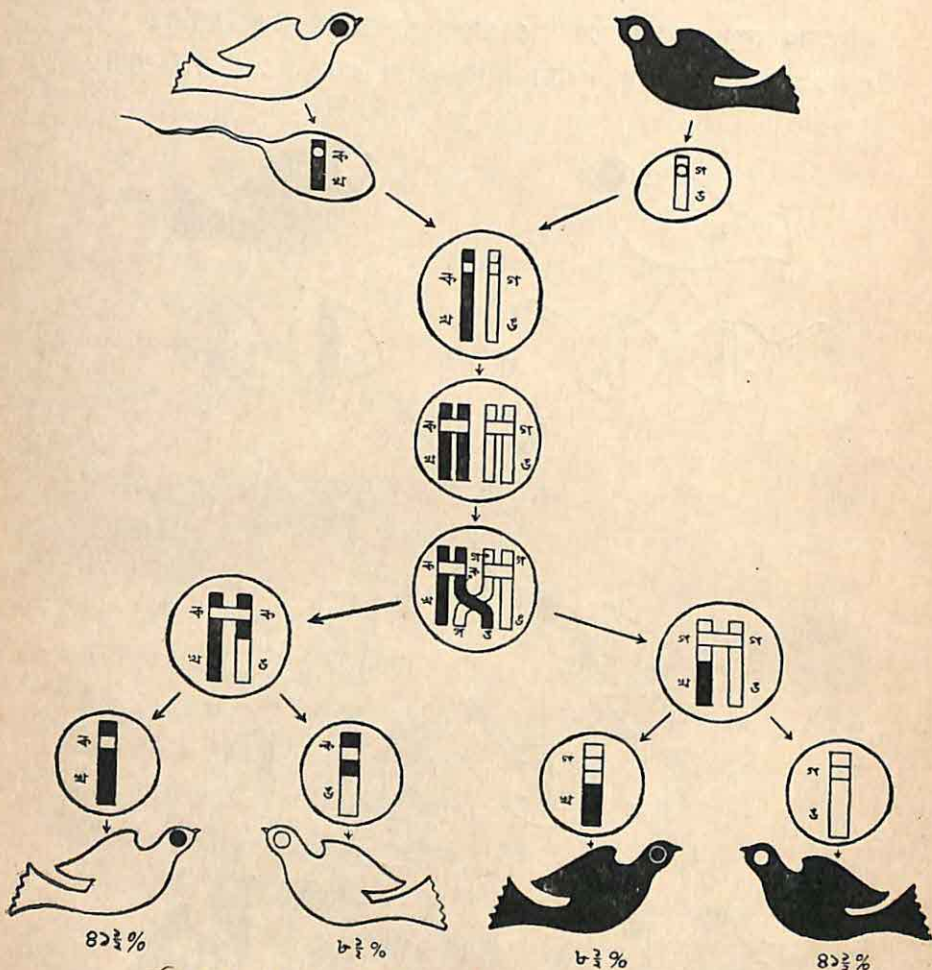
যদি প্রশ্ন হয় যে মেণ্ডালের পদ্ধতি এখানে প্রয়োগ করা গেলনা কেন? ক্রমোসোম তত্ত্ব জানবার আগে এর ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর ছিলনা। কিন্তু ক্রমোসোম তত্ত্ব দিয়ে খুব সহজ সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি যে এখানে দুইটি জীন এক সূত্রে গাঁথা অর্থাৎ এরা একই ক্রমোসোমে আছে বলে এদের স্বাধীন

পৃথকী করণ (free segregation) সম্ভব নয়। ১৯১০ সালে মরগ্যান (T. H. Morgan) প্রথম এই বিশ্লেষনের অবতারনা করলেন ড্রসোফিলা পতঙ্গের উপর কাজ করে।

কিন্তু একসঙ্গে থাকে যেসব জীন তারা কখন এবং কি কারনে আলাদা হতে পারে? কারন আলাদা না হলে ত যেমন খুশী মিশ্রণ (Independent assortment) সম্ভব নয়। এর আগে কোষ বিভাজনের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে একটা ক্রমোসোমের কিছু অংশ ভেঙ্গে গিয়ে অন্য ক্রমোসোমের ভাঙ্গা অংশের সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে।

তা যদি সম্ভব হয় তাহলে কোন ক্রমোসোমে দুইটি জীন যদি বেশ কিছু দূরে দূরে থাকে এবং তাদের মাঝখানে কোন অংশে যদি ক্রমোসোম ভাঙ্গে তাহলেত পৃথকীকরণ (free segregation) সম্ভব। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফল একত্র করে দেখা গেল যে বাস্তব ক্ষেত্রে এই কল্পনা অনুযায়ী হুবহু কাজ হয় অর্থাৎ একসূত্রে গাঁথা জীনগুলিও (Linked genes) আলাদা হয় যখন ক্রমোসোম ভাঙ্গে। এরফলে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে মেণ্ডালের পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যাশিত সব রকম মিশ্রণই পাওয়া যেতে পারে তবে ভিন্ন অনুপাতে। কারন ক্রমোসোম না ভাঙ্গলেত একত্রিত জীনগুলির (Linked genes) আলাদা হবার উপায় নেই।

একটি ক্রমোসোমে বহু জীন থাকতে পারে। একই ক্রমোসোমে যে-সব জীন আছে তাদের বলা হয় এক সূত্রে গাঁথা অর্থাৎ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত (Linked) একত্রিত জীন। এর মধ্যে দেখাযায় কিছু জীন খুব কাছা-কাছি বেশ ঘনিষ্ট ভাবে আছে এবং কিছু জীন বেশ দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। দূরে দূরে যারা ছড়ান তাদের মধ্যে পৃথকীকরণ হয় খুব সহজে ক্রমোসোম ভাঙ্গার ফলে। কিন্তু ঘনিষ্ট ভাবে যারা আছে তারা সহজে আলাদা হয়না কারণ দেখা যায় যে এদের মাঝেখানে সাধারণতঃ ক্রমোসোম ভাঙ্গে না। যদিওবা কখনও হয় তা অত্যন্ত কম হারে। তাহলে জীনগুলির অবস্থানের উপর অর্থাৎ পারস্পরিক দূরত্বের উপর নির্ভর করে তাদের ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক।

১৯০৬ সালে বেটিসন এবং পানেট (Bateson & Punnet) প্রথম এই ধরনের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেন মটর গাছের (Sweet Pea) বিভিন্ন বৈচিত্র নিয়ে কাজ করে। সেখানে তাঁরাও দুইটি চরিত্র ও তার বিপরীত গুণের মিশ্রণে দ্বিতীয় মিশ্র বংশে ৯ : ৩ : ৩: ১ অনুপাতে চার রকম বৈচিত্র আশা করে ৩: ১

অনুপাতে মাত্র দুরকম পান। ১৯১০ সালে মরগ্যান (T. H. Morgan) ব্যাখ্যা করলেন যে স্বাধীন ভাবে পৃথকীকরণ হয় না যে সব চরিত্রগুলি তাদের জন্য দায়ী জীন সমূহ এক সূত্রে গাঁথা এবং পরস্পর ঘনিষ্ট কারণ একই ক্রমোসোমে তারা আছে। পৃথকীকরণের ফল স্বরূপ বৈচিত্র তখনই শুধু পাওয়া যায় যখন ক্রমোসোম ভাঙ্গার ফলে এদের ঘনিষ্ঠতা আর থাকে না এবং একটি ক্রমোসোমের অংশ অন্য ক্রমোসোমে জুড়ে যাবার ফলে এদের পৃথকীকরণ (Segregation) হয়।

বিভিন্ন গবেষনার ফল থেকে জানা গেছে যে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত জীন গোষ্ঠির সংখ্যা নির্ভর করে তাদের ক্রমোসোমের সংখ্যার উপর। যে প্রজাতির (Species) যত জোড়া ক্রমোসোম আছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত জীন গোষ্ঠি (Linkage Group) ততগুলির বেশী হবেনা। সহজ কথায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত জীন গোষ্ঠির সংখ্যা একক ক্রমোসোম সংখ্যার বেশী হবে না। যেমন ড্রসোফিলা পতঙ্গের একটি সর্ব্বজন পরিচিত প্রজাতির (Drosophila Melanogaster) ক্রমোসোম সংখ্যা চারজোড়া অর্থাৎ মোট আটটি। এখানে একক ক্রমোসোমের সংখ্যা হল চার এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত জীন গোষ্ঠি ও চার। আবার ড্রসোফিলা পতঙ্গের অন্য এক প্রজাতির (Drosophila Pseudoob scura) ক্রমোসোম সংখ্যা পাঁচ জোড়া, সেখানে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত জীন গোষ্ঠিও পাঁচ মাত্র। ভুট্টা গাছের ক্রমোসোম সংখ্যা দশ জোড়া এবং ঘনিষ্ঠ জীন গোষ্ঠির সংখ্যাও মাত্র দশ।

কোষ বিভাগের সময় আমরা দেখেছি ক্রমোসোম যখন ভাঙ্গে তখন তা জুড়ে যায় আড়াআড়ি ভাবে (Cross over) কারণ ভেঙ্গে যাবার পর মূহুর্ত্তেই ভাঙ্গা অংশগুলি বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। এরই ফলে একটি ক্রমোসোমের অংশ জুড়ে যায় অন্যটির সঙ্গে। এক জোড়া ক্রমোসোমে থাকে চারটি ক্রোমাটিড। কোন ক্রমোসোমে শুধুমাত্র এক জায়গায় ভাঙ্গে কোন ক্রমোসোমে দুই তিন জায়গায় ও ভাঙ্গে। কন্তু যেখানে ভাঙ্গে সেখানে মাত্র দুইটি ক্রোমাটিড ভাঙ্গে অন্য ক্রোমাটিড দুইটি অক্ষত থাকে।

অর্থাৎ কোন ক্রমোসোমের জোড়ায় হয়ত একদিকে যে দুইটি ক্রোমাটিড ভেঙ্গেছে অন্যদিকে সেই দুইটি অক্ষত থেকে অন্য দুইটি ভেঙ্গেছে। কোথাও হয়ত দুইটি ক্রোমাটিড সম্পূর্ণ অক্ষত আছে অন্য দুইটি দুই জায়গায় ভেঙ্গেছে। কোথাও হয়ত একটি ক্রোমাটিড অক্ষত আছে অন্য তিনটি ভেঙ্গেছে এবং

জুড়েছে দুই জায়গায়। এই ভাবে কোন কোন জীন এক ক্রমোসোম থেকে অন্য ক্রমোসোমে যাওয়া আসা করতে পারে এবং একটি গোষ্ঠি থেকে পৃথক হতে পারে।
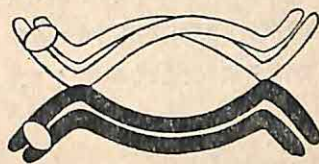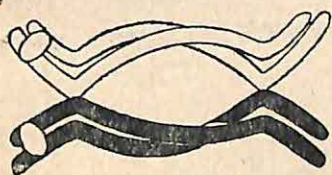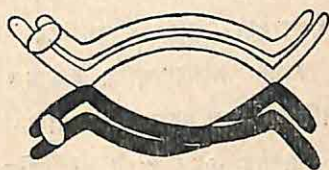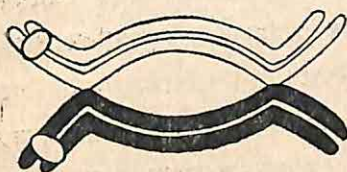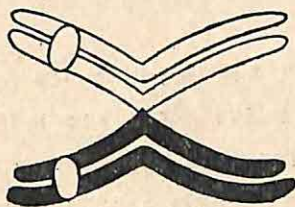
মরগ্যানের (T. H. Morgan) শিষ্য বর্গের অন্যতম স্টার্টে ভাণ্ট ১৯১৩ সালে (A, H, Sturtevant 1913) দেখলেন যে যে সব জীন খুব কাছাকাছি থাকে তাদের মধ্যে পৃথকীকরণের শতকরা হার খুবই কম। যে সব জীন বেশ দূরে দূরে থাকে তাদের মধ্যে পৃথকীকরণের শতকরা হার অপেক্ষাকৃত বেশী। স্টার্টে ভাণ্ট তখন এক বিচিত্র প্রস্তাব আনলেন যে ক্রমোসোমের উপর জীনের অবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্ব তাদের পৃথকীকরণের শতকরা হার অনুসারে ছকে ফেলা যেতে পারে। অর্থাৎ জীনের অবস্থান দেখিয়ে ক্রমো-সোমের মানচিত্র প্রস্তুত করা যেতে পারে।

জীন সমূহের দূরত্ব নির্ণয় করা হবে শতকরা হার অনুযায়ী। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মান স্থির করে নিয়ে তার প্রতি একক শতকরা এক ভাগের সমান ধরা হবে। সহজ কথায় ধরাযাক্ ঘনিষ্ঠ দুইটি জীনের

পৃথকীকরণের ফলে উদ্ভূত বৈচিত্র দ্বিতীয় মিশ্রবংশে আশে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ। অতএব ঐ ক্রমোসোমে ঐ দুইটি জীনের একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব পাঁচ একক। স্টার্টে ভান্টের এই পরিকল্পনার ফলে জীন সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাদের নির্দ্দিষ্ট অবস্থান এবং পারস্পরিক দূরত্ব সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে উঠল।

ক্রমোসোমের ভাঙ্গা গড়া কিন্তু নির্ভর করে কয়েকটি পরিবেশের উপর। সেই জন্য ক্রমোসোমের উপর জীনের দূরত্ব নির্ণয় করা প্রয়োজন একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় পর্য্যবেক্ষণ করে। ড্রসোফিলা পতঙ্গের ক্রমোসোমে জীনের অবস্থান নির্ণয় করা হয় শুধুমাত্র ২৫° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বড় হয়েছে এমন পতঙ্গ নির্ব্বাচন করে এবং ড্রসোফিলা পতঙ্গের উপর পর্য্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া গিয়েছে সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য এবং বিস্তারিত তথ্য। তার কারণ গবেষণাগারে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণে রেখে পালন করার পক্ষে ড্রসোফিলা পতঙ্গ সবচেয়ে উপযোগী। গবেষণাগারে নির্দ্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বড় করা যায় এমন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ক্রমোসোমের উপর জীনের অবস্থান ও দূরত্ব নির্ণয় (chromosome maping) করা সম্ভব। প্রাণী জগতে ড্রসোফিলা পতঙ্গ এবং উদ্ভিদ জগতে নিউরো-স্পোরা ছত্রাকের উপর তাই সবচেয়ে বেশী কাজ হয়েছে।
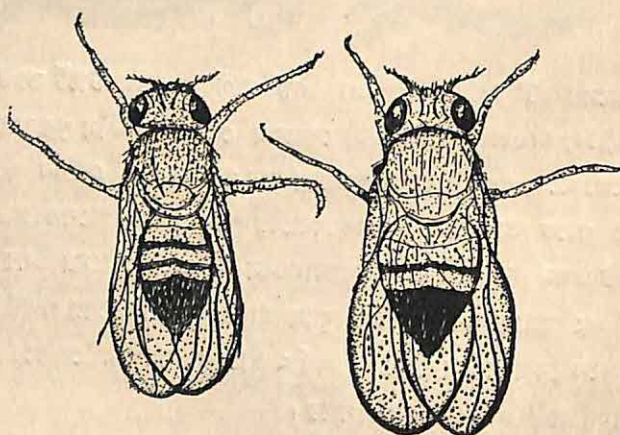
ক্রমোসোম ভাঙ্গা গড়া নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার উপর। এখন পর্য্যা-লোচনা করে দেখা যাক কি কি অবস্থার উপর তা নির্ভরশীল।

লিঙ্গভেদের প্রভাব :—

ড্রসোফিলা পতঙ্গে পুরুষ প্রাণীর দেহে ক্রমোসোম সাধারণ অবস্থায় ভেঙ্গে অন্য ক্রমোসোমের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে জুড়ে যায় না। পুরুষ দেহে ক্রমোসোমে ভাঙ্গে শুধুমাত্র কোন কিছুর প্রয়োগের প্রভাবে। হোয়াইটিঙ্গেল (Whittinghil 1937, 1947) এই তথ্য প্রমাণ করেছেন ড্রসোফিলার পুরুষ পতঙ্গের উপর রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগে। এই একই কথা প্রযোজ্য রেশম মথের (Bombax Mori) স্ত্রী পতঙ্গের ক্ষেত্রে।

হালডেন (Halden 1922) দেখিয়েছেন যে প্রাণী অথবা উদ্ভিদ দেহ যেখানে বিভিন্ন প্রকার যৌন কোষ উৎপাদন করে [i. e. Hetero gametic] সেখানেই ক্রমোসোমে ভাঙ্গাগড়ার হার কম।

ইঁদুরের ক্ষেত্রে [Both Mouse & rat] ক্রমোসোমের ভাঙ্গা গড়ার ফলে জীন এর স্থান পরিবর্ত্তন এবং বিভিন্ন ভাবে মিলন [Gene re combination] পুরুষ প্রাণীর চেয়ে স্ত্রী প্রাণীর দেহে বেশী এই তথ্য আমরা পাই ক্যাস্‌ল ও ডনের [Castle 1925, Dunn 1920] গবেষণায়। হল্যাণ্ডার ১৯৩৮ সালে [Hollander 1938] দেখিয়েছেন যে পায়রার ক্ষেত্রে পুরুষের দেহে ক্রমোসোম ভাঙ্গার হার বেশী।

বয়সের প্রভাব :—

ব্রীজেস ১৯১৫ সালে [Bridges 1915] দেখান যে বয়সের তারতম্যে উপর ক্রমোসোমের ভাঙ্গা গড়া নির্ভরশীল। তিনি দশ দিন কুড়ি দিন ও ত্রিশ দিন এই তিন রকম বয়সের স্ত্রী ড্রসোফিলা সংগ্রহ করেন। দেখাযায় দশদিন বয়সের যারা তাদের দেহে ক্রমোসোম ভাঙ্গার হার সবচেয়ে বেশী। কুড়ি দিন বয়সে এই হার খুবই কম আবার ত্রিশ দিন বয়সে এই হার উল্লেখযোগ্য রকমের বেশী। অবশ্য এই ভাঙ্গা গড়ার হার লক্ষ্য করা হয় ক্রমোসোমের যে অংশে কেন্দ্র বিন্দু [Centromere] আছে তার কাছাকাছি অংশে। ড্রসোফিলা পতঙ্গের তিনটি বড় ক্রমোসোমেই তাই দেখা যায় যে কেন্দ্র বিন্দুর (centromere) কাছাকাছি অংশে ক্রমোসোম ভাঙ্গাগড়া বয়সের উপর নির্ভর করে। ব্রীজেস, প্লাও, স্টার্ণ, বার্গনার ইত্যাদি [Bridges 1915, 1927, Plough 1917, 1921, Stern 1926, Bergner 1928] অনেকেই তা দেখিয়েছেন।

তাপ নিয়ন্ত্রণ :—

স্টার্ন এবং প্লাও [Stern 1926, Plough 1917] দেখিয়েছেন যে বয়সের তার তম্যের মত উত্তাপের তারতম্যও ক্রমোসোমের ভাঙ্গাগড়ার উপর উল্লেখ যোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। ড্রসোফিলা পতঙ্গে সাধারণতঃ দেখাযায় যে অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপে অর্থাৎ দশ বারো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ক্রমোসোম ভাঙ্গে বেশী। তার চেয়ে কিছু বেশী উত্তাপে যেমন কুড়িথেকে ত্রিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ক্রমোসোম ভাঙ্গে বেশ কমহারে আবার একত্রিশ বত্রিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ক্রমোসোম ভাঙ্গার হার আগের মত বেড়ে যায়। প্লাও এখানেও লক্ষ্য করেছেন [Plough 1917] যে কেন্দ্র বিন্দুর (Centromere) কাছাকাছি অঞ্চলে এই ভাঙ্গাগড়ার উপর উত্তাপের প্রভাব খুব কার্য্যকরী হয়।

তাহলে আমরা দেখছি যে একই ক্রমোসোমে আছে এমন ঘনিষ্ট জীনেরা আলাদা হয়ে যেতে পারেনা যে এমন নয়। এবং এর জন্য ক্রমোসোমের দেহে তাদের পারস্পরিক অবস্থান ও যেমন উল্লেখ যোগ্য প্রভাব বিস্তার করে তেমনি পারিপার্শিক অন্যান্য প্রভাব ও উল্লেখ যোগ্য ভাবেই কার্য্যকরী হয়। জীন সমূহের ঘনিষ্ঠতা ও বিচ্ছেদ কোন জন সংখ্যায় বিভিন্ন বৈচিত্রের অনু-পাতের তারতম্যের মাধ্যমে ক্রম বিবর্ত্তনের সহায়কও হতে পারে।

লিঙ্গাশ্রয়ী বংশক্রম

প্রাণী জগতে বিভিন্ন চরিত্র দেখা যায় অনেক সময় বংশধারা অনুসরণ করছে লিঙ্গাশ্রয়ী ভাবে। যেমন ধরা যাক কোন এক ভদ্রলোকের স্ত্রী বর্ণান্ধ। বিভিন্ন বর্ণের বিশেষতঃ লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য তাঁর চোখে ধরা পড়েনা মনে হয় এক। ভদ্রলোক নিজে স্বাভাবিক। এঁদের সন্তানেরা কি রকম হবে? দেখা যাবে এঁদের সব কটি পুত্র সন্তান হবে বর্ণান্ধ, এবং সবকটি কন্যা সন্তান হবে নিজেরা স্বাভাবিক কিন্তু বর্ণান্ধতা দোষ তারা বহন করবে। তাদের দেহে এ দোষ গোপন থাকলেও প্রকাশ পাবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে। এদের আমরা বলব বর্ণান্ধতা বহনকারী। এখানে আমরা দেখছি যে মা বর্ণান্ধ ও বাবা স্বাভাবিক এবং পুত্র সন্তান মাত্রেই বর্ণান্ধ এবং কন্যা সন্তান মাত্রেই বহনকারী। অর্থাৎ লিঙ্গভেদে প্রকাশের তারতম্য।

এমনও হতে পারে যে কোন এক ভদ্রলোক নিজে বর্ণান্ধ কিন্তু তাঁর স্ত্রী স্বাভাবিক। এঁদের পুত্র সন্তানেরা হবে সকলেই স্বাভাবিক। কন্যা সন্তানেরা সকলেই হবে বর্ণান্ধতা দোষ বহনকারী।

এমন হতে পারে কোন পরিবারে যে ভদ্রলোক নিজে স্বাভাবিক তাঁর স্ত্রী নিজে স্বাভাবিক হলেও বর্ণান্ধতা দোষ বহন করেন। এঁদের সন্তানেরা কি হবে? পুত্র সন্তানেরা অর্দ্ধেক হবে স্বাভাবিক অর্দ্ধেক হবে বর্ণান্ধ। কন্যা-সন্তানেরাও অর্দ্ধেক স্বাভাবিক অর্দ্ধেক বর্ণান্ধতা দোষ বহনকারী।

যদি পিতা বর্ণান্ধ ও মাতা বর্ণান্ধতা বহন কারিণী হন? এঁদের সন্তানদের মধ্যে পুত্র সন্তানেরা অর্দ্ধেক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অর্দ্ধেক বর্ণান্ধ হবে। কন্যা সন্তানেরাও অর্দ্ধেক বর্ণান্ধ এবং অর্দ্ধেক বর্ণান্ধতা বহনকারী হবে।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই বর্ণান্ধ হলে ছেলে মেয়েরা সকলেই বর্ণান্ধ হবে।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ছেলেরা কখনই বহনকারী হচ্ছে না। তারা হয় স্বাভাবিক নয় বর্ণান্ধ। ছেলেদের মধ্যে যারাই এ দোষ পাচ্ছে তারা নিজেরাও বর্ণান্ধ হচ্ছে। মেয়েরা কিন্তু নিজেরা স্বাভাবিক হয়ে অভ্যন্তরে এ দোষ বহন করে নিয়ে যেতে পারে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে।

এ শুধু একটি মাত্র চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন উদাহরণ দেখান হল। আরো অনেক কিছুই এই ভাবে লিঙ্গাত্মক বংশক্রম অনুসরণ করে যার মধ্যে কিছু প্রাণ সংশয়কারী রোগও আছে যার মধ্যে হিমোফিলিয়া (Haemophilia) বা রক্ত-ঝরা রোগ একটি। এ রোগের শিকার হয় কেবলমাত্র ছেলেরা, মেয়েরা নয়।

কিন্তু কেন এমন হয়? বংশধারা তত্ব বলে যে সমস্ত চরিত্রের জন্য দায়ী কিছু কিছু গুণ নির্ণায়ক পদার্থ যার বাস্তব রূপ হল জীবকোষের অভ্যন্তরে প্রাণ কেন্দ্রে সংরক্ষিত ক্রমোসোম সূত্রের কোন বিশেষ অংশ; জোহানসনের ভাষ্য অনুসারে যারা জীন (gene) নামে পরিচিত। এখন সব চরিত্রের জন্যইত দায়ী কোন না কোন জীন কিন্তু কোন কোন চরিত্রের বংশ ক্রম-লিঙ্গাত্মক কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের আবার আসতে হবে ক্রমোসোমের কথায়।

এর আগে আমরা বলেছি ক্রমোসোমেরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। ১৮৯১ সালে হেনকিং এক ধরণের পতঙ্গে (Henking 1891 on Hemiptera) লক্ষ্য করলেন যে একটি ক্রোমাটিন বিন্দু (Chromatin element) সঙ্গী হারা অবস্থায় আছে। কোষ বিভাজনের ফলে একটি কোষ সেটিকে পাচ্ছে অন্য কোষটি পাচ্ছে না। অবশ্য এ শুধু যৌন কোষ বিভাগের সময়।
হেনকিং তার নাম দিলেন এক্স (ইংরাজী X অক্ষর) তবে ঐ বস্তুটি আদৌ ক্রমোসোম কিনা সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না।

পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন পতঙ্গের উপর কাজ করে অন্যান্য গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন যে ঐ বস্তুটি একটি ছোট্ট ক্রমোসোম। ম্যাক্‌ক্লাং ১৯০২ সালে (Mc Clung 1902 on grasshopper) উল্লেখ করেন যে ঐ ক্রমোসোমটি লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য দায়ী। ম্যাক্‌ক্লাং এর এই আবিষ্কারকে সমর্থন এবং প্রতিষ্ঠা করেন উইলসন। উইলসন একটি পতঙ্গে দেখেন (Wilson 1905, 1909) ঐ ক্রমোসোমটি পুরুষ দেহে আছে একক অবস্থায় এবং স্ত্রী পতঙ্গের দেহে আছে এক জোড়া। অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের দেহে ক্রমোসোম সংখ্যা এক নয়। স্ত্রী পতঙ্গে ১৪ পুরুষ পতঙ্গে ১৩ মাত্র।

উইলসন বললেন যে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গা নির্ণয় করে এই এক্স ক্রমোসোম। শুক্র হয় দুরকম। এক রকম এক্স ক্রমোসোম শুদ্ধ আর এক রকম এক্স ক্রমোসোম ছাড়া। এক্স ক্রমোসোম আছে এমন শুক্র জন্ম দেবে স্ত্রী পতঙ্গের। এক্স ক্রমোসোম নেই এমন পতঙ্গ জন্ম দেবে পুরুষ পতঙ্গের।

ষ্টীভেন্স ১৯০৫ সালে (Stevens 1905 on Beetle) স্বাধীন ভাবে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন অন্য একটি পতঙ্গের উপর কাজ করে। ঐ পতঙ্গে স্ত্রী প্রাণীর ক্রমোসোম সংখ্যা ২০ পুরুষ প্রাণীর মাত্র ১৯টি। এই ভদ্র মহিলাই ১৯০৮ সালে আবিষ্কার করলেন যে ড্রসোফিলার পুরুষ প্রাণীর দেহে এই এক্স ক্রমোসোমের একটি সঙ্গী থাকে যা আকারে ছোট। স্ত্রী ড্রসোফিলায় কিন্তু এক্স ক্রমোসোম থাকে এক জোড়া। উইলসন ১৯০৯ সালে এই ছোট ক্রমোসোমটির নামকরণ করলেন আর একটি ইংরাজী অক্ষর ওয়াই দিয়ে।

উইলসন দেখালেন ড্রসোফিলা এবং আরো কিছু পতঙ্গে স্ত্রী প্রাণীর দেহে থাকে এক জোড়া এক্স ক্রমোসোম এবং পুরুষ প্রাণীর দেহে থাকে একটি এক্স এবং একটি ওয়াই ক্রমোসোম।

এই বার উইলসন বললেন যে লিঙ্গ নির্ধারণ হয় কেবল এক্স ক্রমোসোমের সংখ্যার উপর। দুটি থাকলে স্ত্রী প্রাণী এবং একটি থাকলে পুরুষ প্রাণী।
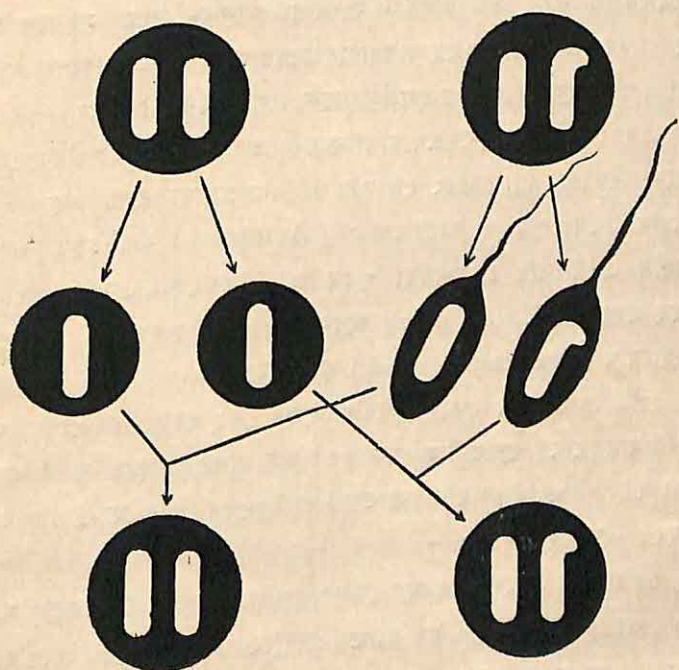
আর ওয়াই ক্রমোসোম (Y Chromosome) যখন সব প্রাণীর ক্ষেত্রে পাওয়া যায়না, লিঙ্গ নির্ধারনে তার কোন ভূমিকাই নেই।

উইলসনের এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের সামনে এক নূতন তথ্য এনে দিল যে লিঙ্গ নির্ণয়ে ক্রমোসোমের প্রভাব উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অবশ্য লিঙ্গ নির্ণয় অত্যন্ত জটিল বিষয়। এখানে বলে রাখা ভাল যে অন্য অনেক কিছুর প্রভাব তার উপরে কার্য্যকরী এবং এক কথায় ক্রমোসোমের উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে ক্রমোসোমের প্রভাব যে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কোন চরিত্রের লিঙ্গাশ্রয়ী প্রকাশ অবশ্য প্রথম বিশ্লেষণ করেন ডঙ্কাস্টার এবং রেনর (**Doncaster & Raynor 1906 on Magpie Moth**) ১৯০৬ সালে এক জাতিয় মথের দেহ বর্ণের উপর।

মরগ্যান ১৯১০ সালে (**T. H. Morgan 1910**) বললেন যে ড্রসোফিলা পতঙ্গের চোখের সাদা রং এর জন্য দায়ী একটি জীন যা আছে এক্স ক্রমোসোমে এবং এই চরিত্রটি বংশধারা অনুসরন করে লিঙ্গাত্মক ভাবে। মরগ্যানের এই আবিষ্কারে বংশধারানুক্রমের গবেষণায় এক বিশেষ অধ্যায়ের গোড়া পত্তন হল। আরম্ভ হল লিঙ্গাত্মক বংশক্রম নিয়ে বিশ্লেষণ।

ক্রমশঃ দেখাগেল ক্রমোসোম থাকে দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর ক্রমোসোম জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং জোড়ার দুইটি ক্রমোসোম হুবহু এক। এদের অযৌন ক্রমোসোম বা অটোসোম (**Autosome**) বলা হয়। আর এক শ্রেণীর ক্রমোসোম স্ত্রী অথবা পুরুষ প্রাণীর যে কোন একটির দেহে থাকে অসম জোড়া (**Unlike pair**) অথবা সঙ্গীহীন অবস্থায়। এদের যৌন ক্রমোসোম (**Sex Chromosome**) বলা হয়ে থাকে।

যৌন ক্রমোসোম কোন প্রাণীর পুরুষ দেহে হয়ত অসম জোড়া আছে। যেমন মানব দেহে, ড্রসোফিলা পতঙ্গে। এই অসম জোড়ার বড়টি হল এক্স এবং ছোটটি ওয়াই। যদি এক্স ওয়াই থাকে পুরুষ প্রাণীতে, স্ত্রী প্রাণীর দেহে থাকবে একজোড়া এক্স।

স্ত্রী প্রাণীর দেহেও অসম জোড়া অর্থাৎ এক্স ওয়াই থাকতে পারে-- যেমন আছে প্রজাপতি ও মথ জাতিয় প্রাণীতে। এদের পুরুষ প্রাণীর দেহে থাকবে এক জোড়া এক্স।

কোন কোন প্রাণীতে যেমন বিভিন্ন প্রজাতির ফড়িঙে স্ত্রী প্রাণীতে থাকে এক জোড়া এক্স এবং পুরুষ দেহে শুধু একটি এক্স। এখানে ওয়াই ক্রমোসোম

নেই। এখানে বলা হয় স্ত্রী প্রাণীতে আছে XX এবং পুরুষ প্রাণীতে XO আছে। এই শূন্য বোঝায় ওয়াই ক্রমোসোমের অনুপস্থিতি।

কোন কোন প্রাণীতে এই XO অবস্থা স্ত্রী প্রাণীর দেহে এবং XX অবস্থা পুরুষ প্রাণীর দেহে থাকতে পারে।

অযৌন ক্রমোসোমেরা কোষ বিভাগের সময় সমান ভাবে ভাগ হয়ে যেতে পারে কিন্তু যৌন ক্রমোসোমে অসম জোড়া থাকলে যৌন কোষ বিভাগে তারা অসমান ভাগ হয়। ফলে যৌন কোষ হয় দু রকম।

যেমন কোন প্রাণীর পুরুষ দেহে ক্রমোসোম সংখ্যা সতের। আট জোড়া অযৌন ক্রমোসোম এবং যৌন ক্রমোসোম একটি। অর্থাৎ XO অবস্থা। এদের শুক্র কোষ হবে দুরকম। একটিতে থাকবে নয়টি অন্যটিতে থাকবে আটটি ক্রমোসোম। এদের স্ত্রী প্রাণীর দেহে থাকবে আঠারটি ক্রমোসোম, অর্থাৎ XX অবস্থা। ফলে প্রত্যেক ডিম্বকোষে ক্রমোসোম থাকবে নয়টি।

যদি স্ত্রী প্রাণীর দেহে এই অসম অবস্থা থাকে তাহলে ডিম্বকোষ হবে দুরকম। শুক্র কোষ এক রকমই হবে।

পুরুষ দেহে অসম অবস্থা থাকলে শুক্র ও ডিম্বকোষের মিলনের সময় লিঙ্গ নির্ধারন হবে অর্থাৎ কোন ধরনের শুক্র তার উপর নির্ভর করবে।

স্ত্রী প্রাণীর দেহে অসম অবস্থা থাকলে ডিম্বকোষ উৎপাদনের সময় ভবিষ্যৎ জাতকের লিঙ্গ নির্ধারণ হয়ে যাবে।

যৌন ক্রমোসোমের জীনগুলি যে সব চরিত্র নির্ণয় করে সেই চরিত্রগুলি বংশধারা ক্রমে লিঙ্গাত্মক ভাবে প্রকাশ পায়। ওয়াই ক্রমোসোমে খুব কম জীন থাকে কিন্তু এক্স ক্রমোসোমে এমন অনেক জীন থাকে যার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

লিঙ্গাশ্রয়ী বংশক্রমের বিশ্লেষণে ড্রসোফিলা পতঙ্গের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক পরিবেশে ড্রসোফিলার চোখের স্বাভাবিক রঙ লাল। চোখের রঙ একটি জীন এর আকস্মিক পরিবর্তন বা মিউটেশন (Mutation) এর ফলে সাদা হয়ে যেতে পারে। যে জীনটির পরিবর্তনের ফলে চোখের রঙ সাদা হয় সেই জীনটি আছে এক্স ক্রমোসোমে। এই পরিবর্তিত জীনটির প্রভাব কিন্তু প্রবল (Dominant) নয়, অধিকাংশ পরিবর্তিত জীন এর মত দুর্বল (Recessive) প্রকৃতির। ফলে স্ত্রী পতঙ্গের দেহে যেখানে এক্স ক্রমোসোম একজোড়া আছে সেখানে যদি একটি এক্স ক্রমোসোমে স্বাভাবিক জীন এবং

অন্যটিতে পরিবর্তিত জীন থাকে তাহলে চোখের রঙ হবে লাল। যদি দুইটি এক্স ক্রমোসোমেই এই পরিবর্তিত জীনটি থাকে তাহলে চোখের রঙ হবে সাদা।

পুরুষ পতঙ্গের এক্স ক্রমোসোমের সঙ্গী ওয়াই ক্রমোসোম। ওয়াই ক্রমোসোমে এই জীনটির সঙ্গী কোন জীন নেই। ফলে পুরুষ দেহের এক্স ক্রমোসোমে এই পরিবর্তিত জীনটি থাকলে পুরুষ পতঙ্গটির চোখ হবে সাদা।
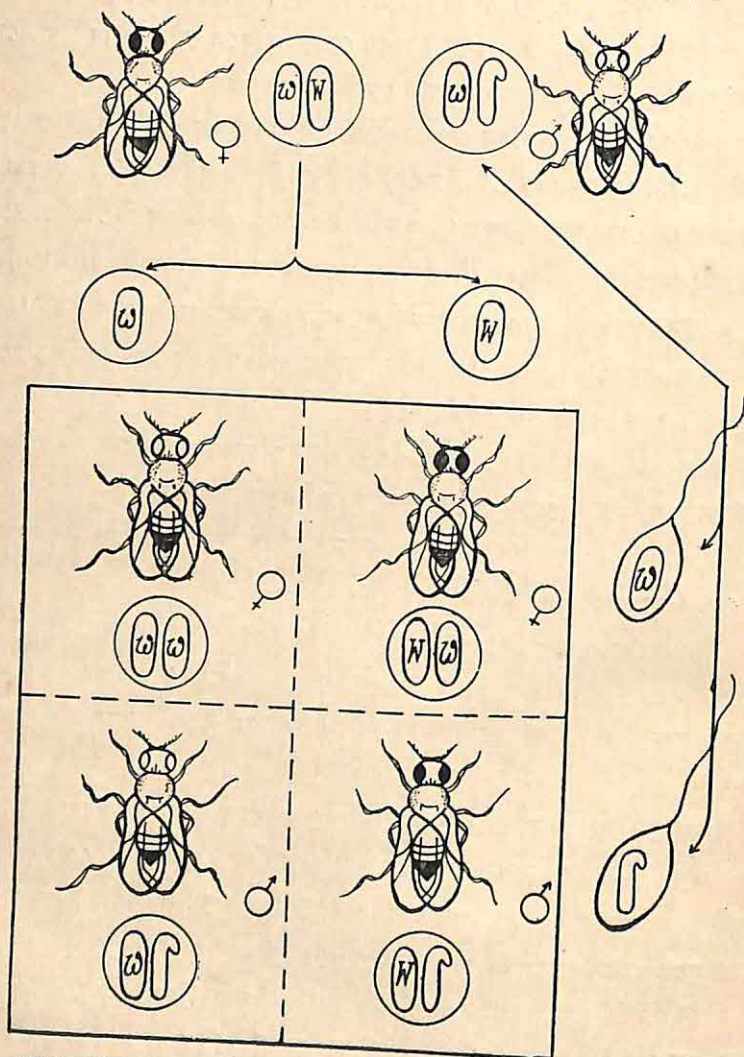
এক্স ক্রমোসোমের অধিকাংশ পরিবর্তিত জীনই পুরুষ দেহে পূর্ণ প্রকাশিত হয় কারণ সাধারণতঃ ওয়াই ক্রমোসোমে সঙ্গী জীন থাকেনা যে প্রতিরোধ

করবে। তাহলে সাদা চোখ স্ত্রী পতঙ্গের সঙ্গে স্বাভাবিক পুরুষ পতঙ্গের মিলনের ফলে জাতকেরা কি হবে? পুরুষ জাতকের হবে সাদা চোখ, স্ত্রী জাতকেরা হবে লাল চোখ এবং স্ত্রী জাতকেরা হবে মিশ্র (Hybird) প্রকৃতির।
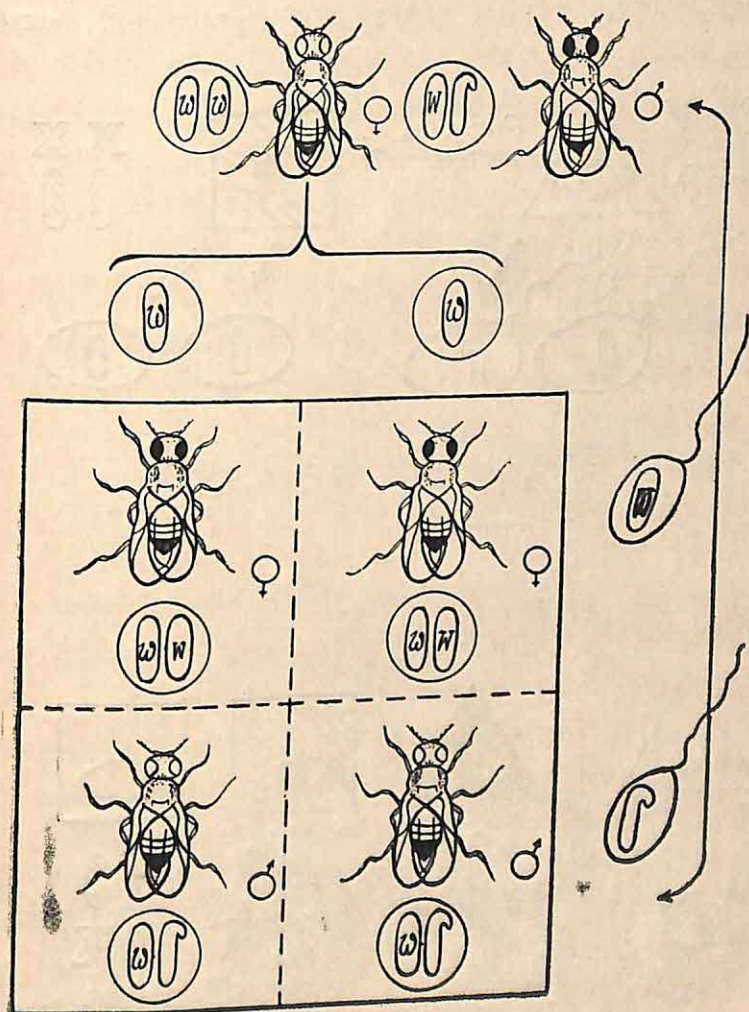
মানব দেহেও পুরুষের যৌন ক্রমোসোম এক্স এবং ওয়াই। মেয়েদের থাকে এক জোড়া এক্স ক্রমোসোম। বর্ণান্ধতা দোষ আসে এক্স ক্রমোসোমের একটি স্বাভাবিক জীন পরিবর্তিত হলে। এই পরিবর্তিত জীনটি দুর্বল

(Recessive) প্রকৃতির। সেইজন্য মেয়েরা বর্ণান্ধ তখনই হবে যখন তার দুইটি এক্স ক্রমোসোমেই এই জীনটি পরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। পুরুষের এক্স ক্রমোসোমে পরিবর্তিত জীনটি থাকলেই সে বর্ণান্ধ হবে কারণ ওয়াই ক্রমোসোমে প্রতিরোধকারী স্বাভাবিক জীনটি নেই। যদি কোন মেয়ের একটি এক্স ক্রমোসোমে এই পরিবর্তিত জীনটি থাকে এবং অন্যটিতে থাকে

সন্তানেরা

স্বাভাবিক জীনটি তাহলে সেই মেয়েটি নিজে স্বাভাবিক হলেও বর্ণান্ধতা বহন করবে (Carrier) কারণ স্বাভাবিক জীনটি প্রবল (Dominant) প্রকৃতির।

এইবার ক্রমোসোমের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে বর্ণান্ধতা জীন আসে এবং কিভাবে আসে অতি সহজেই বোঝা যাবে।

হিমোফিলিয়া (Haemophilia) বা রক্তঝরা রোগ এমনি একটি রোগ যার উদ্ভব হয় এক্স ক্রমোসোমের একটি জীনএর পরিবর্তনে। রক্ত জমাট বাঁধে যে জিনটির প্রভাবে তার পরিবর্তনের ফলে রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট হবার ফলে এই রোগ হয়।

রক্ত ঝরা রোগ হিমোফিলিয়া
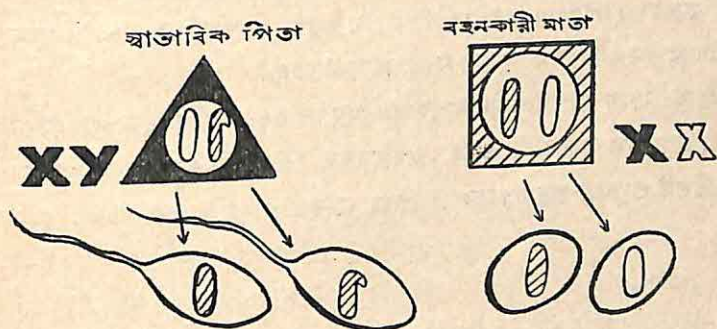
সন্তানেরা
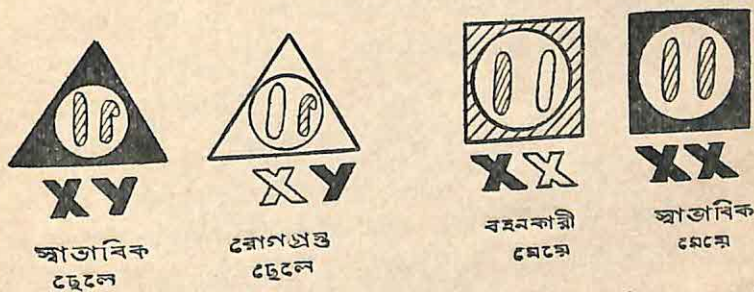
সাধারণ অবস্থায় কোথাও একটু কেটে গেলে রক্ত জমাট বেঁধে কেটে যাওয়া ধমনীর শাখাপ্রশাখার কাটা অংশটি বন্ধ করে দেয় ফলে রক্তপাত বন্ধ

হয়। রক্ত যদি জমাট বাঁধতে না পারে তাহলে সামান্য ক্ষত থেকে দেহের সমস্ত রক্ত নির্গত হয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে।

ওয়াই ক্রমোসোমে কোন প্রতিরোধকারী জীন নেই বলে পুরুষের দেহের এক্স ক্রমোসোমে এই পরিবর্তিত জীনটি থাকলেই রোগের প্রকাশ হয়। মেয়েরা সাধারণতঃ এই রোগ বহনকারী হয় এবং নিজেরা স্বাভাবিক হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই রোগ তখনই প্রকাশ পাবে যখন দুইটি এক্স ক্রমোসোমেই পরিবর্তিত জীন থাকবে। মাতৃদত্ত এক্স ক্রমোসোম পরিবর্তিত জীন বয়ে আনতে পারে কিন্তু পিতৃদত্ত এক্স ক্রমোসোম স্বাভাবিক জীন বয়ে আনে কারণ হিমোফিলিয়া (**Haemophilia**) বা রক্তঝরা রোগ আছে এমন পুরুষ সাধারণতঃ সন্তানের পিতা হবার বয়স পর্য্যন্ত বাঁচেনা।

ওয়াই ক্রমোসোমে জীন থাকে খুব অল্প। এর একটি জীনের পরিবর্তনে কানের উপর চুল জন্মায়। ওয়াই ক্রমোসোমে এই জীনটি আছে বলে পিতৃদত্ত এই চরিত্রটি শুধুমাত্র পুত্র সন্তানেরাই পেয়ে থাকে।

জীব পঙ্ক বাহিত বংশধারা

এপর্য্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি যে বংশধারা বহন করে নিউক্লিক এসিড্। কিন্তু বংশ ধারানুক্রমের বিশ্লেষণে ক্রমোসোম এবং নিউক্লিক এসিডই কি সব কথা? তার বাইরে কোন কিছুই কি নেই যা বংশধারা বহন করতে পারে? এপ্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বংশধারা পরিবহনে ক্রমোসোম এবং নিউক্লিক-এসিড ছাড়াও অন্য কিছু কিছু পদার্থ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। এ ধরনের উদাহরণ প্রাণী জগতেও আছে, উদ্ভিদ জগতেও আছে। এমন উদাহরণও আছে যেখানে দেখা যায় যে বংশধারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে প্রাণকেন্দ্রের বাইরে অবস্থিত বস্তুর প্রভাবে। দেখাযায় যে বংশধারা অনুসরণ করছে ক্রমোসোমের নয়, জীনের নয়, জীবপঙ্কের (Cytoplasm) প্রভাব।

যেখানে শুক্র কোষ ও ডিম্ব কোষের মিলনে জীবদেহের সৃষ্টি অর্থাৎ যৌন প্রজনন হয় সেখানে ডিম্বকোষ বয়ে আনছে জীবপঙ্কের একটা বড় অংশ মায়ের দেহ থেকে। শুক্রকোষ পিতৃদত্ত ক্রমোসোমগুলি আনছে বটে কিন্তু জীবপঙ্ক প্রায় কিছুই আনছেনা। যদি এমন হয় যে জীবপঙ্ক বংশধারায় কিছু চরিত্র প্রভাবান্বিত করে তাহলে স্বভাবতঃই আমরা আশা করব সন্তান হবে মায়ের মতন কারণ নূতন দেহের আদিকোষের জীবপঙ্কের প্রায় সবটাই আসছে মায়ের দেহ থেকে। মাতৃধারানুসারী বংশক্রম সম্ভব হবে শুধুমাত্র জীবপঙ্ক প্রভাবিত বংশধারার প্রভাবে। এর উদাহরণ উদ্ভিদ জগতেও পাওয়া যায় প্রাণী জগতেও পাওয়া যায়।

শঙ্খ, কড়ি, ও শামুক জাতীয় প্রাণীতে এই ধরণের মাতৃধারা অনুসারী বংশক্রমের উদাহরণ পাওয়া যায়। জলে পাওয়া যায় এমন একধরণের ছোট্ট শামুক লিমনিয়ার (Limnaea) কথা আমরা বলব। এদের অনেক প্রজাতিতে দেখা যায় বাইরের আবরণটি ডান দিকে ঘোরান অর্থাৎ আমরা যাকে বলি বামাবর্ত (Dextral type of coiling) এবং যেধরনের দেখা যায় খুব বেশী। এদের কোন কোন প্রজাতিতে দক্ষিণাবর্তও (Sinistral type

of coiling) দেখা যায়—অর্থাৎ বাইরের আবরণটি বামদিকে ঘোরান, যা সচরাচর দেখা যায়না। দক্ষিণাবর্ত্ত প্রকৃতি সংখ্যায় খুবই কম পাওয়া যায়। অনেকে হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে ব্যবসায়ীরা দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ খুব চড়া দামে বিক্রী করে থাকে। খুব অল্প দুই একটি প্রজাতিতে বামাবর্ত্ত এবং দক্ষিণাবর্ত্ত দুই শ্রেণীই দেখা যায়। এই ধরনের একটি প্রজাতিতে (**Limnaea peregra**) দেখাযায় বামাবর্ত্ত দক্ষিণাবর্ত্তের তুলনায় প্রবল (**Dominant**) প্রকৃতির।
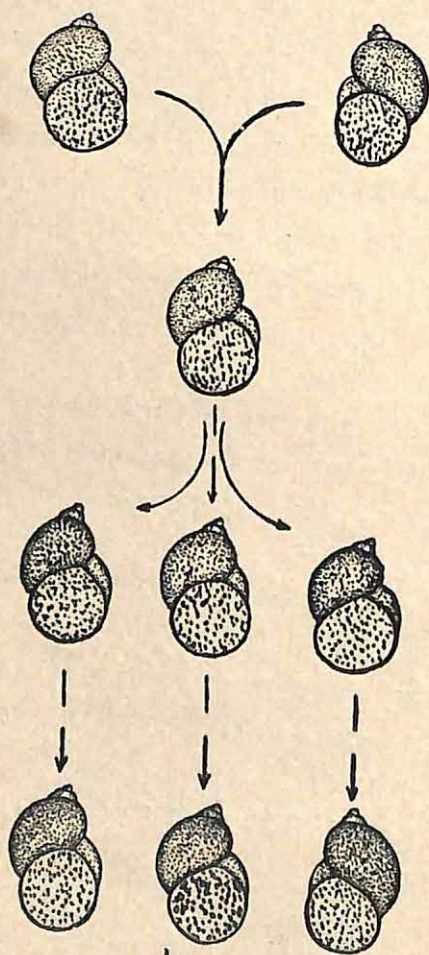
বয়কট, ডাইভার, গারস্টাং প্রমূখ বিজ্ঞানীরা (**Boycott, Diver, Garstang**) এদের প্রজনন পর্য্যবেক্ষন করে এদের এই প্রকৃতির কথা

জানিয়েছেন। এদের প্রাণকেন্দ্রের কোন একটি জীন বামাবর্ত্তের জন্য দায়ী এবং তার পরিবর্তিত রূপ (Recessive form) দক্ষিণাবর্ত্তের জন্য দায়ী। যদিও এই আবর্তন নির্ধারণ হয় প্রাণকেন্দ্র থেকে কিন্তু মূলতঃ তা পরিবহন করে জীবপঙ্ক। অর্থাৎ এমন দেখাযায় যে বাইরে থেকে দেখতে বামাবর্ত্ত এমন শঙ্খের বংশধরেরা সবগুলি হল দক্ষিণাবর্ত্ত। বিশ্লেষণ করলে দেখাযাবে যে ঐ বাইরে থেকে দেখতে বামাবর্ত্ত শঙ্খটির প্রাণকেন্দ্রে দুইটি জীনই ছিল দক্ষিণাবর্ত্ত নির্ণয়কারী। অথচ সে নিজে বামাবর্ত্ত কারণ তার মায়ের দেহ ছিল বামাবর্ত্ত প্রকৃতির এবং যে ডিম্বকোষ থেকে তার জন্ম তা বয়ে এনেছে বামাবর্ত্ত প্রকৃতির জীবপঙ্ক, যার প্রভাব থাকে দেহ গঠনের প্রথম দিকে অর্থাৎ যে সময় আবর্ত্তনের দিক নির্ণয় হয়।

ক্র্যাম্পটন, কঙ্কলিন এবং অন্যান্যরা (Crampton, Conchlin & others) দেখিয়েছেন যে শুক্র ও ডিম্বকোষের মিলনের পর দ্রুত কোষ বিভাজনের সময় বক্র পৃষ্ঠের (Spindle) কৌণিক অবস্থানের উপর আবর্ত্তনের গতি প্রকৃতি নির্ভর করে, এবং তা হয় যৌন কোষের মিলনের পর প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগের (1st and 2nd Clevage) সময়। উদাহরণ দিয়ে দেখান যাক।
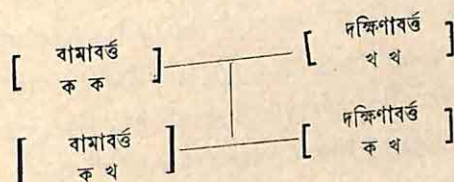
বামাবর্ত্ত হয়েছে প্রবলপ্রকৃতির জীন 'ক' এর প্রভাবে নয়। ডিম্বকোষ যে জীব পঙ্ক এনেছে মায়ের দেহ থেকে তার উপর মায়ের দেহের জীন 'ক' এর প্রভাব রয়েছে বলে। এদের নিজেদের দেহের জীন এখন এদের নিজেদের দেহের জীব পঙ্ক কে প্রভাবান্বিত করবে।

জীনের প্রভাব কার্য্যকরী হলে বামাবর্ত্ত হওয়া উচিত ছিল কারণ জীন 'ক' প্রবল প্রকৃতির। কিন্তু তা হলনা কারণ ডিম্বকোষ যে জীবপঙ্ক এনেছে মায়ের দেহ থেকে তাব উপর মায়ের দেহের খ জীনের প্রভাব রয়েছে। সেইজন্য বর্ত্তমান দেহের প্রবল জীন ক এর প্রভাব কার্যকরী হলনা কারণ দেহ গঠন প্রথমে আরম্ভ হচ্ছে মায়ের দেহ থেকে আনা জীবপঙ্ক দিয়ে। বর্ত্তমান দেহের জীন এখন এই দেহের জীবপঙ্ককে প্রভাবান্বিত (Conditioned) করবে।

পিতৃ পরিচয় যাই হোকনা কেন সব বামাবর্ত্ত হবে কারণ এদের মায়ের দেহের জীবপঙ্কে প্রবল জীন 'ক' এর প্রভাব ছিল। এদের দেহে যে জীন আছে তা এদের দেহের জীব পঙ্কে প্রভাব দিচ্ছে। ফলে 'খখ' শ্রেণীর মায়ের সন্তান সর্ব্বদা দক্ষিণাবর্ত্ত হবে এবং ক ক অথবা 'ক খ' শ্রেণীর মায়ের সন্তান হবে বামাবর্ত্ত।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে শঙ্খের আবর্ত্ত নির্দ্ধারণে জীবপঙ্ক বাহিত বংশক্রম মাতৃধারার প্রতিষ্ঠা করছে। দেখা যাচ্ছে যে সন্তান তার মায়ের ধারা অনুসরণ করবে, পিতৃ পরিচয় যাই হোকনা কেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই প্রজাতির শঙ্খ (Limnaea peregra) উভলিঙ্গ এবং এদের স্বতঃ মিলন অথবা পারস্পরিক মিলন (Self or Cross fertilisation) দুই-ই হয়।

এই উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জীনের প্রভাব প্রধান নিয়ামক হলেও নিয়ন্ত্রণ পরিবহনের কাজে জীনের ভূমিকা কিছু নেই জীবপঙ্কই পরিবাহী। জীনের কাজ শুধু জীবপঙ্ককে নির্দ্দেশিত (Conditioned) করে দেওয়া।

জীব বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুবই পরিচিত **একটি** প্রাণীর উদাহরণ আমরা উল্লেখ করতে পারি এরপর। মিষ্টি জলের প্রাণী, খুব ছোট্ট প্রাণী প্যারামিসিয়ামের (Paramaecium) প্রজনন তত্বই আমাদের সাহায্য করতে পারে জীবপঙ্ক বাহিত বংশধারা বিশ্লেষণে। ক্যালিফোর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সোনেবোর্ন এবং তাঁর সহকারীরা (Sonneborn atei 1949) প্যারামিসিয়ামের প্রজনন তত্ত্বের উপর এক চমকপ্রদ গবেষণার বিবরণ প্রকাশ করেন ১৯৪৯ সালে।
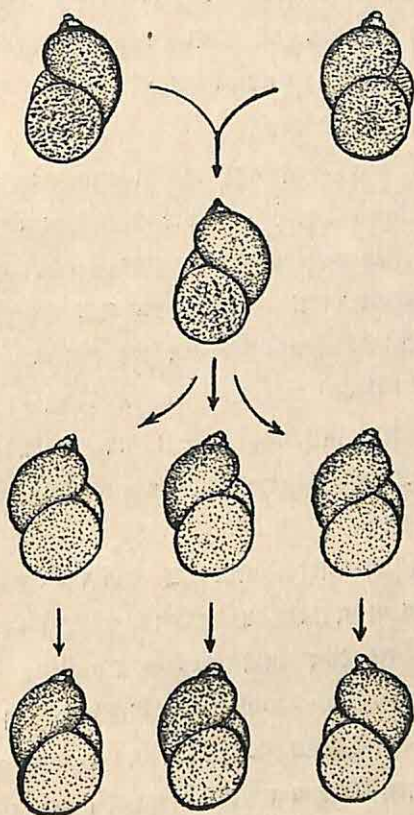
প্যারামিসিয়াম অরেলিয়াতে (Paramoecium aurelia) দেখাযায় একশ্রেণীর প্রাণী কিছু বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে এদের কাছাকাছি থাকলে অন্য প্রজাতির প্যারামিসিয়াম এবং প্যারামিসিয়াম অরেলিয়ার বিষাক্ততায়‌ এমন শ্রেণীর প্রাণীগুলি মরে যায়। বিষাক্ত শ্রেণীর প্রাণীগুলি কিন্তু নিজেদের তৈরী এই বিষ নিজেরা প্রতিরোধ করতে পারে। প্রতিরোধক এবং অপ্রতিরোধ্য এই দুই শ্রেণীর প্যারামিসিয়ামে দেখাযায় জীবপঙ্কে (Cytoplasm) কিছু পার্থক্য আছে। বিষাক্ত শ্রেণীর জীবপঙ্কে দেখাযায় কিছু খুব ছোট্ট পদার্থ যার নাম দেওয়া হয়েছে কাপ্পা বিন্দু (Kappa

Particles)। এই কাপ্পা বিন্দুগুলি আকারে খুবই ছোট এবং এক একটি প্যারামিসিয়ামে এক হাজার পর্যন্ত পাওয়া যায়। বর্ণপ্রয়োগের বিশেষ পদ্ধতিতে (Special staining technique) এদের দৃশ্যমান করে তুলে গণনা করা যায়। প্যারামিসিয়াম অরেলিয়ার অপ্রতিরোধ্য শ্রেণীর (Non resistant type) জীবপঙ্কে এই কাপ্পা বিন্দুগুলি থাকেনা। প্রতিরোধ্য শ্রেণীর (Resistant type) প্যারামিসিয়ামের জীবপঙ্কে অবস্থিত এই কাপ্পা বিন্দুগুলি বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে।

জীবপঙ্কে অবস্থিত এই কাপ্পা পদার্থগুলি নিজেরা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে (Self Duplication) এবং কোষ বিভাগের সময় সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে জীব পঙ্কের সঙ্গে। এর ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও তৈরী হয় বিষাক্ত শ্রেণীর। জীবপঙ্কে উপস্থিত এই কাপ্পা পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে বংশানুক্রমিক ভাবে এবং বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি এই প্রকৃতিও ছড়িয়ে পড়ে বংশানুক্রমিক ভাবেই। এই কাপ্পা পদার্থের আকস্মিক পরিবর্তন বা মিউটেশন (Mutation) হয় দেখাযায় এবং এর রাসায়নিক গঠনে পাওয়া যায় ডেসক্সিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড বা ডি. এন. এ. (Desoxy-Rhibose nucleic acid or D. N. A.) প্রধান উপকরণ হিসাবে।

প্যারামিসিয়াম অরেলিয়ার প্রাণকেন্দ্রে দেখাযায় একটি জীন আছে যার কাজ হল। এই কাপ্পা পদার্থগুলির সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং এই জীন এর প্রভাবে সৃষ্ট কিছু জৈব রসায়ন এই কাপ্পা পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি এবং সংখ্যা বৃদ্ধিতে (growth and multiplication) সহায়তা করে।

কোন কোন বিজ্ঞানী অবশ্য মনে করেন যে এই কাপ্পা পদার্থগুলি প্যারা-মিসিয়ামের জীব পঙ্কে উদ্ভূত ও বংশানুক্রমিক ভাবে আহরিত কোন পদার্থ নয়, এইগুলি একধরণের পরভোজী (Parasite) যারা প্যারামিসিয়ামের দেহে আশ্রয় নিয়ে তাকে বিষাক্ত (Killer) করে তোলে। অবশ্য এই বিষাক্ততার প্রকৃতি মনে হয় ঠিক একটি রোগের মতই। নীরোগ দেহে এই বিষাক্ততা সংক্রামক হতে পারে।

সংক্রামিত হবার পর কোন কোন দেহে এরা স্বচ্ছন্দে বংশ বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। কাপ্পা পদার্থ পরভোজী (Parasite) এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে এই কাপ্পা পদার্থকে আমরা বলতে পারি একধরণের অতি সূক্ষ্ম জীবাণু যারা অপ্রতিরোধ্য শ্রেণীর (Non resistant or Sensitive type)

প্যারামিসিয়ামের পক্ষে ক্ষতিকর (Pathogenic) এবং নিজেরা সংখ্যা বৃদ্ধি (Self duplication) করতে পারে।

যদি বিষাক্ত শ্রেণীর বা প্রতিরোধ্য প্রকৃতির (Killer or Resistant type) প্যারামিসিয়ামের সঙ্গে একটি বিষাক্ত নয় এমন শ্রেণীর বা অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির (Sensitive or non resistant type) প্যারামিসিয়াম অরেলিয়ার মিলন হয় তাহলে কি হবে? এর ফলাফল হতে পারে দু রকম।

(১) মিলন যদি খুবই অল্পক্ষণ স্থায়ী হয় এবং জীব পঙ্কের কোন অংশ যদি একদেহ থেকে অন্য দেহে যাবার সুযোগ না পায় তাহলে এই মিলনের পর আলাদা হয়ে গেলে অপ্রতিরোধ্য শ্রেণীর থেকে জন্ম হবে অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির এবং প্রতিরোধ্য শ্রেণীর থেকে জন্ম হবে প্রতিরোধ্য প্রকৃতির এবং অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির ১ : ১ হারে।

(২) মিলন যদি দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং জীবপঙ্ক যদি সেই সময়ের সুযোগে এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরের সুযোগ পায় তাহলে অপ্রতিরোধ্য প্যারামিসিয়াম প্রতিরোধ্য বা বিষাক্ত শ্রেণীতে পরিণত হবে। এর থেকে পরবর্তী বংশে দেখাযাবে বিষাক্ত এবং বিষাক্ত নয় এই দুই শ্রেণী ১ : ১ এই অনুপাতে আসছে।
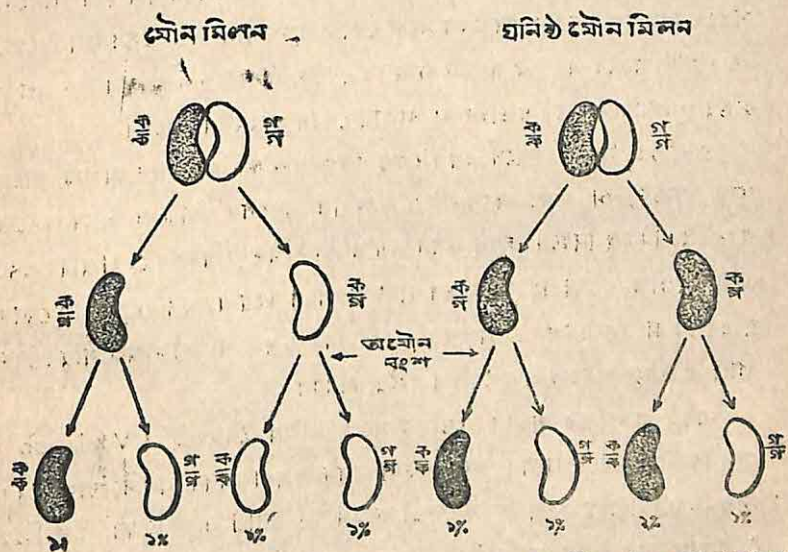
যেখানে প্রাণকেন্দ্রে কাপ্পা পদার্থ সংরক্ষণের জন্য জীন থাকবেনা সেখানে জীবপঙ্কে কাপ্পা পদার্থ এলেও তা স্থায়ী হবে না, নষ্ট হয়ে যাবে।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে জীবপঙ্ক বংশক্রম বহন করতে পারে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীন এবং নিউক্লিক এসিডই বংশধারা বহন করে, জীব পঙ্কের ভূমিকাও দেখা যাচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

আকস্মিক পরিবর্ত্তন

১৯০১ সালে দ্য ভ্রীস (Devries 1901) একটি নূতন কথা ব্যবহার করলেন মিউটেশন (Mutation or Sudden change) যার অর্থ হল আকস্মিক পরিবর্ত্তন। কোষবিজ্ঞান ও বংশধারা এবং বিবর্ত্তন বাদের তত্ত্বে এই ছোট্ট কথাটি এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করল। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে নূতন চরিত্রের উদ্ভব অথবা কোন চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় কেন? দ্যভ্রীস (Devries) বললেন বংশানুক্রমিক চরিত্র গুলি নিয়ন্ত্রণ করে যে সমস্ত পদার্থ তাদের মধ্যে কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তনই নূতন চরিত্র সৃষ্টি, কোন চরিত্রের উদ্ভব, অথবা কোন পরিবর্ত্তন ইত্যাদির জন্য দায়ী। যেমন লাল রঙের ফুল দিচ্ছে এমন একটি গাছে বংশানুক্রমিক ভাবে লাল রঙের ফুল হয়ে আসছে, হঠাৎ দেখাগেল তার বংশধরদের মধ্যে কোন একটিগাছ অন্য রঙের ফুল দিচ্ছে, হয়ত সাদা রঙের এবং ঐ গাছটি তারপর থেকে বংশানুক্রমিকভাবে এই সাদা রঙের ফুলই দিয়ে যাবে যতদিন না আবার কোন পরিবর্ত্তন আসে।

প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে এরকম হয় কিন্তু এত কম হারে হয় যে এর আগে আর কেউই তা লক্ষ্য করেননি। দ্যভ্রীস বললেন প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে কখন কখন এমনি আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখা যায় এবং ঐ পরিবর্ত্তীত অবস্থা বংশানুক্রমের ধারা অনুসরণ করে যতক্ষণ না আবার কোন পরিবর্ত্তন বা মিউটেশন আসে। এই মিউটেশন বা আকস্মিক পরিবর্ত্তনই প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে এত বৈচিত্র সৃষ্টির কারণ।

একই প্রজাতির সন্তান সন্ততির মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্রই (Variation) যে বিবর্ত্তনবাদের গোড়ার কথা একথা প্রথম কল্পনা কারণ চার্লস ডারউইন। তাঁর বিবর্ত্তনবাদের তত্ত্ব তিনি তৈরী করেন বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজাতির বৈচিত্র ও তার প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে। ডারউইনের বক্তব্যছিল যে একই প্রজাতির সন্তান সন্ততিদের মধ্যে বহু বৈচিত্র দেখা যায়। তাদের প্রকৃতিগত এই বৈচিত্রের কিছু তাদের জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে এবং সেই সব গুণাবলী যাদের নেই জীবন সংগ্রামে তারা জয়ী হয় না। প্রকৃতির

নির্ব্বাচনে (Natural Selection) স্থান পায় তারাই জীবন সংগ্রামে (Struggle for existance) জয়ী হবার যোগ্যতা যাদের আছে। যেমন ঘন অরণ্যে কোন গাছের তলায় বীজ পড়ে অসংখ্য চারা জন্মাল। এর সবগুলিই কিন্তু মহীরুহে পরিণত হবেনা। তার কারণ কতকগুলি চারা স্বল্প পরিসরে জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহে সক্ষম এবং আরো অনেক গাছ ও লতা পাতার ফাঁকে উপরদিকে বেড়ে উঠে সূর্য্যের আলোর স্পর্শ পাবার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন সেই যোগ্যতার অধিকারী। ফলে এরাই প্রকৃতির করুণা লাভে সমর্থ হবে। অন্যান্য চারাগুলি যাদের এই সবগুনগুলি নেই তারা পর্য্যাপ্ত খাদ্য, সূর্য্যালোক ইত্যাদির অভাবে অকালে বিদায় নেবে।

একই প্রজাতির বিভিন্ন সন্তান সন্ততির মধ্যে এই যে গুণগত পার্থক্য বা বৈচিত্র এর কারন কিন্তু ডারউইন জানতেন না। তাই তাঁর বিবর্ত্তন বাদের তত্ত্বে অনেক প্রশ্নের অবকাশ ছিল। দ্যভ্রীস বললেন এই বৈচিত্র বা গুণগত পার্থক্য হল আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফল। প্রকৃতিতে এই পরিবর্ত্তন আসে অত্যন্ত কম হারে। দ্য ভ্রীসের এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ধারার একটা নূতন পথ খুলে গেল। বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে আকস্মিক পরিবর্ত্তন বা মিউটেশনের হার অত্যন্ত কম বলেই একই প্রজাতির বংশধারায় বিভিন্ন বৈচিত্র আসে অত্যন্ত ধীর গতিতে এবং সেই জন্যই নূতন প্রজাতির উদ্ভব এবং ক্রমবিবর্ত্তন এত দীর্ঘ ও শ্লথ গতিতে হয়।

দ্য ভ্রীস ও সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কাছে প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের কোষ বা সেলের (Cell) আভ্যন্তরীণ ক্রীয়াকলাপের অনেক কিছুই তখনো অজ্ঞাত ছিল কারণ কোষ বিজ্ঞান (Cytology) তখনো শৈশব অবস্থা পার হয়নি। দেহের প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরে কোথায় কি বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটছে যার জন্য এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের বহিঃপ্রকাশ হয় নূতন চরিত্রের উদ্ভবে, তা তাঁদের জানা ছিলনা। মূল কারণের সন্ধান পেতে সময় লাগল আরো বেশ কিছু দিন।

আকস্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation) দুই শ্রেণীর হতে পারে (১) ক্রমোসোমের দেহের স্থুল পরিবর্ত্তন (২) সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন, জীনের মৌলিক গঠনের পরিবর্ত্তন। সাধারণ ক্রমোসোম গুলির আকৃতি এমন এবং আকারে এত ছোট যে খুব সামান্য কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা খুব কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব। আকৃতি ও দৈর্ঘ্যের খুব বড় রকমের পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

বিভিন্ন প্রজননের মাধ্যমে বংশধারা অনুশীলন করে আমরা বুঝতে পারি যে বংশধারা পরিবাহী পদার্থের কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু কি সে পরিবর্ত্তন? ক্রমোসোমের দেহে অতিসূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন অনেক সময় আমরা আমাদের আয়ত্বাধীন পদ্ধতিতে ধরতে পারি না। মনে করি জীনের মৌলিক গঠনের কোন পরিবর্ত্তন। যে সব প্রাণীতে অবশ্য লালাগ্রন্থি ক্রমোসোম দেখা যায় সেই সব প্রাণীতে ঐ বিশেষ শ্রেণীর ক্রমোসোমের বিশাল দেহ ও রেখা চিহ্নিত অংশে খুব সামান্য পরিবর্ত্তনও ধরতে পারি। কিন্তু সব প্রাণীতে তা সম্ভব নয়।

সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন জীনের মৌলিক গঠনের পরিবর্ত্তন। আমরা এ পর্য্যন্ত জানি এবং আজ পর্য্যন্ত বহু বিশ্লেষনের সম্মুখীন হয়েও এ ধারণা এখনো সত্য হয়ে আছে যে জীন গুলি ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্য অনুসারে পর পর সাজান থাকে। এদের প্রভাবের উপর নির্ভর করে কোন না কোন চরিত্র। এই জীন গুলি অত্যন্ত স্থায়ী প্রকৃতির, সহজে এদের গঠনের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয় এবং এরা হুবহু নিজেদের অনুকৃতি প্রস্তুত করতে পারে কোষ বিভাজনের সময়ে।

বংশধারা পরিবাহী পদার্থ অত্যন্তস্থায়ী এবং রক্ষনশীল প্রকৃতির হলেও কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে তার মৌলিক গঠনের পরিবর্ত্তন ঘটছে। জীনের আভ্যন্তরিণ রাসায়নিক গঠনের পরিবর্ত্তনের ফলে নূতন জীনটি তার আগের অপরিবর্ত্তীত অবস্থার থেকে পৃথক হয় এবং যে চরিত্র তার প্রভাবের ফলে সৃষ্ট সেই চরিত্রেরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়। নূতন জীনের কার্য্যধারা নূতন পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং এই নূতন জীন কোষ বিভাজনের সময়ে তার নূতন রূপেরই অনুকৃতি সৃষ্টি করে চলে যতদিন না আবার কোন পরিবর্ত্তন আসে।

আকস্মিক পরিবর্ত্তন প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে এমনিও হতে পারে আবার গবেষণাগারে আমরা সৃষ্টি করতেও পারি। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন কেন হয় কি ভাবে হয় এর সঠিক কারণ সম্ভবতঃ আজও আমাদের অজানা। তাপমাত্রার পরিবর্ত্তন জীনের রাসায়নিক সংগঠনে পরিবর্ত্তন আনতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থও এই পরিবর্ত্তন আনতে পারে। বিভিন্ন রশ্মি প্রয়োগেও এই পরিবর্ত্তন আসতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে ঠিক কি কারণে আকস্মিক পরিবর্ত্তন আসে তা আজো আমাদের অজানা। প্রকৃতিতে মহাজাগতিক রশ্মির অদৃশ্য প্রভাব (Cosmic rays) আমাদের উপর সব

সময় পড়ছে। প্রকৃতিতে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের (Mutation) কারণ তা হতেপারে এমন কল্পনা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে মহাজাগতিক রশ্মির পরিমান অত্যন্ত কম এবং প্রকৃতিতে আকস্মিক পরিবর্ত্তন আনবার পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত নয়। অন্য কোন কারণ অবশ্যই আছে।

কোন কোন জীন অন্যগুলির তুলনায় পরিবর্ত্তীত হয় সহজে। এদের বলা হয় পরিবর্ত্তনশীল (Mutable) জীন। কোন কোন জীন অন্য জীন গুলির পরিবর্ত্তীত হবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন প্রাণীদেহে বিভিন্ন জীনের পরিবর্ত্তীত হবার ক্ষমতা এক নয়। বংশধারাশ্রয়ী বৈচিত্রের মূলকারণ হল আকস্মিক পরিবর্ত্তন।

গোল্ডস্মিডটের (Goldschmidt) ধারণা ছিল যে জীনের পরিবর্ত্তন বলে কিছু নেই সবই ক্রমোসোমের দেহের সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন যা আমাদের সম্ভাব্য পদ্ধতিতে ধরা সহজ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধারণা সত্য হলেও এই ধারণা সর্ব্বত্র সত্য বলে আমরা মেনে নিতে পারিনা।

ক্রমোসোমের সমস্ত অংশটাই যদি একই রকমের হত তাহলে তার কোথাও সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন হলে কোন চরিত্রের পরিবর্ত্তন সম্ভব হত না। কিন্তু ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন অংশের প্রকৃতি যদি বিভিন্ন হয় তাহলে কোন অংশের সামান্য পরিবর্ত্তনই কোন চরিত্রের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আনতে সক্ষম। অতএব ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন অংশের পার্থক্য আছে। এই বিভিন্ন অংশ এল কি ভাবে? আমরা মনে করি বিভিন্ন আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফল।

কোন জীন বর্ত্তমান অবস্থা থেকে কোন পরিবর্ত্তীত রূপ যেমন নিতে পারে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে; তেমনি আবার কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে সেই আগেকার অবস্থা ফিরে পাওয়াও (Back mutation) সম্ভব। অবশ্য যেখানে ক্রমোসোমের কোন অংশ নষ্ট হয়ে যায় (Delition) সেখানে এই ভাবে আগের অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব নয়।

১৯০১ সালে ডভ্রীস উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের তথ্য পরিবেশন করার পর এই বিষয়ে আরো আকর্ষণীয় তথ্য সরবরাহ করলেন মরগ্যান ও তাঁর ছাত্ররা (T. H. Morgan & his school) ১৯০৯ সাল থেকে। মরগ্যানের কাজ ছিল এক ধরনের পতঙ্গের উপর। লাল চোখ ছোট্ট এই পতঙ্গটি ফলের উপর খুব দেখা যায়। ফলের গন্ধে এরা আকৃষ্ট হয়।

এই পতঙ্গটির নাম ড্রসোফিলা যার বিভিন্ন প্রজাতির উপর অসংখ্য গবেষণা আজ পর্য্যন্ত হয়েছে। মরগ্যান ও তাঁর ছাত্রেরা এই পতঙ্গের অসংখ্য উদাহরণ পরিবেশন করলেন যার মূল কারণ হল আকস্মিক পরিবর্ত্তন।

ড্রসোফিলা পতঙ্গে সর্ব্বপ্রথম যে চরিত্রটির আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্যকরা হয় সেটিহল চোখের রঙ। ১৯০৯ সালে মরগ্যানের গবেষনাগারে অসংখ্য লালচোখ ড্রসোফিলা পতঙ্গের মধ্যে একটি সাদাচোখ পুরুষ পতঙ্গ পাওয়া যায়। মরগ্যান দেখলেন যে ড্রসোফিলাতে চোখের সাদারঙ একটি লিঙ্গাশ্রয়ী চরিত্র। ঐ সাদা চোখ পুরুষ পতঙ্গটির বংশধারা অনুশীলন করে সহজেই একটি বিশুদ্ধ শ্রেণীর সাদা চোখের পতঙ্গের গোষ্ঠি পাওয়া গেল। এরপর ক্রমশঃ মরগ্যান ও তাঁর ছাত্ররা আরো অসংখ্য এই ধরনের উদাহরণ উপস্থিত করলেন।

১৯২০ সালে মৃলার প্রকাশ করলেন যৌন ক্রমোসোমে আকস্মিক পরিবর্ত্তন নির্ণয়ের তথ্য। ম্যুলারের (H. J. Muller 1920) পদ্ধতি অনুসারে ড্রসোফিলা পতঙ্গে যৌন ক্রমোসোমের জীনের পরিবর্ত্তন নির্ভূর্লভাবে হিসাব করা যায়।

ম্যুলারের পদ্ধতিকে বলা হয় সি. এল. বি প্রথা। সি এল এবং বি হল ড্রসোফিলার এক্স ক্রমোসোমের তিনটি পৃথক জীন। 'সি' হল একটি বিপরীত ক্রম যার প্রভাবে ক্রমোসোমে আরকোন ভাঙ্গা গড়া হয় না (No Cross over); 'বি' হল একটি জীন যার প্রভাবে ড্রসোফিলা পতঙ্গের চোখের আকৃতি হয় একটি রেখার মত। এই চরিত্রটি প্রবল (Dominant) প্রকৃতির কাজেই বাইরে থেকে সহজেই বোঝা যায়। 'এল' হল একটি জীন (Leather gene 'L') যার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল হল মৃত্যু। এই জীনটির প্রভাব দুর্ব্বল (Recessive) প্রকৃতির।

রেখা আকৃতির চোখের (Bar eyed) একটি ড্রসোফিলা স্ত্রী পতঙ্গের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক চোখের ড্রসোফিলা পুরুষ পতঙ্গের মিলন করা হল। ঐ পুরুষ পতঙ্গটিতে রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করা হয়েছিল। এদের মিলনের ফলে সৃষ্ট স্ত্রী পতঙ্গ গুলির অর্দ্ধেক হল রেখা আকৃতির চোখের অর্দ্ধেক হল স্বাভাবিক চোখের। পুরুষ পতঙ্গ গুলির অর্দ্ধেক হল স্বাভাবিক বাকি অর্দ্ধেক বাঁচল না। যে পুরুষ পতঙ্গ গুলি মরে গেল সেগুলি রেখা প্রকৃতির চোখের। অর্থাৎ এরা মায়ের দেহের সি. এল. বি ক্রমোসোমটি পেয়েছে। পিতৃবংশের ওয়াই ক্রমোসোমে 'এল' জীনটিকে প্রতিরোধ করার মত কোন জীন ছিলনা।

পুরুষ পতঙ্গ গুলির যে অর্দ্ধেকগুলি স্বাভাবিক হয়ে বেঁচে রইল তারা মায়ের দেহ থেকে স্বাভাবিক ক্রমোসোমটি পেয়েছিল। স্ত্রী পতঙ্গের অর্দ্ধেক সি এল বি ক্রমোসোম পেয়ে রেখা চোখ নিয়ে জন্মাল। এরা কিন্তু বেঁচে রইল কারণ পিতৃবংশ থেকে যে ক্রমোসোমটি পেয়েছে সেইটি স্বাভাবিক ক্রমোসোম এবং এল জীনের প্রতিরোধক স্বাভাবিক জীন আছে। এই ক্রমোসোমটি রঞ্জন রশ্মি গ্রহণ করলেও এখন পর্য্যন্ত কোন জীনের পরিবর্ত্তন হয়নি।

এইবার এই পরীক্ষার দ্বিতীয় স্তরে রেখা প্রকৃতির চোখের স্ত্রীপতঙ্গ যার একটি ক্রমোসোম রঞ্জন রশ্মি গ্রহণ করেছে তার সঙ্গে মিলন করা হল স্বাভাবিক একটি পুরুষ পতঙ্গের। এদের সন্তানদের মধ্যে দেখা গেল স্ত্রীপতঙ্গের অর্দ্ধেক রেখা প্রকৃতির চোখের, অর্দ্ধেক স্বাভাবিক। পুরুষ পতঙ্গে অর্দ্ধেক বাঁচেনা তারা রেখা প্রকৃতির চোখের। বাকি অর্দ্ধেক স্বাভাবিক চোখের কিন্তু এরা একটি এক্স ক্রমোসোম পেয়েছে যা রঞ্জন রশ্মি গ্রহণ করেছে। এই ক্রমোসোমে যদি আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে তা হলে প্রাণ শক্তি রক্ষার জীনটি পরিবর্ত্তীত হয়ে 'এল' জীন অর্থাৎ মৃত্যু বাহক জীনে পরিণত হবে যার প্রতি-রোধক ওয়াই ক্রমোসোমে নেই ফলে এরাও বাঁচবে না। এই পরীক্ষায় যদি পুরুষ পতঙ্গ গুলি সবগুলিই মরে যায় তাহলে বোঝা যাবে রঞ্জন রশ্মি প্রযুক্ত ক্রমোসোমটিতে জীনের আকস্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation) হয়েছে।

মূলার ১৯২৭ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার আকস্মিক-পরিবর্ত্তন (Mutation) রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগে গবেষনাগারে সৃষ্টি করা সম্ভব। পরবর্ত্তীকালে আরো দেখা গেল যে রঞ্জন রশ্মিই শুধু নয় আলফা, বিটা, গামা রশ্মি এবং অতিবেগুনী রশ্মির প্রয়োগেও জীনের এবং ক্রমোসোমের পরিবর্ত্তন সম্ভব।

আমরা জানি যে প্রত্যেক পরমাণুর (Atom) মূল কেন্দ্র পজিটিভ চার্জ যুক্ত এবং তার বাইরে চারপাশে একসারি নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেক্‌ট্রন থাকে। এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ সর্ব্বদা সমতা রক্ষা করে চলে এবং পরমাণু গুলিতে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জের পরিমান সমান থাকে। যখন অদৃশ্যরশ্মি জীবকোষের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত যায় তখন পরমাণু থেকে বাইরের অংশের কিছু ইলেকট্রন ঝরে যায় এবং ঐ অদৃশ্য রশ্মির শক্তি প্রধানতঃ এই জন্য নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। পরমাণুর দেহ থেকে কিছু ইলেক্‌ট্রন ঝরে গেলে নেগেটিভ চার্জ কম হয়ে যায় ফলে পরমাণু তখন পজিটিভ চার্জ বহন করতে থাকে।

পারমানবিক অবস্থার এই পরিবর্ত্তন ক্রমোসোমেও হয় যখন তার মধ্য দিয়ে অদৃশ্য রশ্মি যায়। পারমানবিক অবস্থার এই পরিবর্ত্তনের সময় রাসায়নিক গঠনেরও কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ক্রমোসোম এবং তার অংশ জীনের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলেই নুতন নুতন চরিত্রের উদ্ভব হয় যার নাম ভ্রীস দেন আকস্মিক পরিবর্ত্তন।

অদৃশ্য রশ্মির প্রয়োগের ফলে যে পরিবর্ত্তন (Mutation) হয় তা নির্ভর করে জীব কোষ ঐ রশ্মি কতটা গ্রহণ করল তার উপর সময়ও দূরত্বের উপর নয়। কোন কোষ ১০০ ভাগ রশ্মি (100 runitor Roentgen Unit) গ্রহণ করল এক ঘণ্টায় এবং কোন কোষ ঐ পরিমাণ রশ্মি গ্রহণ করল পাঁচ ঘণ্টায় এদের মধ্যে জীনের পরিবর্ত্তন বা ক্রমোসোমের বিকৃতি ইত্যাদি দেখা যাবে একই অনুপাতে। জীব কোষ অদৃশ্য রশ্মি কতটা গ্রহণ করেছে তার উপরেই এই প্রভাব নির্ভর করবে।

ম্যুলারের পরীক্ষার মাধ্যম ছিল ড্রসোফিলা পতঙ্গ। ১৯২৭ সাল ম্যুলার তাঁর এই তথ্য প্রকাশ করলেন। ঐ সময়ই আর একজন বিজ্ঞানীও নিজস্ব ভাবে এই একই তথ্য আবিষ্কার করেন উদ্ভিদে তাঁর নাম স্টেডলার। তিনি তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করেন ১৯২৮ সালে।

দেহের যে কোষ গুলিতে অদৃশ্য রশ্মি প্রয়োগ করা হয় শুধু মাত্র সেই কোষ গুলিতেই ক্রমোসোম ও জীনের আকস্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation) হয়। ড্রসোফিলা পতঙ্গে এ তথ্য প্রমাণ করে কারকিস (Kerkis 1935) ১৯৩৫ সালে।

জীবকোষে রঞ্জন রশ্মির প্রভাব আবিষ্কারের অল্প পরেই অল্টনবার্গ (Alten burg) আবিষ্কার করলেন যে অতি বেগুনী রশ্মি ও আকস্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation) আসতে পারে। অতি বেগুনী রশ্মির (Ultra violetray) অবশ্য দেহকোষ ভেদকরার শক্তি এত কম যে দেহের বাইরের আবরণীতেই তা টেনে নেয় ভিতরের কোষগুলির অভ্যন্তরে তা পৌঁছোয় না। অল্টেনবার্গ সেই জন্য ড্রসোফিলা পতঙ্গের ডিমের উপর এই রশ্মি প্রয়োগ করেছিলেন।

রঞ্জন রশ্মির তুলনায় অতিবেগুনী রশ্মির শক্তি অনেক কম এবং তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনেক বেশী হলেও জীন ও ক্রমোসোম দুই এরই আকস্মিক পরিবর্ত্তন অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে হয়।

রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে আকস্মিক পরিবর্তন :—

নিউরোস্পোরা ছত্রাকে ডিকি, ক্লেল্যাণ্ড, এবং লোৎস (Dickey, Cleland, and Lotz) দেখিয়েছিলেন যে রাসায়নিক মাধ্যমে এই ছত্রাকগুলি জন্মায় তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জৈবরসায়ন (Organic Peroxide) প্রয়োগ করলে এই ছত্রাকে আকস্মিক পরিবর্তনের (Mutation) হার বেড়ে যায়।

ওয়েস্ এবং হাস্ (Wyss & Haas) দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন জীবাণুর (Bacteria) খাদ্য হিসাবে যে রাসায়নিক মাধ্যম ব্যবহার করা হয় সেই রাসায়নিক মাধ্যমটিতে যদি অতি বেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করা হয় তাহলে জীবাণু গুলিতে আকস্মিক পরিবর্তনের হার বৃদ্ধি হয়। এর কারণ অবশ্য অতি বেগুনী রশ্মির প্রয়োগে ঐ রাসায়নিক মাধ্যমে কিছু জৈব রসায়ন (Organic Peroxide) সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে জীবাণুগুলিতে আকস্মিক পরিবর্তন (Mutation) আসে।

সবচেয়ে শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ যা জীবকোষে আকস্মিক পরিবর্তন আনে তা হল মাস্টার্ড গ্যাস [Mustard gas $(Cl\ CH_2CH_2)_2S$] এবং এ তথ্য আবিষ্কার করেন অরবাখ এবং রবসন (Auer bach & Robson) ১৯৪৯ সালে।

জীবাণুর দেহে (Bacteria) আকস্মিক পরিবর্তন আনে এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় যেমন বোরিক এসিড, এমোনিয়া, হাইড্রোজেন পারক্সাইড, ল্যাকটিক এসিড, ফরমিক এসিড, কপার সালফেট, ফেনল ফরমালডিহাইড প্রভৃতি।

তাপ মাত্রার প্রভাব :—

উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োগে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে কিন্তু এত কম হারে যে সহজে তা নির্ণয় করা কঠিন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আকস্মিক পরিবর্তন অতি নিম্ন তাপ মাত্রার প্রভাবেও ঘঠছে।

আকস্মিক পরিবর্তনকে তাহলে আমরা আরো দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক পরিবর্তন (Spontaneus Mutation) যার সঠিক কারণ আজো আমাদের অজানা।

(২) গবেষণাগারে বিভিন্ন মাধ্যম যেমন কোন অদৃশ্য রশ্মি, রসায়ন অথবা বিভিন্ন তাপ মাত্রার প্রয়োগে সৃষ্টি করা পরিবর্ত্তন (Induced Mutation) যার অনেকাংশই গবেষকের নিয়ন্ত্রণে।

ক্রমবিবর্ত্তন ঘটে বিভিন্ন বৈচিত্রের সমন্বয়ে। সেই বৈচিত্রের সরবরাহ প্রকৃতি এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সাহায্য করে। বিবর্তন বাদের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক পরিবেশে আকস্মিক পরিবর্ত্তন তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

জীন ও তার অংশ

জীন ক্রমোসোমের একটি অংশ। আমরা চোখে দেখতে পাইনা, মাইক্রোসকোপে আন্দাজ করা সম্ভব নয়, দেখা সম্ভব নয়, ছবিতোলা অসম্ভব, তবুতার অস্তিত্ব আমরা বুঝি ; প্রমাণ করতে পারি তার অবস্থান, হিসাব করতে পারি একজীন থেকে অন্ত জীনের দূরত্ব বিভিন্ন প্রজনন চক্রের হিসাব নিকাশে ; সেই হিসাব ধরে ক্রমোসোমে জীনের অবস্থান অনুযায়ী ক্রমোসোমের মানচিত্রও তৈরী করা যায়। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে বংশধারা পরিবহনের কাজে সবচেয়ে ছোট্ট বস্তুটি হল একটি জীন। সব জীনের আকার সমান নয়। কোনটি আকারে খুব ছোট, কোনটি বেশ বড়। সব জীনের প্রকৃতিও একনয়। কোনটি একক প্রভাবে উল্লেখ যোগ্য নিয়ন্ত্রনের অধিকারী, কোনটি বহুজনের সঙ্গে সম্মিলিত প্রভাবে কিছু নিয়ন্ত্রন করে কোনটি আবার একাধিক নিয়ন্ত্রণ কাজের সঙ্গে জড়িত। আমাদের ধারণা ছিল যে ডেসক্সিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড যার মূল উপাদান ; সেই জীনই হল বিশেষত্ব নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে ছোট্ট অংশ। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এসেছেন আরো কিছুদূর। কিছু প্রমাণ পত্র ভিত্তিকরে গড়ে উঠেছে এঁদের নূতন ধারণা যে জীনের বিভিন্ন অংশ আছে যাদের কাজ হল ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে।

বেনজের ১৯৫৫ সাল থেকে তাঁর সুদীর্ঘ অনুশীলনে (S. Bengeretel 1955, 57, 58, 61) ভাইরাসের বংশ ধারায় আকস্মিক পরিবর্ত্তনের বিশ্লেষণে এই ধারনায় উপনীত হন যে জীনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পর্য্যায়ের কাজের জন্য দায়ী। বেনজের এর বিশ্লেষণ অনুসরণ করলে দেখা যায় যে জীনের একটি অংশ সব কিছু কাজ কর্ম্মের জন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী (functional unit) বলা চলে। বেনজের তার নাম দিলেন সিসট্রন (Cistron)।

যদিও সিস্ট্রন জীনের একটা অংশ তবুও সিস্ট্রন কে বেশ বড় অংশ ধরা যায় কারণ একটি সিস্ট্রনে আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে এমন অংশ বেশ কিছু পাওয়া

যেতে পারে, এবং ক্রমোসোম ভাঙ্গা গড়ার সময় স্থান পরিবর্ত্তন (Recombination) করে এমন অংশও বেশ কিছু থাকতে পারে।

বেনজের তাঁর এই বিশ্লেষণে স্থান পরিবর্ত্তনে সক্ষম ক্ষুদ্রতম অংশকে চিহ্নিত করলেন রেকন (Recon) নামে। রেকন হল সবচেয়ে ছোট্ট অংশ যা ক্রমোসোম ভাঙ্গার ফলে সৃষ্টি হতে পারে। তার চেয়ে ছোট অংশে আর ভাঙ্গা যায় না। বেনজের আরো চিহ্নিত করলেন মিউটন নামে একটি অংশ যা হল সবচেয়ে ছোট্ট অংশ যার আকস্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation) হতে পারে। এই রেকন এবং মিউটনের আয়তন এর আন্দাজ ও বেনজের দিয়েছেন। এই সবই ডেসক্সিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড বা ডি এন এ দিয়ে গড়া। 'ডি এন এ'তে নিউক্লিওটাইড জোড়া থাকে পরপর সাজান। বেনজের এর অভিমত এই মিউটন এবং রেকন একজোড়া বা দু জোড়া নিউক্লিওটাইডের চেয়ে বড় হতে পারেনা।

বেনজের এর বিশ্লেষণে আমরা জীনের তিনটি অংশ দেখাছ।

১। কর্ম্ম ব্যস্ত অঞ্চল—সিস্ট্রন।

২। সবচেয়ে ছোট আকস্মিক পরিবর্ত্তনশীল অংশ—মিউটন।

৩। সব চেয়ে ছোট বিনিময় যোগ্য অংশ—রেকন।

জীনের এই অংশগুলি চিহ্নিত করা যে শুধু ভাইরাসেই যায় তা নয়, ব্যাকটিরিয়া এবং অন্যান্য সব শ্রেণীর উন্নত ধরনের প্রাণীতেও যায়। জীনের প্রভাব হল বহুমুখী এবং এইসব কিছু প্রয়োজন যে একটি ক্ষুদ্রতম অংশের দ্বারা মেটান সম্ভব হ'তে পারেনা তা অতি সহজ সত্য। বংশধারা পরিবহনের পূর্ণ দায়িত্ব পালনের কাজ একটি মাত্র ক্ষুদ্রতম অংশের ওপোর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে পারে না। যেমন পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হিসাবে প্রথমে-চিহ্নিত করা হয়েছিল পরমাণুকে, এখন আবার আমরা তার আরো তিনটি অংশ মিউট্রন, প্রোটন, ইলেক্ট্রন জানি ; ঠিক সেই রকম ভাবেই আমাদের জীন সম্পর্কে যে ধারনা আগে ছিল এখন তার বিকাশ হয়েছে আরো গভীরে, জীন এর অংশ সিস্ট্রন রেকন মিউটন এর পরিচিতির মাধ্যমে।

জীন সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এখন তার পরিচয় আরো বিস্তৃত হল। যেমন ধরা যাক যে একটি জীন আমরা জানি যে অতি দ্রুত হারে স্থান বিনিময়ে সক্ষম—আবার এও জানি যে ঐ জীনটি মৃদুহারে আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সক্ষম—আবার এও জানি যে ঐ জীনটিই

একটি উল্লেখ যোগ্য জৈব রসায়ন সৃষ্টি করে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। এখন এই তিনটি কাজ যে একই অঞ্চল থেকে হচ্ছে তা নয়। বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন কাজের জন্য দায়ী।

জীন সম্পর্কে ধারনার এই বিস্তৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। বিজ্ঞানীরা এখন বিভিন্ন কাজকর্মে জীনের নিয়ন্ত্রণ যে কিভাবে কাজ করছে, কোথায় করছে এবং কেন করছে তার অনুসন্ধানের পথে এগিয়ে চলেছেন। নূতন থেকে নূতন তম তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে জীন এবং তার বিভিন্ন অংশের কাজকর্ম এক সুশৃঙ্খল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

জীন কিভাবে কাজ করে তার সম্বন্ধে সবচেয়ে আধুনিক ধারণা যা এখন গড়ে উঠেছে তা হল অপেরন (Operon) পদ্ধতি। জীব কোষের বিভিন্ন উপাদান তৈরী করা জীনের একটি প্রধান কাজ এ তথ্য আমরা জানি। প্রোটিন এবং এনজাইম তৈরী করাও কতকগুলি জীনের কাজ এবং প্রোটিন ও এনজাইম (Proteins and Enzymes) জীবকোষের পক্ষে শুধু অপরিহার্য্যই নয় তার প্রধানতম অংশও।

কতকগুলি জীনের কাজ হল একধরনের রাইবোজ নিউক্লিক এসিড তৈরী করা (Messenger R. N. A.) যা সাহায্য করে বিভিন্ন এমাইনো এসিডের (Amino acid) সম্মিলনে প্রোটিন তৈরী হতে। ঐ বিশেষ ধরনের রাইবোজ নিউক্লিক এসিড জীন থেকে বয়ে আনে কি ধরনের প্রোটিন তৈরী করা প্রয়োজন তার সাংকেতিক নির্দেশ। এদের বলা হয় মেসেঞ্জার আর এন এ (Messenger R. N. A.) বা সংকেত পরিবাহি রাইবোজ নিউক্লিক এসিড।

ক্রমোসোমের ডেসক্সিরাইবোজ নিউক্লিক এসিড শৃঙ্খলের কোন কোন বিশেষ অংশ থেকেই শুধু এই মেসেঞ্জার আর এন এ তৈরী হতে দেখা যায়। ঐ বিশেষ অংশগুলিকে বলা হয় ষ্ট্রাকচারাল জীন (Structural gene) বা কর্মী জীন। এই কর্মী জীনগুলি এদের খুব কাছেরই কোন অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রক জীন (Operator gene) বা অপারেটর জীন।

একটি অপারেটর জীন তার কাছাকাছি আছে এমন অনেকগুলি কর্মী জীনকে নিয়ন্ত্রিত করে। অপারেটর জীনের প্রভাব দুরকম। অপারেটর

জীন সক্রিয় থাকলে তার প্রভাবে কর্ম্মী জীনেরা এনজাইম তৈরী করে যাবে অবিশ্রান্ত ভাবে। অপারেটর জীন যে মুহূর্ত্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবে কর্ম্মী জীন এর সব কাজ বন্ধ হবে তার কর্ম্মচঞ্চলতা। অপারেটর জীন এর সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রিত হয় আর একটি জীনের প্রভাবে যাকে বলা হয় রেগুলেটর (Regulator) বা নিয়ামক জীন। রেগুলেটর জীন অপারেটর জীনকে নিষ্ক্রিয় রাখতে পারে আবার সক্রিয় করে তুলতে পারে। অপারেটর জীন ও তার নিয়ন্ত্রনে যে ষ্ট্রাকচারাল জীন বা কর্ম্মী জীন থাকে তাদের এক সঙ্গে অপেরন বলা হয়। প্রত্যেক রেগুলেটর জীন একটি অপেরন (Operon) এর নিয়ামক।

রেগুলেটর জীন অপারেটর জীনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাসায়নিক সংশ্লেষের মাধ্যমে। রেগুলেটর জীন একটি বড় আকারের (Macromolecule) জৈব রসায়ণ তৈরী করে যাকে বলা হয় এ্যাপোরিপ্রেসর (Aporepressor) বা নিয়ামক রসায়ন।

এই এ্যাপোরিপ্রেসর কাজ করে দুভাবে। প্রথমতঃ এর একটি প্রকৃতি হল যে অপারেটর জীন এর দেহে সন্নিবদ্ধ হবার প্রতি এর একটা বড় আকর্ষণ আছে। যদি তা সম্ভব হয় তবে এ্যাপোরিপ্রেসরের সম্মিলনে অপারেটর জীন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার নিয়ন্ত্রণের ষ্ট্রাকচারাল জীনগুলির কাজকর্ম্ম সব বন্ধ হয়ে যায়। এনজাইম তৈরী বন্ধ থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এই এ্যাপোরিপ্রেসর জীবপঙ্কে উপস্থিত কিছু ছোট আকারের রসায়ণের প্রতিও আকৃষ্ট হয়। এদের সঙ্গে মিলন আবার দুই প্রকৃতির।

(এক) অ্যাপোরিপ্রেসর যে ছোট রসায়ণগুলির সঙ্গে মিলিত হয় তাদের ইনডিউসার (Inducer) বলা হয়। এদের সঙ্গে মিলনে এ্যাপোরিপ্রেসর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে অপারেটর জীন সক্রীয় থাকায় কর্ম্মী জীনেরা এনজাইম তৈরী করে চলে অবিরাম গতিতে।

(দুই) এ্যাপোরিপ্রেসরের প্রতি আকৃষ্ট আর এক প্রকৃতির ছোট রসায়নকে বলা হয় রিপ্রেসর (Repressor)। রিপ্রেসর এবং এ্যাপোরিপ্রেসর একত্রিত হয়ে অপারেটর জীনএর সঙ্গে সন্নিবদ্ধ হলে অপারেটর জীন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। রিপ্রেসর এর অনুপস্থিতিতে এ্যাপোরিপ্রেসর এর কোন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না ফলে অপারেটর জীন সক্রিয় থাকার এনজাইম তৈরী চলতে থাকে বিরামহীন ভাবে।

রিপ্রেসর এর উপস্থিতিতে এ্যাপোরিপ্রেসর কর্ম্মক্ষম এবং তখন এ্যাপোরিপ্রেসর রিপ্রেসরের সঙ্গে একত্র হয়ে অপারেটর জীনএর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয় এবং তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে।
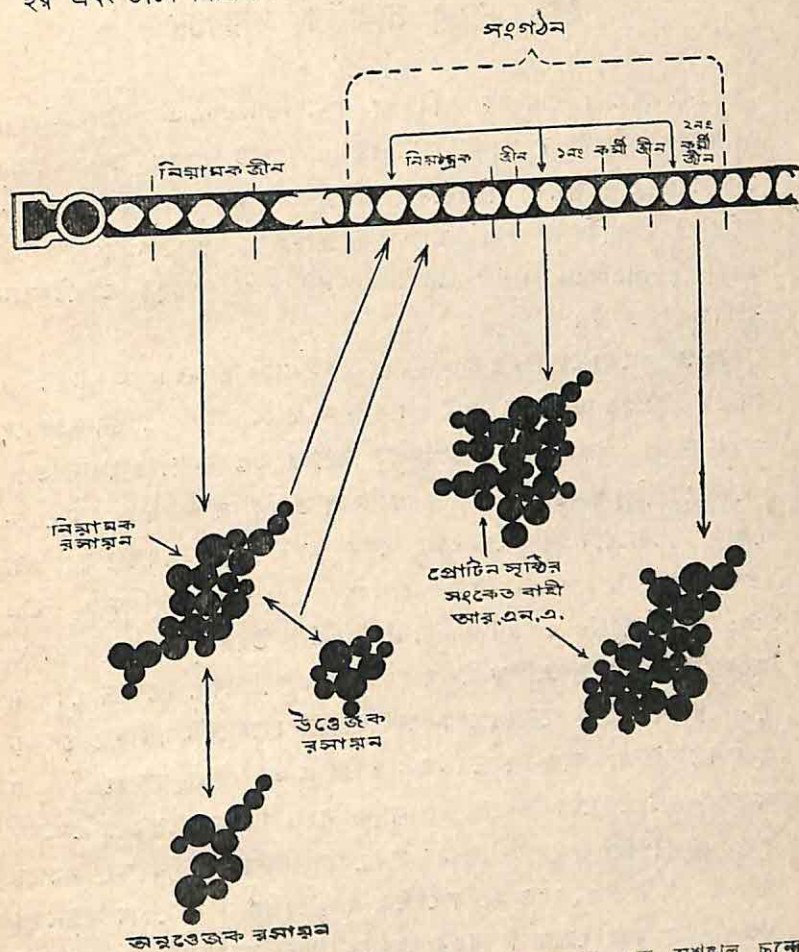
প্রোটিন ও এনজাইম সৃষ্টি জীবকোষের অভ্যন্তরে এক সুশৃঙ্খল ছন্দে নিয়ন্ত্রিত হয় কিছু জীন এবং কয়েকটি রসায়ণের সাহায্যে অপেরণ পদ্ধতিতে।

ক্রমোসোমের সামগ্রিক পরিবর্ত্তন

ক্রমোসোমের সামগ্রিক পরিবর্ত্তন (Chromosomal abberation) আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলেই (Mutation) ঘটে থাকে। ক্রম বিবর্ত্তনে ক্রমোসোমের সামগ্রিক পরিবর্ত্তনের ভূমিকাও উল্লেখ যোগ্য। প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক গতিতে ক্রমোসোমের দৈহিক গঠনের হঠাৎ যে পরিবর্ত্তন হয় (Spontaneus structural change) জীব জগতের ক্রমবিবর্ত্তনে সহায়ক সেইগুলিই।

ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্য প্রস্থ সব সময় যে একই থাকে তা নয়। একই দেহের বিভিন্ন কোষেও তারতম্য হয়। স্বাভাবিক ভাবে এই পরিবর্ত্তন হওয়া যে সম্ভব তা নয়। ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয়ের জন্য আমাদের পদ্ধতি ও যে একেবারে নির্ভুল তাও নয়। সমস্ত প্রজাতিতেই পাওয়া যায় কোন কোন কোষে ক্রমোসোম আকারে বড়। কেন এমন হয়? ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ভর করে দেহতত্ত্বের বিভিন্ন অবস্থায় দেহকোষের ভূমিকায় (On the Physiologic condition of the cell) উপর। কিন্তু যদি আমরা ক্রমোসোমগুলির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করি দেখা যাবে যে সেখানে কোন পরিবর্ত্তন নেই। দেহের কোন কোষে একটি ক্রমোসোম যদি পাঁচ গুণ বড় হয়ে থাকে তাহলে অন্য ক্রমোসোমগুলিও ঠিক ঐ একই হারে বড় হবে। এর কারণ একটি কোষের আভ্যন্তরিণ অবস্থা সবগুলি ক্রমোসোমের ক্ষেত্রেই সমান প্রভাবশালী। দেহের কোন কোন কোষ বিভক্ত হয় খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে কোন কোষ হয়ত অনেক বেশী সময় নিয়ে প্রস্তুত হয় কোষ বিভাগের জন্য। এর ফলে কোষ বিভাজন যেখানে দ্রুত ক্রমোসোমগুলি সেখানে স্প্রীংএর মত জড়িয়ে গিয়ে (Spiralization) ছোট হবার জন্য বেশী সময় পেলনা ফলে আকারে কিছু বড় রয়ে গেল। কোষ বিভাজন যেখানে বিলম্বিত সেখানে ক্রমোসোমগুলি স্প্রীংএর মত জড়াল অনেকক্ষণ ধরে এবং আকারে ছোট ও মোটা হল। অবশ্য এই ধরণের পরিবর্ত্তনগুলি স্থায়ী নয়, সাময়িক।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে ক্রমোসোমের এই স্প্রীংএর মত

জড়িয়ে যাবার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রীত হয় এক বা একাধিক জীনএর প্রভাবে। একটি উদ্ভিদের (*Methiala ineana*) একই প্রজাতির দুই ধারায় (**Race**) দেখা যায় একটিতে ক্রমোসোমগুলি বড় অন্যটিতে ক্রমোসোম গুলি ছোট। এই দুই ধারার প্রজননের ফলে যে প্রথম মিশ্র বংশ আসে সেখানে দেখা যায় যে পূর্ব্বপুরুষদের একজনের মত এরা প্রত্যেকে ছোট ক্রমোসোম বহন করছে। এর কারণ এখানে ছোট ক্রমোসোম এই চরিত্রটি প্রবল (**Dominant**) এবং বড় ক্রমোসোম এই চরিত্রটি দুর্ব্বল (**Recessive**) প্রকৃতির। এখানে দৈর্ঘ্যের তারতম্য দেহতত্ত্বের ভেদে সাময়িক পরিবর্ত্তন নয়, জীনের নিয়ন্ত্রণে স্থায়ি পরিবর্ত্তন। দ্বিতীয় মিশ্র বংশে দেখা যায় ৩ : ১ অনুপাত আসছে। অর্থাৎ প্রতি চারটিতে মাত্র একটির ক্রমোসোমগুলি বড় অন্য তিনটির ছোট। এই উদাহরণ দিয়ে ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্যের তারতম্য যে স্থায়ি কোন পরিবর্ত্তন হতে পারে এবং জীনের নিয়ন্ত্রণে বংশধারাশ্রয়ী হতে পারে ১৯২৭ সালে মান এবং ফ্রস্ত (**Mann & Frost 1927**) সে কথা প্রমাণ করেছেন।

ক্রমোসোমের দৈর্ঘের তারতম্য, কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্ব্বের সময়সীমা ইত্যাদি জীনের নিয়ন্ত্রণের উপরও যে নির্ভর করে এ-তথ্য-আমরা এখানে পেলাম। কিন্তু এগুলি বংশধারানুক্রমের নিয়মের কারনে **Genetical cause**) ঘটছে। প্রকৃত অর্থে এগুলিকে ক্রমোসোমের দেহে বিকৃতি (**Chromosomal ableration**) বলা চলেনা।

গোল্ডস্মিডট জিপসীমথের দেহে (**Goldschmidt in Lymantria dispar**) দেখেছিলেন একই প্রজাতির বিভিন্ন ধারায় **(in different races)** ক্রমোসোমের দৈর্ঘ্যের তারতম্য আছে। এখানে অবশ্য বিশ্লেষণ আগের মত সহজ ছিলনা কারন এখানে কয়েকটি জীনের একত্রিত প্রভাবে এই তারতম্য নিয়ন্ত্রিত ছিল। এমনি দুই ধারার মধ্যে প্রজননে প্রথম মিশ্রবংশে ক্রমোসোম-গুলি দেখা গেল মাঝারি আকারের হয়।

পরবর্ত্তী বংশে অর্থাৎ দ্বিতীয় মিশ্রবংশে দেখা গেল বৈচিত্রের সংখ্যা অনেক বেশী। এই বৈচিত্রগুলি দেখাগেল বহু পদার্থের একত্রিত প্রভাবের ফলে সৃষ্ট এবং সেই পদার্থগুলির (**Genes**) উপস্থিতির সংখ্যার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন বৈচিত্র সৃষ্টি হয়। অবশ্য এখানে ক্রমোসোমের সাধারণ দৈর্ঘ্যের মধ্যে তারতম্য হয় আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য (**Relative length**) সব সময়ই একই থাকে।

এর পরে আমরা ক্রমোসোমের পরিবর্ত্তনের মূল তথ্যে যেতে পারি বিবর্ত্তন বাদের জন্য যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ক্রমোসোমের পরিবর্ত্তনকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে ভাগ করা যায় যেমন

(১) ক্রমোসোম সংখ্যার পরিবর্ত্তন।

(ক) একক অবস্থা (Haploidy)—যখন ক্রমোসোম সংখ্যা স্বাভাবিক জোড় সংখ্যার অর্দ্ধেক হয়ে যায় এবং প্রত্যেক জোড়ার একটি নিয়ে থাকে তখন একক অবস্থা বলা হয়।

ক্রমোসোম একক অবস্থায় আছে এমন প্রাণীর সংখ্যা বিরল। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় যেমন উদাহরণ হিসাবে আমরা পুরুষ মৌমাছির কথা উল্লেখ করতে পারি। কোন কোন পতঙ্গে একটা বিশেষ সময়ে (Seasonal) হয়ত সবগুলিই একক অবস্থার ক্রমোসোম বহন করছে আবার কোন কোন সময়ে হয়ত সবগুলিই জোড় সংখ্যার (Diploid) ক্রমোসোম নিয়ে জন্মাচ্ছে। জোড় সংখ্যায় যতগুলি ক্রমোসোম আছে তার অর্দ্ধেক থাকলেই যে একক অবস্থা হল তা নয় প্রতি জোড়ার একটি করে ক্রমোসোম অবশ্যই থাকবে একথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। প্রতি জোড়ার একটি করে না থেকে যদি শুধুমাত্র সংখ্যায় অর্দ্ধেক ক্রমোসোম থাকে তাহলে আমরা একক অবস্থা বলতে পারিনা।

মৌমাছিদের জীবনে ক্রমোসোমের একক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। একক অবস্থা এখানে লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করে। একক অবস্থায় ক্রমোসোম থাকলে সেগুলি পুরুষ প্রাণীতে পরিণত হয়।

একক অবস্থার উদ্ভব হয় অনিষিক্ত ডিম্ব কোষ (Unfertilized ovum) থেকে। যে সব ডিম্ব কোষ শুক্রকোষের সঙ্গে মিলিত না হয়ে নিজেরাই বিভাজনের ফলে বহু কোষের সমষ্টি সৃষ্টি করে প্রাণী দেহ গঠন করে সেই সব ডিম্ব কোষ থেকেও প্রাণী সৃষ্টি হয়। এই ধরণের প্রজননকে একক প্রজণন (Parthenogenesis) বলা হয়।

একক প্রজননের ফলে সৃষ্টি প্রাণীদের দেহে ক্রমোসোমগুলি সাধারণতঃ একক অবস্থায় থাকে। অবশ্য একক প্রজনন (Parthenogenesis) হয় দুই প্রকৃতির।

একক প্রজননের ফলে সৃষ্ট প্রাণীদের ক্রমোসোম একক সংখ্যায় :—

ডিম্বকোষ যদি শুক্রকোষের সঙ্গে মিলিত না হয় তাহলে প্রত্যেক

ক্রমোসোমই সঙ্গী বিহীন অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় যদি স্বাভাবিক ভাবে কোষ বিভাজন হয় তাহলে প্রত্যেক কোষেই ক্রমোসোম সংখ্যা একক অবস্থায় থাকবে।
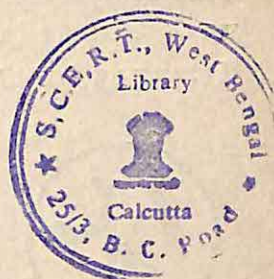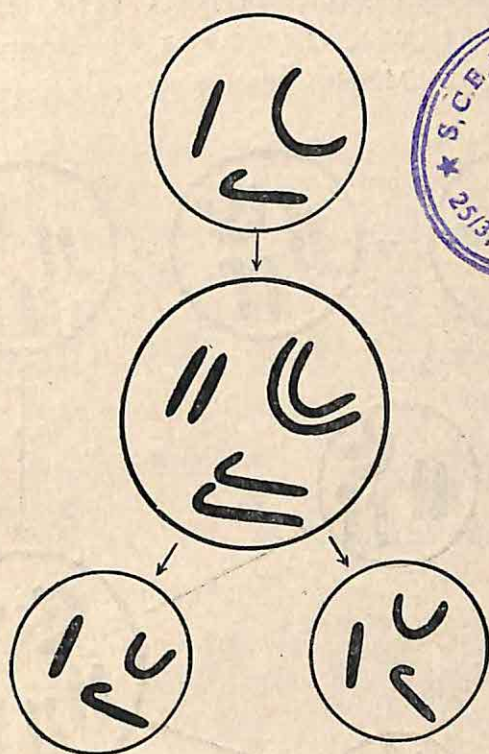
মৌমাছিদের জীবনে অনিষিক্ত ডিম্বকোষ থেকে সৃষ্ট প্রাণীগুলির দেহে প্রত্যেক কোষেই ক্রমোসোম থাকে একক অবস্থায় এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে সেগুলি পুরুষ প্রাণীতে পরিণত হয়।

একক প্রজননের ফলে সৃষ্ট প্রাণীদের ক্রমোসোম জোড় সংখ্যায় :—

ডিম্বকোষে ক্রমোসোম থাকে একক অবস্থায়। একক প্রজননে সৃষ্ট প্রাণীদের ক্রমোসোম একক সংখ্যায় হওয়াই স্বাভাবিক।

জোড় সংখ্যায় কি করে হবে?

এখানে হয় কি ডিম্বকোষ অনিষিক্ত অবস্থায় অর্থাৎ শুক্রকোষের সঙ্গে মিলিত না হয়ে নিজেই যখন প্রজননের পথে এগিয়ে চলে তখন আকস্মিক

কোন কারণে প্রথম কোষ বিভাজন স্থগিত থাকে। এর পর স্বাভাবিক ভাবে কোষ বিভাজন হতে থাকে। প্রথম কোষ বিভাজন স্থগিত থাকার ফলে (Failure of first clevage) কোষ বিভাজনের প্রস্তুতিতে ক্রমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে যাবার পর সেগুলি পৃথক হয়ে কোষ বিভাজন হলনা। অতএব ক্রমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে রইল। এর পরে দেহকোষ বিভাজনের পদ্ধতিতে (Mitosis) স্বাভাবিক ভাবে কোষ বিভাজন হয়।
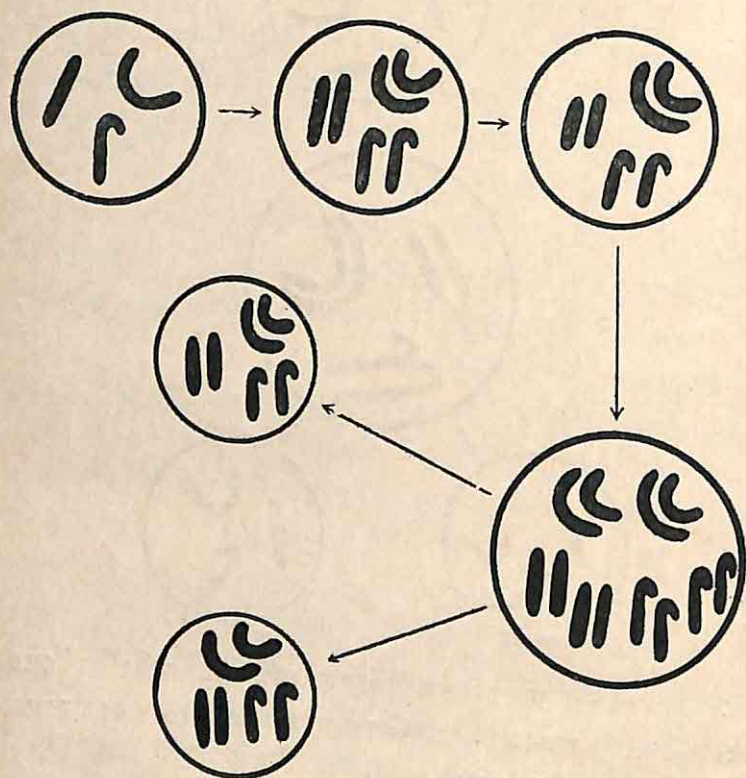
এখানে আরম্ভ হল একক অবস্থার ক্রমোসোম নিয়ে কিন্তু পরবর্তী পর্যায় সৃষ্টি করল জোড় সংখ্যার ক্রমোসোম বহনকারী জীবকোষ। যদি প্রথম কোষ বিভাজন (First clevage) স্থগিত না হয়ে পরবর্তী পর্য্যায়ে কোন একটি কোষ বিভাজন স্থগিত হয় তাহলে প্রাণীদেহে দুই শ্রেণীর কোষ থাকে এক শ্রেণীতে ক্রমোসোম একক অবস্থায় অন্য শ্রেণীতে ক্রমোসোম জোড় সংখ্যায়। তবে একক ক্রমোসোম বহনকারী কোষগুলি জোড় সংখ্যার ক্রমোসোম

বহনকারী কোষগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে না এবং সংখ্যায় নগণ্য হয়ে পড়ে।

(খ) বহুগুনিতার (Poliploidy) প্রভাব :—

ক্রমোসোমের মূল সংখ্যার (অর্থাৎ একক সংখ্যার) তিনগুণ চারগুণ অথবা আরো বেশী বৃদ্ধি হতে পারে। এই অবস্থাকে বহুগুণিতা বলা হয়। উদ্ভিদ জগতে এর উদাহরণের সংখ্যা বেশী এবং উদ্ভিদের ক্রমবিবর্তনে এর সহায়তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

বহুগুণিতা দুরকমের হতে পারে —

(১) অসমস্তর :—ভিন্ন প্রজাতির সঙ্কর শ্রেণীতে যে বহুগুণিতার সৃষ্টি হয় সেগুলিকে অসমস্তর বহুগুণিতা (allopoliploidy) বলা যেতে পারে।

(২) সমস্তর :—একই প্রজাতির মধ্যে যে বহুগুণিতার সৃষ্টি হয়। সেগুলিকে সমস্তর বহুগুণিতা (autopoliploidy) বলা যেতে পারে।

সমস্তর বহুগুণিতা :—যদি কোন ডিম্বকোষে কোষ বিভাজন আকস্মিকভাবে স্থগিত হয় তাহলে ক্রমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে জোড় সংখ্যায় (2n Condition) পরিণত হবে। এই অবস্থায় যদি কোন শুক্র কোষ এসে মিলিত হয় পরবর্তী পর্যায়ের কোষগুলিতে প্রত্যেক ক্রমোসোম তিনটি করে থাকবে। অর্থাৎ ত্রিগুণিতা (Triploidy) দেখা দেবে। যদি ঐ শুক্র কোষটিও কোষ বিভাজন স্থগিত থাকার ফলে জোড় সংখ্যার ক্রমোসোম বহন করে এবং জোড় সংখ্যার ক্রমোসোম বহনকারী ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে পরবর্তী পর্য্যায়ে প্রত্যেক কোষে প্রতিটি ক্রমোসোম থাকবে চারটে করে। এখানে দেখাযাচ্ছে চতুর্গুণিতা (Tetraploidy or 4 n Condition) এবং তা হচ্ছে একই প্রজাতির মধ্যে।

আকস্মিক পরিবর্ত্তনের প্রভাবে (mutation) ক্রমোসোম সংখ্যা পাঁচগুন ছয়গুণ বা আরো বেশী হ'তে পারে।

ক্রমোসোম সংখ্যা এইভাবে পরিবর্ত্তন হওয়ার ফলে এদের প্রজনন সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ এরা নূতন ধারার সৃষ্টি করল। এদের উদ্ভব যে প্রজাতির থেকে তাদের সঙ্গে এদের প্রজনন এখন সম্ভব নয়। যেখানে ক্রমোসোমগুলি তিন গুণ বা পাঁচ গুণ হয়েছে সেখানেও স্বাভাবিক যৌন প্রজননের জন্য ডিম্বকোষ বা শুক্রকোষ সৃষ্টি সম্ভব নয়। একমাত্র উপায় অযৌন প্রজনন (Vegetative reproduction) যা সম্ভব শুধু উদ্ভিদে।

অসমস্তর বহুগুনিতা :—

অসমস্তর বহুগুনিতা (allopolyploydy) দেখা যায় ভিন্ন প্রজাতির সঙ্কর প্রাণী ও উদ্ভিদে। ভিন্ন প্রজাতির সঙ্কর দেহের কোষগুলি দুই শ্রেণীর ক্রমোসোম একক অবস্থায় পেয়ে থাকে। এই দুই শ্রেণীর ক্রমোসোম দুই প্রজাতির এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের, সেই জন্য এরা জোড়া বাঁধতে (failure of pairing) পারে না। জোড়া বাধতে না পারার জন্য এদের দেহে যৌন কোষ সৃষ্টি সম্ভব নয়। দেহ কোষ বিভাগ সম্ভব কারন সেখানে ক্রমোসোম সংখ্যা কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্ব্বে দ্বিগুনিত হচ্ছে। এই কারনে প্রাণীজগতে ভিন্ন প্রজাতির সঙ্কর যদি বা কোথাও সম্ভব হয় সঙ্কর শ্রেণীর প্রাণীগুলির বন্ধাত্ব অবস্যম্ভাবী। উদ্ভিদ জগতে অযৌন প্রজননের মাধ্যমে ভিন্ন প্রজাতির সঙ্কর শ্রেণী স্থায়ী হতে পা.র। এই ধরনের কোন সঙ্কর শ্রেণীতে যদি আকস্মিক কোন পরিবর্ত্তনের প্রভাবে (mutation) —ক্রমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় অর্থাৎ একক (haploid) সংখ্যার চারগুণ, সেগুলিকে অসমস্তর চতুর্গুনিতা (allotetraploidy) বলা হয়। সমস্তর বহুগুনিতার তুলনায় অসমস্তর বহুগুনিতার বিবর্ত্তন বাদের প্রয়োজনে উপযোগীতা বেশী।

অতএব ভিন্ন প্রজাতির সঙ্করের দেহে ক্রমোসোম সংখ্যার যদি আকস্মিক কোন কারণে বৃদ্ধি হয় এবং প্রতিটি ক্রমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি একই হারে হয়, ক্রমোসোমের সেই সংখ্যা বৃদ্ধিকে অসমস্তর বহুগুনিতা বলা যেতে পারে।

যদি ভিন্ন প্রজাতির সঙ্কর বংশধারা প্রসারে সচেষ্ট হয় তাহলে কি হবে? যৌন প্রজননের জন্য যৌন কোষ উৎপাদন করা প্রয়োজন কিন্তু তা হবে না কারন ক্রমোসোমগুলির কোনটারই সঙ্গী নেই, তারা একক অবস্থায়। ফলে অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে।

কোষ বিভাজনের সময়ে মেরু প্রান্তের কোনদিকে কোন ক্রমোসোমটি যাবে তার কোন স্থিরতা নেই। অতএব অস্বাভাবিকতা দেখা দেবেই। যদি দৈবাৎ কোন ভাবে একই প্রজাতির ক্রমোসোমগুলি এক এক প্রান্তে এল অর্থাৎ মাতৃ বংশ পিতৃবংশের মত যৌন কোষ উৎপাদন হল, সেগুলির নিষিক্ত করনের ক্ষমতা (Capacity for fartilization) থাকবেনা। অতএব বংশধারা প্রসার সম্ভব হবে না। প্রাণী জগতে তাই ভিন্ন প্রজাতির সঙ্কর বন্ধ্যা প্রকৃতির।

উদ্ভিদ অযৌন প্রজননে (Vegetative Reproduction) বংশরক্ষায় সক্ষম হবে। দীর্ঘকাল অযৌন প্রজননের পরে কোন স্তরে কোষ বিভাজন প্রস্তুতি পর্ব্বের শেষে আকস্মিক ভাবে স্থগিত হয়ে গিয়ে ক্রমোসোমগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জোড়সংখ্যায় রূপান্তর হবার সম্ভাবনা থাকে। এবং তখন
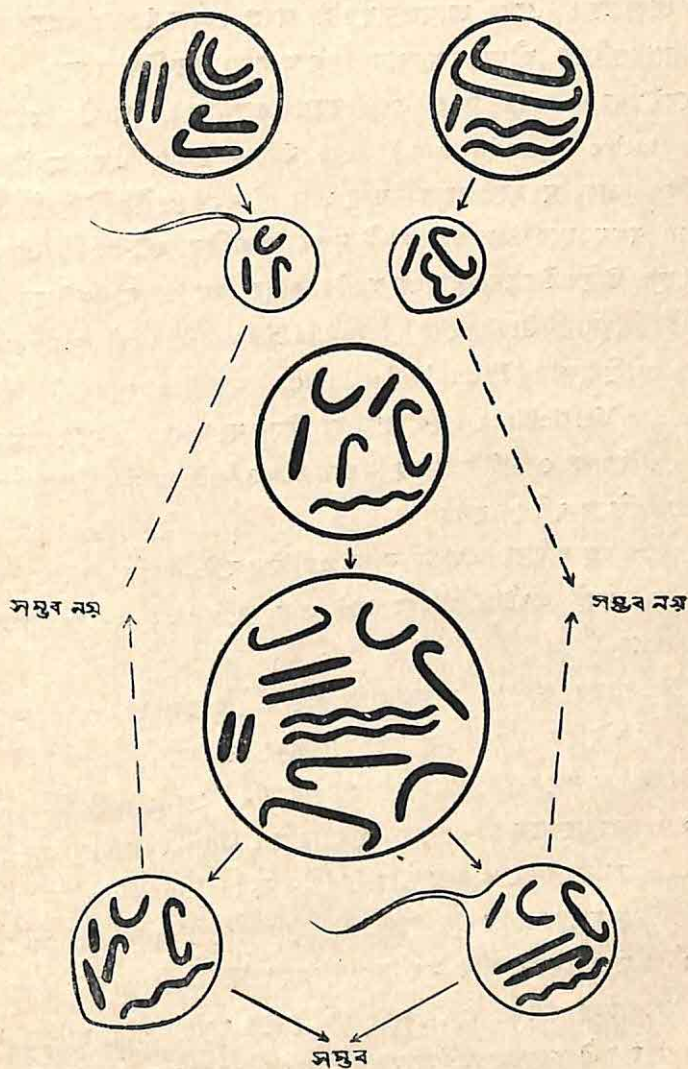
সেইটি যৌন প্রজননে সক্ষম হয়ে ওঠে, এবং স্বাভাবিক ভাবে যৌন কোষ উৎপাদনে সক্ষম হয়।

এই ধরণের এক বিচিত্র উদাহরণের আমরা উল্লেখ করতে পারি যা ঘটেছিল লণ্ডনে 'কিউ' গার্ডেনে। ১৯২৯ সালে নিউটন এবং পেলিউ দেখলেন (**Newton & Pellew 1929**) যে দুইটি উদ্ভিদের সঙ্কর প্রিমূলা ভার্টিসিলাটা এবং প্রিমূলা ফ্লোরিবান্দার মিশ্রনে সৃষ্ট একটি উদ্ভিদ স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ্যা প্রকৃতির। এদের ক্রমোসোমগুলি অবশ্য জোড়া বাঁধতে পারে কারণ ক্রমোসোমগুলিতে জীনের অবস্থান কিছু আলাদা প্রকৃতির হলেও পার্থক্য খুব বেশী নয়। অথচ তাও এরা বন্ধ্যা প্রকৃতির। অযৌন প্রজননই (**Vegetative reproduetion**) এদের বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায়। আকস্মিক ভাবে অসমস্তর চতুগুনিতার ফলে এই সঙ্কর শ্রেণীর উদ্ভিদটি যৌন প্রজননে সক্ষম হয়ে উঠল এবং একটি নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হল। এর নাম দেওয়া হল উদ্ভিদ উদ্যানের নামকে স্মরণীয় করার জন্য প্রিমূলা কিউয়েনসিস।

এই প্রিমূলা কিউয়েনসিসের (**Primula Kewensis**) যৌনকোষের সঙ্গে প্রিমূলা ফ্লোরিবান্দার (**Primula floribunda**) অথবা প্রিমূলা ভার্টিসিলাটার (**Primula Verticillata**) যৌনকোষের মিলন সম্ভব নয়। কিউয়েনসিসের উদ্ভব ফ্লোরিবান্দা ও ভার্টিসিলাটার মিশ্রনে হলেও কিউয়েনসিস একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রজাতিতে পরিণত হল।

অসমস্তর বহু গুনিতা এখানে নূতন প্রজাতির সৃষ্টি করছে। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবেই এঘটনা প্রায়শঃ ঘটে এবং উদ্ভিদে এই ধরণের উদাহরণ অসংখ্য আছে।

ক্রমোসোমের সংখ্যার পরিবর্ত্তনের প্রভাব বিশ্লেষণের পরে আমরা ক্রমোসোমের দৈহিক পরিবর্ত্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করব।

এই পর্য্যায়ে আসে (১) ক্রমোসোমের অঙ্গহানি (**Deliton**),

(২) ক্রমোসোমে জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তি (**Duplication**)

(৩) ক্রমোসোমে জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম (**Inver:ion**)

(৪) ক্রমোসোমের কোন অঙ্গের স্থান বিনিময় (**Translocation**)

(৫) ক্রমোসোমে জীন সংখ্যার পূর্ব্ব ক্রম (**Restitution**)

ক্রমোসোমের দেহের কোন অংশ যদি ভেঙ্গে যাবার পরে হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় ঐ ক্রমোসোমটি আকারে কিছু ছোট হয়ে যায়। এই ঘটনাকে বলা হয় অঙ্গহানি। ব্রীজেস ১৯১৭ সালে এবং মোহর ১৯২৩ সালে এই তথ্য (**Bridges 1917, Mohr 1923**) আবিষ্কার করেন।

যদি একই জোড়ার একটি ক্রমোসোম এইভাবে অঙ্গহানি হবার ফলে আকারে ছোট হয়,—বলা হয় অসমাঙ্গ প্রকৃতির (Heterozygoustype) অঙ্গহানি।

যদি একই জোড়ার দুইটি ক্রমোসোমই এইভাবে অঙ্গহানি হবার ফলে আকারে ছোট হয়, বলা হয় সমাঙ্গ প্রকৃতির (Homozygoustype)—অঙ্গহানি।

ক্রমোসোমের অঙ্গহানি ঘটেছে এমন প্রাণীর জীবন ধারণ সম্ভব কি? এ প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় কিছু বলা সম্ভব নয়।

ক্রমোসোমের অঙ্গহানি ঘটেছে এমন প্রাণীরা কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন ধারণে সক্ষম আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সক্ষম নয়। সমাঙ্গ প্রকৃতির অঙ্গহানি ঘটলে সাধারণতঃ বাঁচেনা কারণ সেখানে বেশ কিছু জীন একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অসমাঙ্গ প্রকৃতির অঙ্গহানি ঘটলে বাঁচার সম্ভাবনা থাকে কারণ হারিয়ে যাওয়া জীনগুলির একটি করে সেখানে আছে।

ড্রসোফিলা পতঙ্গে প্রায়শঃই একটি পরিবর্তন (Mutation) দেখা যায় যার ফলে ড্রসোফিলা পতঙ্গের ডানার প্রান্তদেশে খাঁজকাটা একটি গভীর অংশ (Notch) দেখা যায়। এই চরিত্রটি লিঙ্গাশ্রয়ী এবং প্রবল (Sex build dominant) প্রকৃতির। সেই জন্য স্ত্রী পতঙ্গে সঙ্কর শ্রেণীতেও এই চরিত্রটি দেখা যায়। পুরুষ পতঙ্গ এই চরিত্র নিয়ে জন্মালে কখনই বাঁচে না। ডানার খাঁজকাটা অংশটি ক্রমোসোমের অঙ্গহানির ফলে হয়ে থাকে। ড্রসোফিলা পতঙ্গের এক্স ক্রমোসোম বা যৌন ক্রমোসোমের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ বিনষ্ট হবার ফলে এই চরিত্রের উদ্ভব। লালাগ্রন্থি ক্রমোসোমের বিশাল দেহে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা সম্ভব সাধারণ কোষে তা সম্ভব হয় নি।

যেখানে অসমাঙ্গ শ্রেণীর অঙ্গহানি হয় সেখানে অসম জোড়ার ক্রমোসোম জোড়া বাধবার সময়ে পূর্ণাঙ্গ ক্রমোসোমে একটি লুপ (Loop) বা ফাঁসের মত আকৃতি সৃষ্টি হয় কারন জোডা বাধবার সময়ে একই প্রকৃতির জীন পাশাপাশি আসে অন্য জীনগুলি সরে যায়।

ক্রমোসোমের অঙ্গহানির ফলে যদি ঘন ক্রোমটিন অংশের একটা টুকরো হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় অথবা যে অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে তা যদি আকারে খুবই ছোট হয় যেখানে একটি কিম্বা দুট অল্প প্রয়োজনে জীন ছিল সেখানে এই সমাঙ্গ শ্রেণীর অঙ্গহানি ঘটলেও বাঁচার সম্ভাবনা থাকে।

জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তি :—

আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে (**Mutation**) ক্রমোসোমের দেহে জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তি প্রায়শঃই হয়ে থাকে।
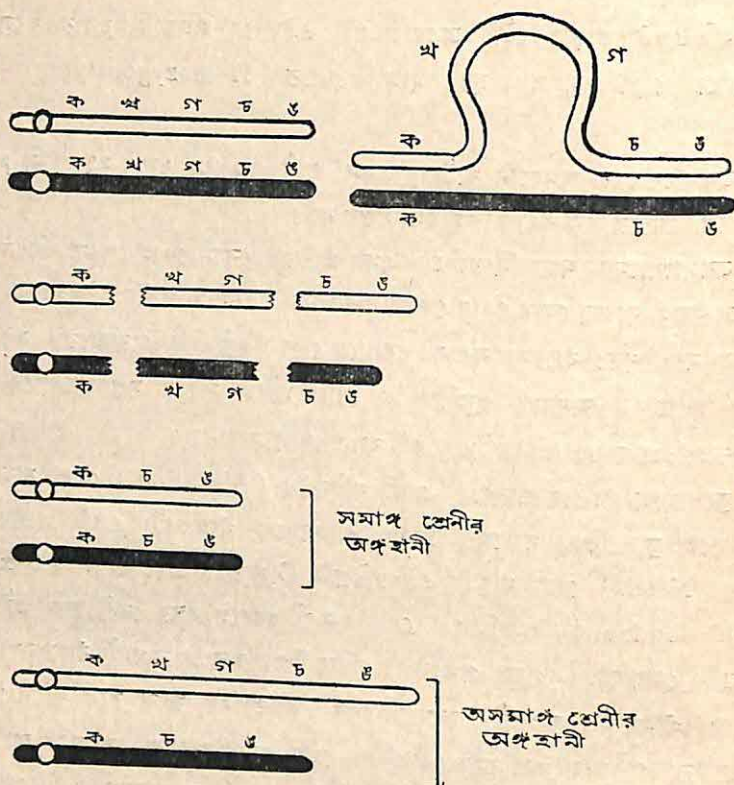
ক্রনোসোমের দেহে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত জীনগুলির মধ্যে কোন এক বা একাধিক জীনের একাধিকবার উপস্থিতিকে জীন সংখ্যার পুনরাবৃতি বলা হয়।

জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তিও দুই শ্রেণীর

(১) অসমাঙ্গ প্রকৃতির ও (২) সমাঙ্গ প্রকৃতির।

একই জোড়ার দুইটি ক্রমোসোমের মধ্যে একটি ক্রমোসোমের জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তি হলে অসমাঙ্গ প্রকৃতির (**Heterozygous**) পুনরাবৃত্তি বলা হয়।

একই জোড়ার দুইটি ক্রমোসোমের মধ্যে একই জীনের এবং সমান সংখ্যক

জীনের পুনরাবৃত্তি যদি দুইটি ক্রমোসোমেই থাকে সেখানে সমাঙ্গ প্রকৃতির (Homozygous) পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলা হয়।
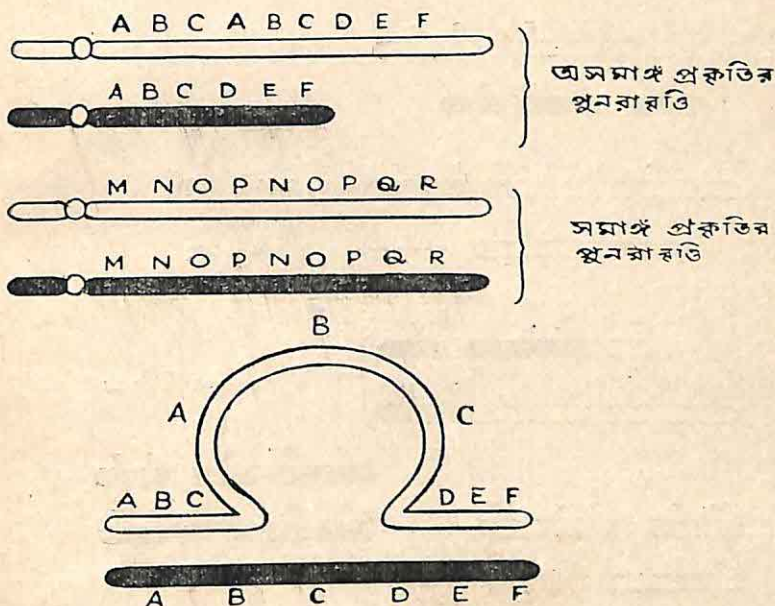
ব্রীজেস ১৯১৯ সালে (Bridges 1919) ড্রসোফিলা পতঙ্গে প্রথম আবিষ্কার করেন জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তি। ক্রমোসোমের অঙ্গহানির মত জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তি অতটা ক্ষতিকর নয়। দেখা যায় যে সাধারণত যেখানে বেশ কয়েকটি জীনের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সেখানে প্রাণীগুলি বেঁচে আছে। জীনের পুনরাবৃত্তি ঘটলে দৈহিক চরিত্রের বহু বৈচিত্রের অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। অসমাঙ্গ প্রকৃতির পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রেও অসমাঙ্গ প্রকৃতির অঙ্গহানির মত ক্রমোসোম জোড়া বাধবার সময় লুপ বা ফাঁসের মত (Loop or Buckle) আকৃতি হয়। জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তির ফলে এক বা একাধিক জীন যখন দুই বা তার বেশী সংখ্যায় উপস্থিত থাকে তখন স্বাভাবিক ভাবেই জীনের প্রভাবের সামগ্রিক সমতা ব্যহত হয়।

ক্রমোসোমের কোন অঙ্গের স্থান বিনিময় :—

একই প্রকৃতির নয় এমন দুই ক্রমোসোমের (non-homologus) দেহের কোন অংশ ভেঙ্গে গেলে যদি একটি ক্রমোসোমের দেহের কোন অংশ অন্য

ক্রমোসোমের সঙ্গে জুড়ে যায় এবং তার জায়গায় সেই ক্রমোসোমের ভাঙ্গা অংশটি আসে তাহলে আমরা বলতে পারি ক্রমোসোমের কোন অংশের স্থানবিনিময় (translocation) ঘটেছে
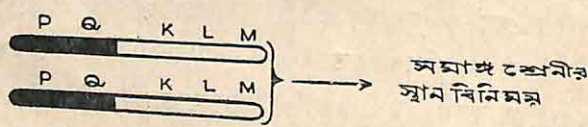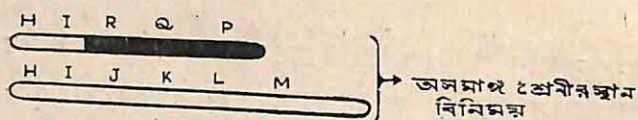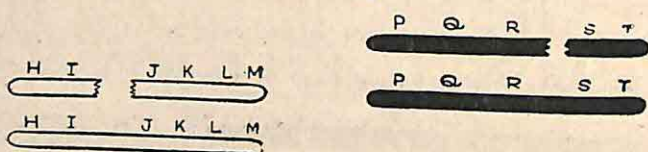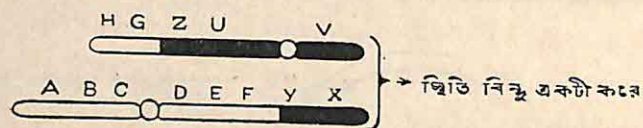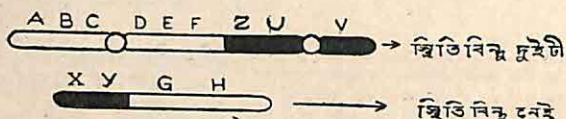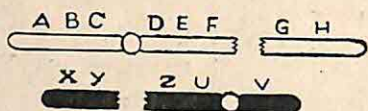
ভিন্ন প্রকৃতির ক্রমোসোমের কোন অঙ্গের স্থান বিনিময় হয়েও জীনের সমতা যখন নষ্ট হয় না তখন সমাঙ্গ শ্রেণীর স্থান বিনিময় বলা হয়।

ভিন্ন প্রকৃতির ক্রমোসোমের (Non-homologus) কোন অঙ্গের স্থান বিনিময় হলে জীনের সমতা যখন নষ্ট হয় তখন অসমাঙ্গ শ্রেণীর স্থানবিনিময় বলা হয়।

ক্রমোসোমের কোন অঙ্গের স্থান বিনিময়ের ফলে কোন ক্রমোসোম স্থিতি বিন্দু বিহীন হতে পারে, কোন ক্রমোসোম একাধিক স্থিতি বিন্দু সহ হতে পারে অথবা কখনও স্বাভাবিক একটি স্থিতি বিন্দু সহ হতে পারে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জীনের বিশেষ কোন স্থানে অবস্থানের প্রভাব (Position effect) গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটলে সেই জীনের প্রভাবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আসে।

স্থান বিনিময় আবিষ্কার করেন ব্রীজেস ১৯২৩ সালে (Bridges 1923) ড্রসোফিলা পতঙ্গে।

দেখা গেছে যদি কোন প্রাণী তার পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের যে কোন এক দিক থেকে একটি ক্রমোসোম পায় যার কোন অংশের স্থান বিনিময় ঘটেছে এবং আর একদিক থেকে পায় স্বাভাবিক ক্রমোসোম, তাহলে সেই প্রাণীর দেহে ক্রমোসোম জোড়া বাধবে (Pairing) এক বিশেষ ক্রশ আকৃতি গ্রহণ করে।

কোষ বিভাজনের পরবর্ত্তী স্তরে এইগুলি একটি বলয়াকৃতি অথবা দুইটি বলয়াকৃতি গ্রহণ করে।

ক্রমোসোমের কোন অংশের স্থান বিনিময়ের প্রভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজনন ব্যহত হতে পারে। স্থান বিনিময়ের প্রভাব আংশিক বন্ধাত্ব সৃষ্টি করে। আংশিক বন্ধাত্ব জনসংখ্যার প্রকৃতি পরিবর্ত্তণ করে বিবর্তন বাদের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তণ আনতে পারে।

জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম :—

ক্রমোসোমের কোন অংশ দুবার ভাঙ্গার ফলে একটা টুকরো যদি আলাদা হয়ে গিয়ে ১৮০° ঘুরে সেই ক্রমোসোমেই উল্টোভাবে জুড়ে যায় তাহলে জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম হয়ে থাকে।

জীন সংখ্যার এই বিপরীত ক্রম দুই ভাবে হতে পারে (১) কেন্দ্রিক (Pericentric) (২) বিকেন্দ্রিক (Paracentric)

বিপরীত ক্রমের প্রস্তুতিতে ক্রমোসোমের দুই অংশে ভাঙ্গন দেখা যায়। যদি ঐ ভাঙ্গন দুইটি স্থিতিবিন্দুর দুই পাশে হয় অর্থাৎ যে অংশটি বিপরীত ক্রম নেবে তা যদি স্তিতিবিন্দু সহ হয় তাহলে আমরা বলব কেন্দ্রিক প্রকৃতির।

বিপরীত ক্রমের প্রস্তুতিতে ক্রমোসোমের দুইটি ভাঙ্গনই যদি স্থিতিবিন্দুর একপাশে হয় এবং যে অংশটি বিপরীত ক্রম নেবে তাযদি স্থিতিবিন্দু ছাড়া হয়
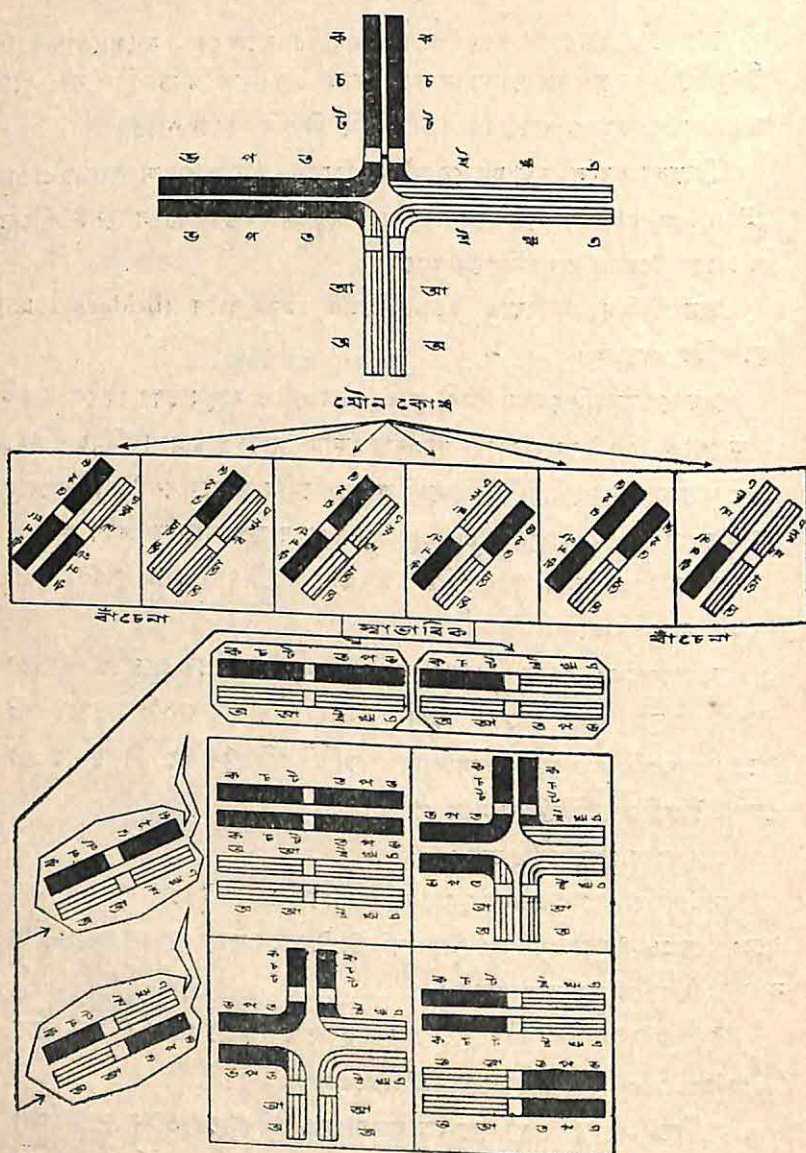
তাহলে আমরা বলব বিপরীত ক্রম এখানে বিকেন্দ্রিক প্রকৃতির। এই দুই প্রকৃতির বিপরীত ক্রমের প্রভাব যৌন কোষ বিভাগের সময় দুই রকম দেখা

যায়। কেন্দ্রিক প্রকৃতির বিপরীত ক্রম থেকে ক্রমোসোমের অঙ্গহানি এবং জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তি (Deficiency & Duplication) দেখা দেয়। বিকেন্দ্রিক প্রকৃতির বিপরীত ক্রম থেকে ক্রমোসোমেরা ব্রীজ্ বা সেতুর আকার গ্রহণ করে।
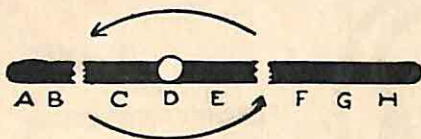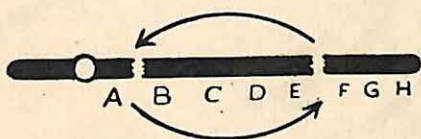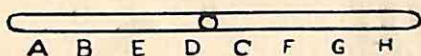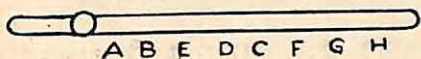
১৯২৬ সালে স্টার্টেভাণ্ট (Sturte vant 1926) প্রথম আবিষ্কার করেন বিপরীত ক্রমের তথ্য ড্রসোফিলা পতঙ্গে।

বিপরীত ক্রমের ফলে ক্রমোসোম যখন জোড়াবাধে তখন তা স্বাভাবিক ভাবে হতে পারে না কারণ তখন জীনগুলির পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কেন্দ্রিক প্রকৃতির বিপরীত ক্রমের ফল স্বরূপ জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তি ও ক্রমোসোমের অঙ্গহানির ফলে যৌন প্রজনন ব্যহত হয়। প্রথমতঃ যৌন কোষের মিলন ক্ষমতা নষ্ট হয় দ্বিতীয়তঃ যৌন কোষের মিলন ঘটলেও তার ফলে সৃষ্ট জীবের প্রাণশক্তি থাকে না।

বিকেন্দ্রিক প্রকৃতির বিপরীত ক্রমের ক্রমোসোম যখন লুপ বা ফাঁসের মত আকৃতি সৃষ্টি করে জোড়া বাধে, সেই অবস্থায় যদি আবার ক্রমোসোমের কোন একটি অংশ ভেঙ্গে অন্য ক্রমোসোমের কোন অংশের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটি বন্ধনী (Chiasmata) সৃষ্টিকরে তাহলে একটি ক্রোমাটিড এমন হয় যার কোন স্থিতিবিন্দু থাকে না। একটি ক্রোমাটিডে থাকে জীন সংখ্যার স্বাভাবিক ক্রম নিয়ে। অন্য দুটি ক্রোমাটিডে জীনগুলি থাকে বিপরীত ক্রমে এদের

একটিতে স্থিতিবিন্দু থাকে তুইটি। যৌন কোষ বিভাগের প্রথম বিভাগের অন্ত অবস্থায় (Ist meotic Anaphase) এই চারটি ক্রোমাটিড ব্রীজ বা সেতুর আকার (Inverssion bridge) সৃষ্টি করে।
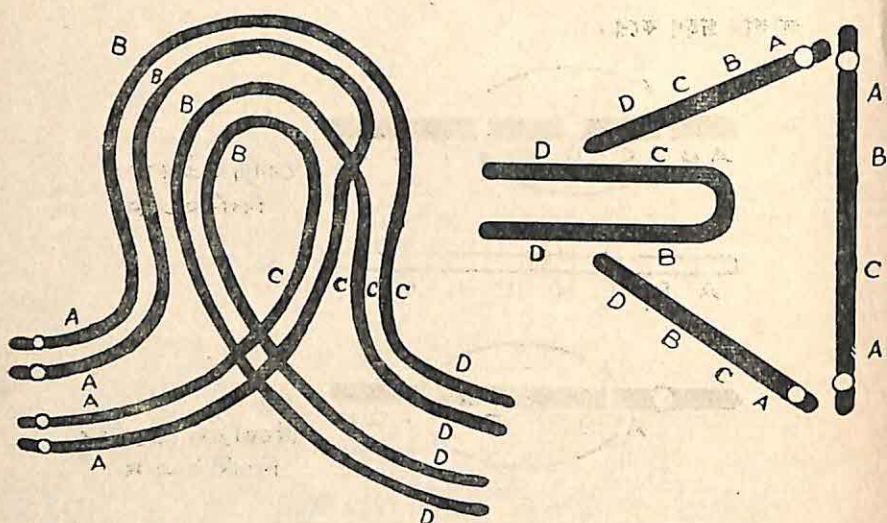
কেন্দ্রিক প্রকৃতির বিপরীত ক্রমে ক্রমোসোমগুলি যখন লুপ বা ফাঁসের আকারে জোড়া বাঁধে সেই সময়ে কোথাও একটি ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে কোন তুই ক্রোমাটিডের মধ্যে একটি বন্ধনী সৃষ্টি করলে দেখাযায় যে যৌন কোষ বিভাগের প্রথম অন্তঅবস্থায় জীন সংখ্যার পুনরাবৃত্তি ও ক্রমোসোমের অঙ্গহানি (Duplication & Deficiency) হয়। অবশ্য ক্রমোসোমের যে অংশটি বিপরীত ক্রম নিয়েছে সেই অংশের মধ্যে যদি বন্ধনী (chiasmata) সৃষ্টি হয় তাহলেই এই অবস্থা হবে অন্যথায় ক্রোমাটিড গুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। অবশ্য ক্রমোসোমেরা সেতুর আকার গ্রহণ করলেই যে সেখানে বিপরীত ক্রম হয়ে থাকবে তা নয়। সাধারণভাবে ক্রমোসোমে ভাঙ্গা গড়া ও বন্ধনী সৃষ্টির ফলেও সেতুর আকার হয়।

ক্রমোসোমের এই সমস্ত অস্বাভাবিকতার ফলে জীবনী শক্তি কমে যায় একথা সত্য হলেও বিবর্ত্তণবাদের ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিকতা গুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

কাইরোনোমাস পতঙ্গে (Chironomous sp.) প্রকৃতিতে স্বাভাবিক জনসংখ্যায় ক্রমোসোমের বিপরীত ক্রম পাওয়া যায়। স্টার্টেভাণ্ট এবং

ডবজানস্কি (sturtevant & Dobzhansky) এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন পরে বহু গবেষক ডবজানস্কির তত্বাবধানে এই বিষয়ে গবেষণা করেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক জনসংখ্যায় ড্রসোফিলা উইলিস্টনিতে (D. Willistoni) জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম খুব বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায়। কিন্তু ড্রসোফিলা সিউডবস্কিউরা এবং ড্রসোফিলা পারসিমিলিস এ (D. Pseudoob scura & D. Persimilies—এই দুইটি এখন ভিন্ন প্রজাতি বলা হয় আগে একই প্রজাতির দুই বৈচিত্র বা Race বলা হত।) জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রমের সংখ্যা কম। এই পতঙ্গের আর একটি প্রজাতি ড্রসোফিলা এলগনকুইনে (D. Algonquin) প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক জন সংখ্যায় জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম পাওয়া যায় না।
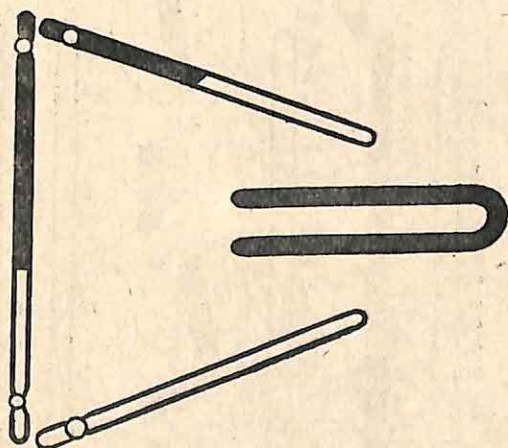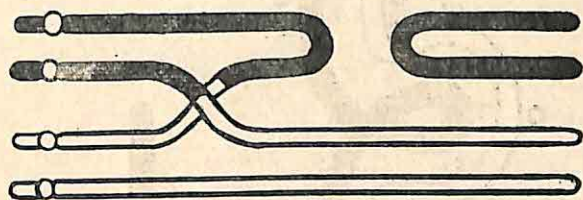
অতএব ড্রসোফিলা পতঙ্গেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে
কোন কোন প্রজাতিতে বিপরীত ক্রমের উদাহরণ খুব বেশী
" " " " " " খুব কম
" " " " " " একটিও নেই

একই ক্রমোসোমের দুই জায়গায় বিপরীত ক্রম (**Inverssion**) দেখা যেতে পারে। যদি একটি আর একটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয় তাহলে সেগুলিকে স্বাধীন বৈপরীত্য (**Independent Inverssion**) বলা হয়। যদি একটি বড়
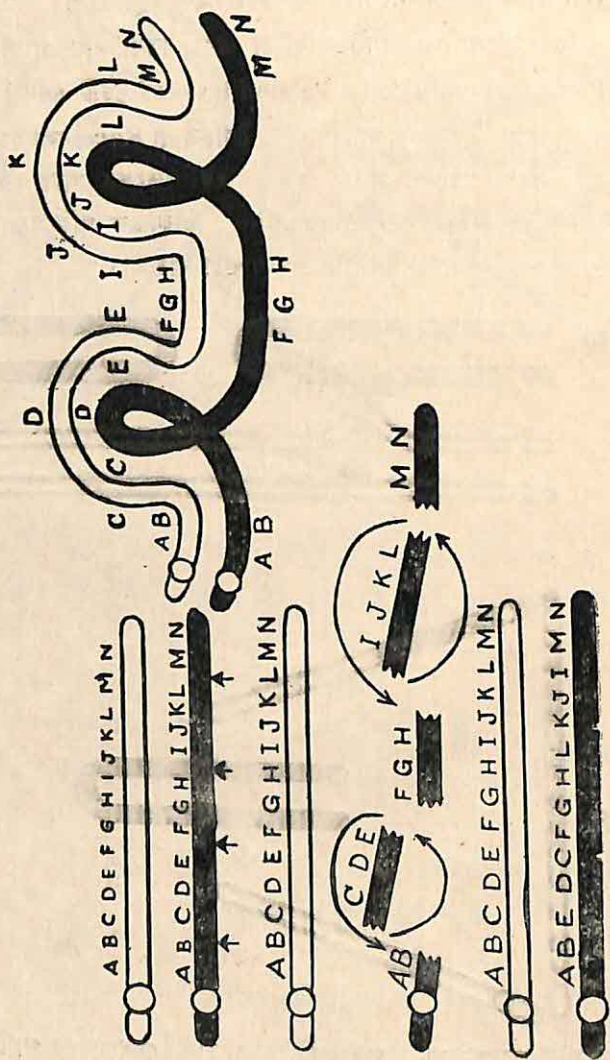
অংশের বিপরীত ক্রমের মধ্যে একটি ছোট অংশের বিপরীত ক্রম দেখা যায় তাহলে বলা হয় অন্তবর্তী (**Included Inverssion**) বিপরীত ক্রম।
প্রথমে একটি অংশের বিপরীত ক্রমের পরে আর একটি বিপরীত ক্রম যদি হয়

এবং এই দ্বিতীয়টির একটি অংশ আগেরটির মধ্যে ও এক অংশ বাইরে থাকে তাহলে উপস্থাপিত বৈপরীত্য (Overlaping inverssion) বলা হয়।
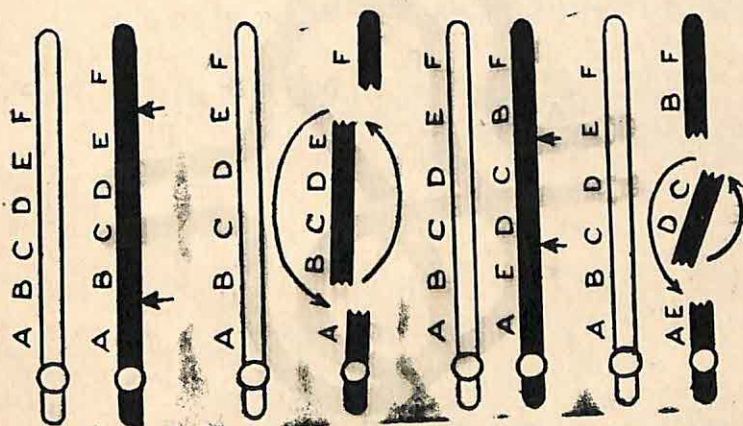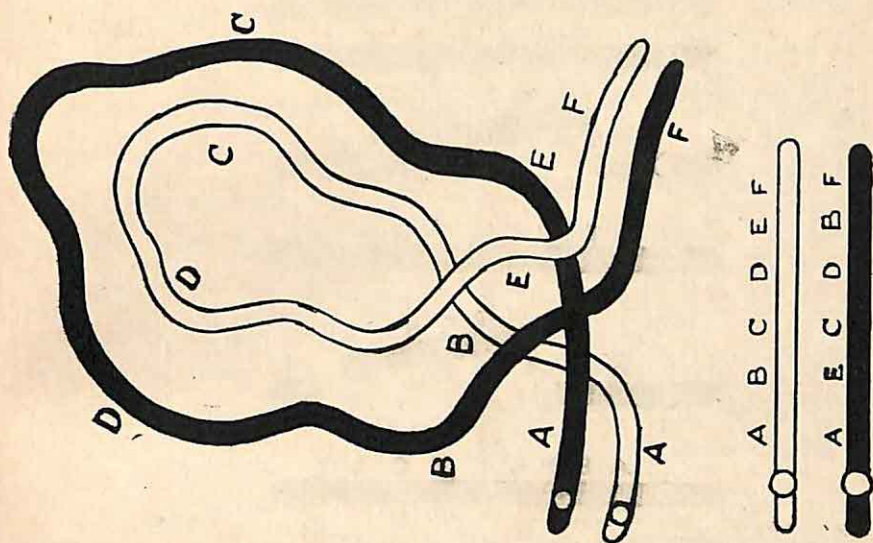
প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক জনসংখ্যায় যেখানে আমরা ক্রমোসোমে জীন সংখ্যার বিপরীত ক্রম দেখতে পাই সেখানে আমরা ক্রমোসোমের এই পরিবর্ত্তন কিভাবে এল তার একটা হিসাব (**Phylogenetic Chart**) তৈরী করতে পারি। (৫) ক্রমোসোমে জীন সংখ্যার অপরিবর্ত্তীত পুর্ব্বক্রম (**Restitution**)

কখনও এমন হয় যে ক্রমোসোমের কোন অংশ ভেঙ্গে যাবার ফলে একটি
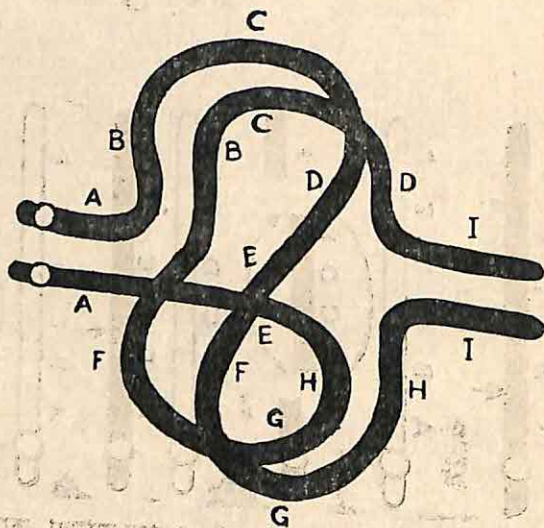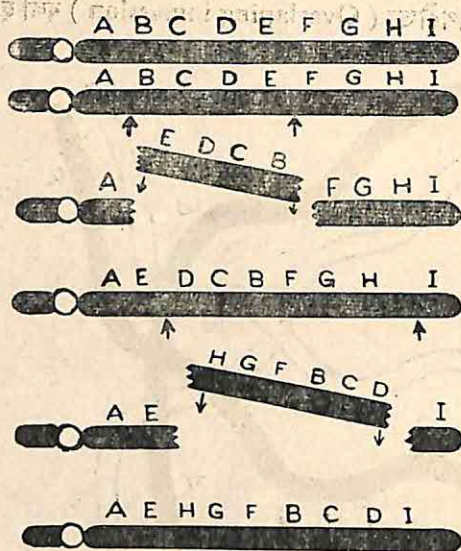
অংশ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেলেও ক্রমোসোমের সেই ভাঙ্গা অংশ দুটি জুড়ে গিয়ে

আবার আগের মত হয়ে যায় এবং জীন সংখ্যার পূর্ব্বক্রম অপরিবর্ত্তীত থাকে এই অবস্থাকে অপরিবর্ত্তীত পূর্ব্বক্রম (Restitution) বলা হয়।

ড্রসোফিলা সিউডবস্কিউরা (D. Pseudoobscura) এবং ড্রসোফিল এজ্‌টেকা (D. Azteca) প্রজাতির মধ্যে জীনের পারম্পরিক ক্রমের আগে জানা ছিল না এমন অবস্থান সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন স্টার্টেভাণ্ট এবং ডবজানস্কী (Sturtevant 1938 Dobzhansky 1941) যা পরে আবিষ্কার হয়। এই ভবিষ্যৎবাণী করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ক্রমোসোমে জীন সংখ্যার উপস্থাপিত বৈপরীত্যের (Overlaping inverssion) অনুশীলনের ফলে।

স্টার্টেভাণ্ট এবং ডবজানস্কী উত্তর এবং মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ড্রসোফিলা পতঙ্গ সংগ্রহ করে তাদের লালাগ্রন্থি ক্রমোসোম পরীক্ষা করেন। ঐ ক্রমোসোমে জীনের বিপরীত ক্রমের বিভিন্ন পর্য্যায় এবং কিভাবে তাদের উদ্ভব হতে পারে তার অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁরা বংশধারাক্রমে রূপান্তরের একটি তালিকা (Phylogenetic Chart) তৈরী করেন।

জীনের বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে তাঁরা বিভিন্ন নামকরণ করেন। ডবজানস্কী এবং সোকোলোভ ১৯৩৯ সালে (Dobzhansky & Socolov 1939) ড্রসোফিলা পতঙ্গের এজটেকা প্রজাতিতে (D. Azteca) যে সমীক্ষা করেন তাহল এই
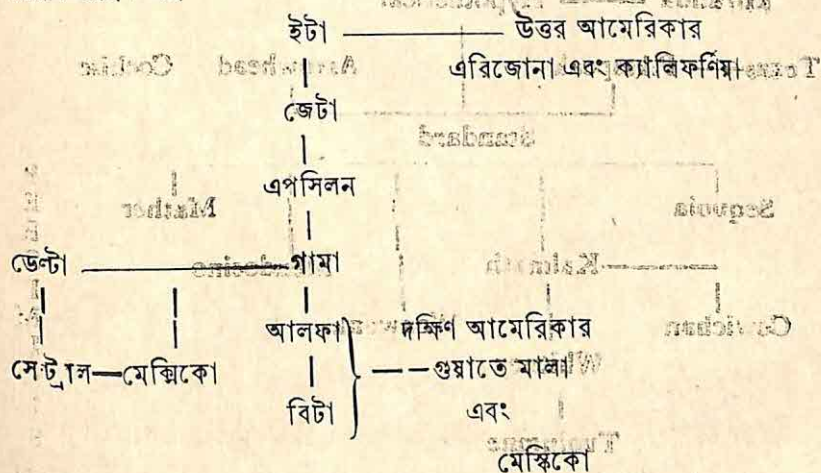
এই নামগুলি (Eta, Zeta, Epsilon etc) দেওয়া হয় এক নির্দিষ্ট প্রকৃতির বিপরীত ক্রমে জীন সংখ্যার ক্রম গুলিকে। বিটা থেকে গামা, উদ্ভব

হতে পারেনা যদিনা মাঝে আলফা হয়। এপসিলনের পর যখন 'ইটা' আবিষ্কার হল ডবজানস্কী তখন বললেন যে এর মাঝা মাঝি একটা নিশ্চয় আছে যার নাম দেওয়া হোক 'জেটা'। পরে তা আবিষ্কার হল এবং ডবজানস্কীর ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হল।

এদের মধ্যে কোনটার উদ্ভব হয়েছে আগে ইটা না বিটা অথবা গামা সেকথা বলা কঠিন। প্রজাতির উৎপত্তি যদি মধ্য আমেরিকায় হয়ে থাকে তাহলে গামা এবং ডেল্টা সবচেয়ে প্রাচীন যদি উত্তরে করে থাকে তাহলে ইটা সবচেয়ে প্রাচীন।
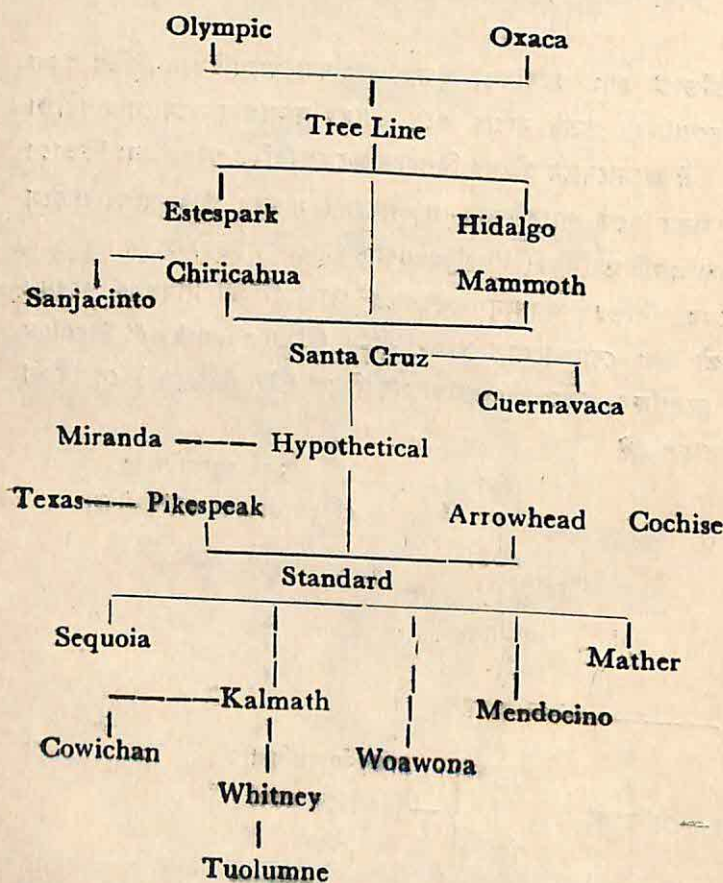
ডবজানস্কী এবং স্টার্টেভান্ট ও এপলিং (Dobzhansky & Sturtevant 1938, Dobzhansky & Epling 1944) ড্রসোফিলা পতঙ্গের দুই ভিন্ন

প্রজাতি সিউডুবস্কুরা এবং পারসিমিলিসে (**D. Pseudoobscura & D. Persimilis**) বিশদ সমীক্ষা করেন। এই দুই প্রজাতির ক্রমোসোমে জীনের বিভিন্ন ক্রমের মিশ্রণ দেখা যায়। এদের পাঁচ জোড়া ক্রমোসোমের তৃতীয় জোড়ায় জীন সংখ্যার ক্রম বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তীত হয়। জীন সংখ্যার এই ক্রম গুলির একটি যার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্ট্যাণ্ডার্ড', তা দুই প্রজাতিতেই পাওয়া যায়। এই সব গুলিই একটার আর একটা থেকে উদ্ভব হয়েছে ক্রমোসোমের কোননা কোন অংশের জীন সংখ্যার বৈপরিত্যের মাধ্যমে।

ক্রম বিবর্ত্তনের বিশ্লেষণে জীন সংখ্যার উপস্থাপিত বৈপরিত্য (**Over laping inversion**) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করে। হয়ত কোথাও দেখা গেল জীন গুলি আছে (১) ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ এবং (২) ক ঙ ঘ গ খ চ ছ জ ঝ এবং (৩) ক ঙ জ ছ চ খ গ ঘ ঝ এই ভাবে সাজান। এর প্রথমট থেকে দ্বিতীয়টার উদ্ভব হতে পারে একটিমাত্র অংশের বিপরীত ক্রম হয়ে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়টাও আসতে পারে সেইভাবে। কিন্তু প্রথমটার থেকে তৃতীয়টার উদ্ভব হতে পারেনা। কাজেই কোথাও প্রথমটা এবং তৃতীয়টা পাওয়া গেলে এর মাঝে একটা আছে এবং কি রকম ক্রম অনুসারে আছে তা বলে দেওয়া যেতে পারে।

বংশধারা ও ক্রমবিবর্তন

বিবর্তনবাদের সঙ্গে বংশধারার সম্বন্ধ কি ? আমরা বলতে পারি যে বংশ-ধারা নিয়ন্ত্রণকারী জীনগুলির আনুপাতিক হারের পরিবর্তন বিবর্তন বাদের সহায়ক। সহজ কথায় পর পর কয়েক পুরুষ ধরে কোন বংশধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কোন জীন এর শতকরা হারের অনুপাত কমে যাচ্ছে এবং অন্য কোন জীন এর শতকরা হারের অনুপাত সেইমত বেড়ে যাচ্ছে। যেমন ধরা যাক কোন একটি জীন এর আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে আর একটি জীন এর সৃষ্টি হয়েছে। এখন যদি এমন হয় যে প্রাকৃতিক পরিবেশ এই পরিবর্তীত জীনটির পক্ষে অনুকূল (অর্থাৎ যদি প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাবে এই জীনটির বিস্তার হয়) তাহলে দেখা যাবে যে মূল উৎস সেই অপরিবর্তীত জীনটির সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। সময়ের সীমা রেখায় এইভাবে জীন এর অনুপাতের পরিবর্তণ যত দ্রুত হারে হবে, ক্রম বিবর্তন ও হবে সেই হারে দ্রুত। কিন্তু এই গতি নিয়ন্ত্রণ হয় কি ভাবে ? এই গতি নিয়ন্ত্রণের মূল নিয়ামক হল জীন এর গঠনে আকস্মিক পরিবর্তনের (Possibility of Mutation) সম্ভাব্যতা। যদি এই আকস্মিক পরিবর্তন প্রায়শঃই হবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে জীন এর অনুপাতের দ্রুত পরিবর্তন হবে।

কোন বৃহৎ জনসংখ্যায় স্ত্রী পুরুষের মিলনে যদি কোন বাধা না থাকে (Mating at random) এবং জীনের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটার কোন সম্ভাবনা না থাকে তাহলে বংশধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পুরুষানুক্রমে জীন এর অনুপাতের কোন পরিবর্তনই ঐ বৃহৎ জনসংখ্যায় হচ্ছে না। যদি জীন এর অনুপাতের পরিবর্তন না হয় তাহলে ক্রম বিবর্তন হবে না।

মনেকরা যাক কোন এক বৃহৎ জনসংখ্যায় জীন A এবং তার পরিবর্তীত রূপ a জীন বিভিন্ন অনুপাতে রয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে ঐ জনসংখ্যায় তিন রকম প্রাণী দেখা যাবে যাদের প্রকৃতি হবে যথাক্রমে AA, Aa, এবং aa শ্রেণীর।

ধরা যাক বিভিন্ন অনুপাত ছিল

AA শ্রেণীর প্রাণী ৩৬% Aa শ্রেণীর প্রাণী ৪৮% aa শ্রেণীর প্রাণী ১৬% হিসাবে।

এর পর আমরা মেনে নিলাম তিনটি সর্ত্ত।

১) এদের মধ্যে যৌন মিলনে কোন বাধা নেই (Ranbom mating)

২) জীনগুলির আর কোন পরিবর্ত্তন (Mutation) হচ্ছে না।

৩) প্রত্যেক প্রাণীই সমান সংখ্যায় যৌনকোষ (Gamets) সৃষ্টি করছে।

এখন দেখা যেতে পারে যে এই তিনটি সর্ত্ত মেনে নিলে ঐ জনসংখ্যায় এই বিভিন্ন বৈচিত্রের প্রাণীদের শতকরা হারের কোন পরিবর্ত্তন ভবিষ্যৎ বংশধারায় হচ্ছে কিনা।

AA জীন বহনকারী প্রাণীদের সংখ্যা শতকরা ৩৬টি অতএব সবশুদ্ধ যতগুলি যৌনকোষ তৈরী হচ্ছে তার শতকরা ৩৬টিতে থাকবে A জীন একক অবস্থায়।

aa জীন বহনকারী প্রাণীদের সংখ্যা শত করা ১৬টি মাত্র। অতএব সবশুদ্ধ যতগুলি যৌনকোষ তৈরী হচ্ছে তার শতকরা ১৬টিতে থাকবে a জীন একক অবস্থায়।

Aa জীন বহনকারী প্রাণীদের সংখ্যা শতকরা ৪৮টি। এদের যৌনকোষ হবে দুরকম, এক রকম A জীন বহন করবে আর এক রকম a জীন বহন করবে। যদি ঐ দুরকম যৌনকোষই সমান সংখ্যায় হয় তাহলে মোট যৌনকোষের শতকরা ২৪টিতে থাকবে A জীন একক অবস্থায় এবং শতকরা ২৪টিতে থাকবে a জীন একক অবস্থায়।

৩৬% AA শ্রেণীর প্রাণী—৩৬/১০০ A জীনবাহী যৌনকোষ
৪৮% Aa শ্রেণীর প্রাণী— { ২৪/১০০ A জীনবাহী যৌনকোষ } A জীনবাহী যৌনকোষ শত-করা ৬০টি
{ ২৪/১০০ a জীনবাহী যৌনকোষ
১৬%aa শ্রেণীর প্রাণী—১৬/১০০ a জানবাহী যৌনকোষ } aজীনবাহী যৌনকোষ শতকরা ৪০টি।

যৌনকোষগুলির মিলন কিভাবে হতে পারে ?

(১) A জীনবাহী শুক্রকোষ A জীনবাহী ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

(২) a জীনবাহী শুক্রকোষ a জীনবাহী ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

(৩) A জীনবাহী শুক্রকোষ a জীনবাহী ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

(৪) a জীনবাহী শুক্রকোষ A জীনবাহী ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

A জীনবাহী শুক্রকোষ A জীনবাহী ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হবে $\frac{৬০}{১০০} \times \frac{৬০}{১০০} = \frac{৩৬}{১০০}$ অনুপাতে, অর্থাৎ AA শ্রেণীর প্রাণী হবে ৩৬%

a জীনবাহী শুক্রকোষ a জীনবাহী ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হবে $\frac{৪০}{১০০} \times \frac{৪০}{১০০} = \frac{১৬}{১০০}$ অনুপাতে, অর্থাৎ aa শ্রেণীর প্রাণী হবে ১৬%

A জীনবাহী শুক্রকোষ a জীন বাহী ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হবে $\frac{৬০}{১০০} \times \frac{৪০}{১০০} = \frac{২৪}{১০০}$ অনুপাতে অর্থাৎ Aa শ্রেণীর প্রাণী হবে ২৪%

a জীনবাহী শুক্রকোষ A জীনবাহী ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হবে $\frac{৪০}{১০০} \times \frac{৬০}{১০০} = \frac{২৪}{১০০}$ অনুপাতে অর্থাৎ Aa শ্রেণীর প্রাণী হবে ২৪%

অতএব Aa শ্রেণীর প্রাণীর মোট সংখ্যা ৪৮%

দেখা যাচ্ছে ১০০ জনের মধ্যে AA শ্রেণীর প্রাণী ৩৬টি aa শ্রেণীর প্রাণী ১৬টি এবং Aa শ্রেণীর প্রাণী ৪৮টি হচ্ছে পরবর্তী বংশেও। প্রথমে শতকরা হার ছিল ঠিক এই একই হারে এবং এখনও তার কোন পরিবর্ত্তন হলনা।

জন সংখ্যা যত বড়ই হোকনা কেন এবং জীন সংখ্যা যত জোড়াই একসঙ্গে ধরা হোকনা কেন এই একই ফল পাওয়া যাবে। তবে কয়েকটি সর্ত্ত মেনে নিতে হবে যেমন

(১) যৌনমিলন যেমন খুশী (**Mating at random**) হতে পারে।

(২) জীন এর আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সংখ্যা একেবারেই নেই।

(৩) জন সংখ্যাটি বেশ বড়।

যদি এই তিনটি সর্ত্ত সত্য হয় তবে জীন সংখ্যার শতকরা হার একটা সমতা রক্ষা করে চলবে। হার্ডি এবং ওয়েইনবার্গের (**Hardy & weinberg**) এই সমতাসূত্র বিবর্ত্তনবাদের বিশ্লেষনের মূল সূত্রগুলির অন্যতম।

হার্ডি ওয়েইনবার্গের সমতা সূত্রে (**Hardy weinberg Law of equilibrium**) বলা হয়েছে যে কোন জন সংখ্যায় যখন বংশানুক্রমিক সমতা থাকছে অর্থাৎ জীন এর কোন পরিবর্ত্তন হচ্ছেনা, তখন সেখানে ক্রম বিবর্ত্তন

একেবারেই বন্ধ। যৌনমিলন বাধাহীন হওয়ায় জীনগুলি যেমন খুশী জোট বাঁধছে কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের শতকরা হারের কোন পরিবর্ত্তন হচ্ছেনা। সেইজন্য এই প্রাণীগুলির ক্রমবিবর্ত্তন হচ্ছে না। এই জনসংখ্যায় বিভিন্ন বৈচিত্রের অভাব নেই কিন্তু প্রত্যেকে সমান সুযোগ পাচ্ছে বলে তাদের অনুপাত সমান থাকছে।

তাহলে ক্রম বিবর্ত্তন সম্ভব কি করে? হার্ডি ওয়েইনবার্গের সমতা সূত্র প্রমাণ করতে আমাদের কয়েকটি সর্ত্ত মানতে হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে এই সর্ত্তগুলি থাকা সম্ভব নয়। যেমন জনসংখ্যা যে সব সময় বড় হয় তা নয়, ছোটও হয়। যৌনমিলন কখনই একেবারে যেমন খুশী এবং বাধাহীন ভাবে হয়না। জীনগুলির আকস্মিক পরিবর্ত্তন (Mutation প্রায়ই হয়। এর ফলে বংশানুক্রমিক সমতা (Genetic equilibrium) নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ কোন শ্রেণীর প্রাণীর শতকরা হার কমে যায়, কোন শ্রেণীর বাড়ে। যে শ্রেণীর প্রাণীর শতকরা হার বাড়ছে তার অবশ্যই বিবর্ত্তনএর গতিবেগে এগিয়ে চলেছে। এইটাই হল ক্রমবিবর্ত্তনের পদ্ধতি।

যৌন মিলনে সীমাবদ্ধতার প্রভাব।

এমন হতে পারে যে যতগুলি যৌনকোষ সৃষ্টি হচ্ছে তার সবগুলিরই যে প্রজনন ক্ষমতা আছে এমন নয়! কোন এক শ্রেণীর যৌনকোষের কিছু হয়ত নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ AA, aa এবং Aa শ্রেণীর জীনবাহী প্রাণীদের সবগুলি হয়ত প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সমান ভাবে অভ্যস্ত (Adopted) নয় কিছু অংশ অনভ্যস্ত।

মনে করা যাক AA শ্রেণীর প্রাণীদের এক তৃতীয়াংশের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। যদি তাই হয় তাহলে শতকরা ৩৬টি A জীনবাহী যৌনকোষ সৃষ্টি হবে কিন্তু প্রজনন ক্ষমতা থাকবে শতকরা ২৪টির। এরফলে স্বভাবতঃই A জীন বাহী প্রাণীদের সংখ্যা কমে যাবে এবং অন্য প্রাণীরা জনসংখ্যার একটি বড় অংশ অধিকার করে থাকবে। পর পর কয়েক পুরুষ ধরে এই ভাবে চললে দেখা যাবে যে ঐ জন সংখ্যায় A জীনের শতকরা হার ক্রমশঃ কমছে এবং a জীনের শতকরা হার বাড়ছে।

যৌন মিলন :—

A+A—৫৪·৬×৫৪·৬=২৯·৮=২৯·৮%AA

A+a—৫৪·৬×৪৫·৪=২৪·৮
a+A—৪৫·৪×৫৪·৬=২৪·৮ } = ৪৯·৬% Aa

a+a—৪৫·৪×৪৫·৪=২০·৬=২০·৬%aa

তাহলে এবার জন্মাল

যৌন মিলন

A+A—৫০×৫০=২৫%—AA

A+a—৫০×৫০=২৫%
a+A—৫০×৫০=২৫% } —৫০%Aa

a+a—৫০×৫০=২৫%—aa

তাহলে এবার জন্মাল

$\frac{২৫}{১০০}$AA, $\frac{৫০}{১০০}$Aa, $\frac{২৫}{১০০}$aa শ্রেণীর প্রাণী।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র দুই পুরুষেই AA শ্রেণীর প্রাণীদের সংখ্যা শতকরা ৩৬ থেকে শতকরা ২৫ এ এসে দাঁড়াল। অন্যদিকে aa শ্রেণীর প্রাণীদের সংখ্যা এই অল্প সময়েই শতকরা ১৬ থেকে শতকরা ২৫ এ বৃদ্ধি পেল। Aa শ্রেণীর প্রাণীদের শতকরা হার সামান্য পরিবর্তীত হল।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব (Natural Selection) A জীনের বিপক্ষে এবং a জীনের স্বপক্ষে কাজ করছে। যেখানেই প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাবের চাপ এই ভাবে কাজ করে সেখানেই হার্ডিওয়েইনবার্গের পরিকল্পিত সমতা নষ্ট হয়। এর ফলে কোন কোন জীনের উপস্থিতির অনুপাত বেশ দ্রুত গতিতে পরিবর্ত্তীত হয়। কোন চরিত্র বিলুপ্ত হয়ে যায় কোন চরিত্রের আরো বিকাশ ঘটে। এই পরিবর্ত্তনই সূচনা করে ক্রম বিবর্ত্তনের। প্রকৃতিতে অধিকাংশ চরিত্রের উপরই এই নির্ব্বাচনী প্রভাব (Selection pressure) স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কাজ করে। এই প্রভাবের সামান্যতমও কোন একদিকে কম বেশী হলে জনসংখ্যার (Population) উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়।

আকস্মিক পরিবর্ত্তনের প্রভাব :—

প্রকৃতিতে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে জীন এর চারিত্রিক পরিবর্ত্তন হয়। এর ফলে হার্ডিওয়েনইবার্গের সমতা নষ্ট হয়ে থাকে। কোন পরিবর্ত্তীত জীন কি ধরনের প্রভাব দেবে, পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে, জীবন সংগ্রামে জয়ের পথে এগিয়েনিতে সাহায্য করবে কিনা তার উপর নির্ভর করে প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব তার স্বপক্ষে কাজ করবে কি বিপক্ষে কাজ করবে।

অবশ্য প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব যেভাবেই কাজ করুক জীন সংখ্যার অনুপাতের পরিবর্ত্তন হবেই। পরিবর্ত্তিত জীনটির প্রভাব যদি প্রবল (Dominant) প্রকৃতির হয় তাহলে তার চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ তখনই হবেই এবং প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাবও (Selection pressure) পক্ষে অথবা বিপক্ষে তখনি কাজ করতে পারবে।

পরিবর্ত্তীত জীনটির প্রভাব প্রবল প্রকৃতির না হয়ে যদি দুর্ব্বল (Recessive) প্রকৃতির হয় তাহলে তার চরিত্রের কোন বহিঃপ্রকাশ তখনি হবেনা এবং প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাবও তখনি কাজ করতে পারবে না। অবশ্য আকস্মিক পরিবর্ত্তন হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই হয় কারণ প্রায়শঃই দেখা যায় যে পরিবর্ত্তীত জীনগুলি দুর্ব্বল (Recessive) প্রকৃতির।

আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে তৈরী দুর্ব্বল (Recessive) প্রকৃতির জীনগুলিও জনসংখ্যার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশঃ বিভিন্ন ভাবে। যেমন মনে করা যাক প্রবল (Dominant) প্রকৃতির একটি জীন 'A' থেকে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে তৈরী হয়েছে একটি জীন 'a' যার প্রভাব দুর্ব্বল

(Recessive) প্রকৃতির। এরসঙ্গে হয়ত একটি প্রবল (Dominant) প্রকৃতির জীন B খুব ঘনিষ্ট ভাবে রয়েছে। প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব হয়ত B জীনের স্বপক্ষে কাজ করছে। ফলে জনসংখ্যার মধ্যে 'B' জীনের প্রসার হবেই এবং তার সঙ্গী হিসাবে দুর্ব্বল প্রকৃতির 'a' জীনটিরও প্রসার হবে। দুর্ব্বল প্রকৃতির অনেক জীনেরই এই ভাবে অন্য জীনের সঙ্গ ধরে প্রসার হয়।

এই ভাবে ক্রমশঃ দুর্ব্বল (Recessive) প্রকৃতির জীনগুলি জনসংখ্যার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে নিশ্চুপে এবং তার বহিঃপ্রকাশ নেই বলে তখনি কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এর পর এমন হতে পারে যে এই রকম দুর্ব্বল (Recessive) প্রকৃতির জীন বহন করছে এমন দুই প্রাণীর মিলন হল। তার ফলে পরবর্ত্তী বংশধরদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ শুধু মাত্র ঐ দুর্ব্বল (Recessive) প্রকৃতির জীন পাবে এবং তাদের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হবে।
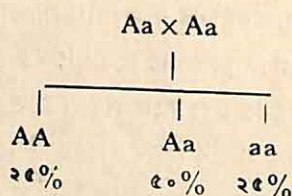
'aa' জীন বহনকারী প্রাণীগুলিতে ঐ দুর্ব্বল (Recessive) প্রকৃতির জীনের প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ হবে এবং প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব (Selection effect) এখন এখানে প্রত্যক্ষ্য ভাবে কাজে লাগতে পারবে।

ক্রম বিবর্ত্তনে আকাস্মিক পারবত্তনের প্রভাব কিভাবে কাজ করবে তা অনেকটা নির্ভর করে যে এই প্রভাবের ফলে পরিবর্ত্তীত জীন এর পরিবর্ত্তনের প্রভাব কত বড়। খুব বড় রকমের পরিবর্ত্তন হঠাৎ এলে তা হয়ত জীবন ধারণের পক্ষে সহায়ক নাও হতে পারে, ক্ষতিকারক হতে পারে, হয়ত মৃত্যুর কারণই হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোন জীনের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের (Mutation) ফলে হয়ত হৃদযন্ত্রের অভ্যন্তরের ভালভ্ (Valve) গুলির আকৃতির বেশ বড় রকমের পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। এর ফলে হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ হয়ত বাধা পেল আর সেই কারনে মৃত্যু ঘটল সঙ্গে সঙ্গে।

আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে যে বড় রকমের পরিবর্ত্তনগুলি হয় সেগুলি জীবন সংগ্রামে স্থায়ী হয় না। পরিবর্ত্তন যত সূক্ষ্ম হয় যত অল্প হয়, স্থায়ী

হবার ক্ষমতাও তার তত বেশী থাকে। ক্রমবিবর্ত্তন আসে এই সব অসংখ্য সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন একত্রিত হয়ে, হঠাৎ কোন বড় রকমের পরিবর্ত্তনের ফলে নয়।

জনসংখ্যার আকার ও তার প্রভাব :—

হার্ডিওয়েইনবার্গের সমতা সুত্রের তৃতীয় সর্ত্ত যে জন সংখ্যা যদি বড় রকমের হয় তাহলে। কিন্তু জন সংখ্যা যেমন বড়ও হয় তেমনি ছোটও হয় ফলে হার্ডিওয়েইনবার্গের সমতা নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। যেমন ধরা যাক একটি মূদ্রা নিয়ে টস্ করা হচ্ছে। একশতবার করার ফলে হয়ত পঁচিশবার সোজা পিঠ আর পঁচাত্তর বার উল্টো পিঠ পড়ল। কিন্তু যদি মাত্র তিনবার করা হয় তিন বারই উল্টো পিঠ পড়তে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক। শুক্র এবং ডিম্ব-কোষের মিলন যখন সুযোগের উপর (chance) নির্ভর করছে তখন মিলনের সম্ভাবনা ও সুযোগ যত বেশী বার পাওয়া যাবে সব রকম বৈচিত্রের প্রকাশের সম্ভাবনাও ততবেশী থাকবে।

জনসংখ্যা যদি ছোট হয় খুবই সেইজন সংখ্যায় শুক্রকোষ দুরকমের ['A' জীন বাহী এবং 'a' জীনবাহী] এবং ডিম্বকোষ দুরকমের ['A' জীনবাহী এবং 'a' জীনবাহী] থাকলেও সবগুলি জাতকই হয়ত AA শ্রেণীর হতে পারে। যৌন কোষ গুলির কিছু নষ্টহয়ে যায়ই এবং সংখ্যায় যেখানে অল্প সেখানে হয়ত 'a' জীন বাহীকোষ গুলিই সেই পর্য্যায়ে পড়ল। কিন্তু জনসংখ্যা বড় হলে হয়ত এক লক্ষ শুক্র কোষ এবং এক লক্ষ ডিম্ব কোষের মিলনের ফলে সবগুলিই একরকম হবার সম্ভাবনা কম এবং AA, Aa, aa তিন রকমই কোননা কোন অনুপাতে জন্মাবে।

ক্রম বিবর্ত্তন আসে বিভিন্ন বৈচিত্রের সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। এই বৈচিত্র-গুলির উৎপত্তি আকস্মিক পরিবর্ত্তনের (Mutation) ফলে পরিবর্ত্তীত বংশধারা পরিবাহক পদার্থের (Genetic material) প্রভাবে। এই বৈচিত্রগুলির যদি এমন কোনগুণ থাকে যে পরিবর্ত্তীত জীবনযাত্রায় তারা সহায়ক হবে, নতুন আবহাওয়ায় নতুন জীবনে তারা বাঁচতে সাহায্য করবে, তবেই তারা স্থায়ী হয়। বংশধারাশ্রয়ী এই সব বৈচিত্রগুলির সংমিশ্রনে উদ্ভব হয় নতুন প্রজাতির। শত সহস্র লক্ষ কোটি বৎসর ধরে এমনি বিভিন্ন পরিবর্ত্তন এসেছে আসছে এবং আসবে।

নির্বাচনী প্রভাব

বিবর্ত্তন বাদের তথ্যে ডারউইন প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাবের (Selection) কথা বলেছিলেন। অবশ্য এ তথ্য ডারউইনের কোন মৌলিক চিন্তাধারার ফল নয়। ডারউইন তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমনের যে সুযোগ পেয়েছিলেন তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন তাঁর গভীর পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অসংখ্য তথ্য সংগ্রহে। পরবর্ত্তী জীবনে এই সব তথ্য ও প্রমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাজিয়ে ধরে তিনি তাঁর বিবর্ত্তনবাদের চাঞ্চল্যকর বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন।

ডারউইন আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্যকরেন যে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে জন্মের হার সব সময়েই খুবই বেশী অথচ মোট জনসংখ্যার পরিবর্ত্তন কিন্তু খুব বড় একটা হয়না। জন্মের হার পর্য্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে যতগুলি প্রাণী বড়হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে জন্মায় তারচেয়ে অনেক বেশী। যেমন ছত্রাক বংশ বিস্তার করে ডিম্বাণুর (Spore) সাহায্যে, লাইকোপারডন (Lycoperdon) নামে একটি ছত্রাকের প্রত্যেকটি ৭×১০^{১১}টি ডিম্বাণু (Spore) সৃষ্টি করে। এদের প্রত্যেকটি যদি বাঁচত এবং বড় হয়ে উঠত তাহলে কি আশ্চর্য্য গতিতে এরা সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলত? তামাকের গাছ (Nicotiana Tabacum) থেকে যে বীজ হয় প্রত্যেক গাছ থেকে তিন লক্ষ ষাট হাজার বীজ হয়। কোন এক প্রজাতির স্যামন মাছের স্ত্রী মাছগুলি প্রত্যেকে ২৮০০০,০০০ করে ডিম দেয়। একধরণের আমেরিকান ঝিনুকের (Oyster) স্ত্রী প্রাণীগুলি প্রত্যেকে ১১৪০০০,০০০ করে ডিম দেয়। এ হল মাত্র কয়েকটি উদাহরণ। যে সব প্রাণীর বংশ বৃদ্ধি হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে সেই সব প্রাণীদেরও দেখা যায় যে যতগুলি জন্মাচ্ছে, বেঁচে থাকছে তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যায়।

এর কারণ একই প্রাণীর এতগুলি করে যে জন্মাচ্ছে তারা সকলে একই প্রকৃতির নয়, বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রবনতা নিয়ে জন্মায়। যেগুলির এমন কতকগুলি প্রবণতা (Potentiality) আছে যা তাদের জীবন ধারণে সহায়তা

করে সেইগুলিই শেষপর্য্যন্ত বাঁচতে পারে অন্যরা নয়। অর্থাৎ এই অসংখ্য জাতকের মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্র রয়েছে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা যাদের অন্যদের তুলনায় বেশী সেই বৈচিত্রগুলিই অন্যদের তুলনায় ভাল ভাবে বাঁচে। বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে হয় যে প্রাণীগুলির জীনের আকস্মিক পরিবর্ত্তন (**Mutation**) প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার সহায়ক এমন কিছু চরিত্রের সৃষ্টি করেছে সেইগুলিই জীবনধারনে সক্ষম হবে।

একই গাছের সবগুলি বীজ থেকেই যে চারা জন্মাবে এমন নয় কোন কোন বীজ মরে যেতে পারে হঠাৎ কোন কারণেই হয়ত মাটিতে না পড়ে পাথরের উপর পড়ল কোন বীজ এবং তার অঙ্কুরোদ্গম হোল না। প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব কিন্তু এখানে কাজ করছে না। এটা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু বীজ থেকে যারা জন্মেছে তাদের উপর প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব (**Natural Selection**) কাজ করবে এবং সেখানে যারা সুবিধা পাবে তারাই বাঁচবে। এই ভাবে প্রত্যেক প্রজাতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন-শীল প্রকৃতির সঙ্গেমানিয়ে নিতে পারে এমন বৈচিত্রে পরিবর্ত্তীত হতে থাকে।

ডারউইনের মৃত্যুর পরে জোহানসেন (**Johansen 1903**) দেখিয়েছেন যে বংশধারাশ্রয়ী বৈচিত্রের মিশ্রণ আছে এমন জনসংখ্যাতেই শুধু প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব কার্য্যকরী। জোহান সেন দেখালেন যে কোন এক বংশের নিজস্ব ধারা যদি বিশুদ্ধ প্রকৃতির হয় (**Pure lives**) এবং স্বতঃ প্রজননের ফলে (**Self fertilisation**) সেই বিশুদ্ধতায় অন্য বৈচিত্রের মিশ্রণ না হয় তাহলে প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব সেখানে কাজ করে না। বিশুদ্ধ শ্রেণীতে বংশধারাশ্রয়ী বৈচিত্রের সংখ্যা খুবই কম। যদি শুধুমাত্র দীর্ঘদেহ অথবা শুধুমাত্র খর্ব্বদেহ বেছে নিয়ে বংশধারা অনুসরণ করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে দীর্ঘ দেহ শুধুমাত্র দীর্ঘদেহ প্রকৃতির জন্ম দিয়ে যাচ্ছে, খর্ব্বদেহ শুধুমাত্র খর্ব্বদেহ প্রকৃতিরই জন্ম দিয়ে যাচ্ছে অন্য কিছু নয়। এই ধরনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব শুধুমাত্র নিজেদের গোষ্টির মধ্যে প্রজননের (**Brother Sister breeding**) ফলেই।

কোন গোয়ালা যদি চায় যে বেশী দুধ দেবে এমন ধরনের গরু তার প্রয়োজন তাহলে কি করে? ভাল দুধ দেয় এমন গরুর সঙ্গে এই ধরনের বেশী দুধ দেয় এমন একটির প্রজনন করে। এদের বংশধরদের মধ্যে যেগুলি কম দুধ দেয়

সেগুলিকে বাতিল করে ভালগুলি বেছে নিয়ে আবার তাদের সঙ্গে বেশী দুধ দেয় এমন জাতের প্রজনন করে। তাদের বংশধরদের নিয়ে হয়ত আবার এই পরীক্ষা চালায়। এইভাবে পর পর কয়েকটি বংশ ধারা পার হয়ে যেগুলি আসে সেগুলি খুব ভাল জাতের বেশী দুধদেয় এমন শ্রেণীর হয়ে ওঠে। এখানে গোয়ালা তার প্রয়োজন মত নির্ব্বাচন করছে, অপ্রয়োজনীয়দের বাতিল করছে, এবং বিভিন্ন বৈচিত্রের মিশ্রণ করছে প্রজননের মাধ্যমে। মিশ্রণ যদি না হত শুধুমাত্র নিজেদের গোষ্টির মধ্যেই প্রজনন সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে বৈচিত্রও আসতনা এবং নির্ব্বাচনের সুযোগও আসতনা। ১৯০৩ সালে সেই কথাই বললেন জোহান সেন (Johan Sen 1903) যে এই ধরনের প্রাণীদের গোষ্টি নিয়ে যে জনসংখ্যা (Uniform population)

সেখানে যদি শুধুমাত্র নিজেদের গোষ্টির মধ্যেই প্রজনন সীমাবদ্ধ থাকে (in breeding only) তাহলে সেই জনসংখ্যায় প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব কাজ করতে পারেনা। ঠিক এই সময়েই দ্য ভ্রীস (De Vries) তাঁর চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের (Mutation) তথ্য পরিবেশন করেছেন। এই সময় অনেকেই ডারউইনকে বাতিল করে দিয়ে এই নূতন তথ্য আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও তার প্রভাবের উপর গুরুত্ব দিলেন। ডারউইনের সম্বন্ধে সমালোচনা হল যে বৈচিত্রের উদ্ভবের কারন তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এটা অবশ্য ডারউইনের প্রতি সুবিচার করা হল না কারণ ডার-উইনের প্রস্তাবিত প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাবের তথ্য কোনদিনই বৈচিত্রের উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষনের জন্য লেখা হয়নি। যেখানে বৈচিত্র আছেই সেখানে প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাবের বিশ্লেষণ ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই ধরনের ধারনা গড়ে ওটার পর মনে হল ডার উইনের ব্যাখ্যা এ যুগে অচল। তাঁর পুরোনো মতবাদ এখন আর চলবে না। এখন আকস্মিক পরিবর্ত্তনের (Mutation) নূতন তথ্য ব্যাখ্যা করবে ক্রমবিবর্ত্তনের মূল কথা। চিন্তাশীল মহলে ক্রমবিবর্ত্তনের বৈপ্লবিক বিশ্লেষণকারী ডার-উইনের মৃত্যু ঘটল।

পররর্ত্তী পর্য্যায়ে বংশধারানুশীলন ও তার বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বিশ্লেষনের ভিত্তি যখন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা পেল তখন দেখা গেল যে ডার উইনের মতবাদ অচল একথা ঠিক নয়। বংশধারানুশীলনের মাধ্যমে বৈচিত্রগুলির উৎপত্তি কারণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হল এবং দেখাগেল যে প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাবই

এই বৈচিত্রগুলির কিছু অংশকে ক্রমবিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করছে।

প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব ও তার শক্তির সত্যতা এখন আর শুধুমাত্র যুক্তি তর্কের বিষয় নয়। আমরা এখন গবেষণাগারে হাতে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে পারি, প্রমাণ করতে পারি কিভাবে এই প্রভাব কাজ করে। প্রকৃতিতে যে ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে যে ধরনের পরিবর্ত্তন আসতে পারে গবেষণাগারে তার অনুকরণ করে, সেই ধরনের আবহাওয়া সৃষ্টি করে আমরা দেখাতে পারি প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব কি ভাবে কাজ করে।

ড্রসোফিলা পতঙ্গের এক বৃহৎ সংগ্রহের মধ্যে পর পর বংশানুক্রমিক ভাবে বংশধারাশ্রয়ী বৈচিত্রগুলি আমরা পর্য্যবেক্ষণ করতে পারি এবং ঐ জনসংখ্যায় তার কি হার ছিল, বর্ত্তমানে কি অনুপাতে আসছে এবং ভবিষ্যতে কি অনুপাতে আসবে তা হিসাব করতে পারি। প্রতি সপ্তাহে ঐ জনসংখ্যা থেকে কিছু পতঙ্গ সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে আনুপাতিক হিসাব লক্ষ্য করতে পারি। এই ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছিল স্বাভাবিক লাল চোখ ড্রসোফিলা পতঙ্গ (wild Type) এবং রেখা চোখ (Bar eyed) ড্রসোফিলা পতঙ্গ একত্রে খোলা বোতলে তারের ঘন জাল দিয়ে ঢাকা বাক্সে রেখে। এই বাক্সে মোট কতগুলি পতঙ্গ রাখা হল এবং তার মধ্যে কোন শ্রেণীর কি অনুপাতে রইল তার একটা হিসাব রাখা হল। এরপর বংশানুক্রমিক ভাবে শুধু হিসাব রেখে যাওয়া হল যে লাল চোখ কতগুলি করে বেঁচে থাকছে এবং রেখা চোখ (Bar eyed) কতগুলি করে বেঁচে থাকছে। এবং এদের অনুপাতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটছে কি না।

দেখা গেল যে ক্রমশঃ লালচোখ পতঙ্গের সংখ্যা বাড়ছে এবং রেখা চোখ পতঙ্গের সংখ্যা কমছে। নির্ব্বাচনী প্রভাব (Selection) এখানে লাল চোখ পতঙ্গগুলির স্বপক্ষে কাজ করছে। লাল চোখ পতঙ্গগুলির বংশ বিস্তার ঘটছে দ্রুত।

ড্রসোফিলা পতঙ্গে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে আর একটি বৈচিত্র পাওয়া যায় যাদের ডানাগুলি অপুষ্ট (Vestigeal wing) এবং স্বাভাবিক ভাবে তারা উড়তে পারে না। এই বৈচিত্রের সঙ্গে স্বাভাবিক ডানার পতঙ্গ একত্রে রেখে একই পরীক্ষা করা হল দেখা গেল একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। অপুষ্ট ডানার (Vestigeal wing) পতঙ্গগুলি ক্রমশ সংখ্যায় কমে যাচ্ছে।

ড্রসোফিলা পতঙ্গের আর একটি বৈচিত্র খয়েরী রঙের দেহ (ebony body) এদের সঙ্গে স্বাভাবিক রঙের দেহের পতঙ্গের মিশ্রণ একত্রে রেখে এই একই পরীক্ষা করা হল। এই বার একটু অন্য ধরনের ফল পাওয়া গেল। দেখা গেল যে খয়েরী রঙের দেহের পতঙ্গগুলি শতকরা এক ভাগ থেকেই যায় এবং এই অনুপাত বেশ স্থায়ী। এর আগের পরীক্ষাগুলিতে দেখা গিয়েছিল যে ক্রমশঃ রেখা চোখ (Bar eyed) এবং অপুষ্ট ডানা (Vestigeal) এই দুই বৈচিত্র একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় একটিও থাকেনা। এইবার কেন এমন হল। ঐ জন্য সংখ্যায় (Population) তিন রকম পতঙ্গ থাকবে (১) বিশুদ্ধ স্বাভাবিক রঙের দেহ (২) বিশুদ্ধ খয়েরী রঙের দেহ (৩) স্বাভাবিক ও খয়েরী শ্রেণীর মিশ্রণে উদ্ভুত সঙ্কর। দেখা গেল এই সঙ্কর শ্রেণীর জীবনীশক্তি (Viability) অন্য দুই শ্রেণীর চেয়ে বেশী। ফলে ঐ জনসংখ্যায় সঙ্কর প্রকৃতির পতঙ্গ থেকে যায়। খয়েরী দেহগুলি মরেগেলেও বিশুদ্ধ স্বাভাবিক রঙের দেহ এবং সঙ্কর শ্রেণীর প্রজননের ফলে অল্প সংখ্যক পতঙ্গ খয়েরী রঙের দেহ নিয়ে আবার জন্মায় তারাই আবার জন্ম দিয়ে যায় কিছু সঙ্কর শ্রেণীর। সেইজন্য খয়েরী রঙেরদেহ এই বৈচিত্র একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়না কিছু থেকেই যায়। এই ভাবে নির্ব্বাচনী প্রভাব ও তার কাজ কিভাবে হয় তা আমরা গবেষণাগারে দেখাতে পারি।

আগের পরীক্ষায় আমরা দেখেছি যে অপুষ্ট ডানা (Vestigeal wing) এই বৈচিত্রের পতঙ্গগুলি ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যায় একটিও বাঁচেনা শেষপর্য্যন্ত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে সৃষ্ট এই বৈচিত্রটি কোন প্রয়োজনে লাগেনা। সত্যিই কি তাই ? যে আবহাওয়ায় ঐ পরীক্ষা করা হয়েছিল সেখানে তাই। কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হয় যদি ? যদি প্রাকৃতিক পরিবেশ বদলায় ? তাও করে দেখা হল। প্রকৃতিতে এমন জায়গা আছে যেখানে খুব জোরে হাওয়া বয় সব সময়। গবেষণাগারে ঐ পরীক্ষার সময় জোরে হাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। দেখাগেল যে স্বাভাবিক ডানার পতঙ্গেরা উড়ে যাচ্ছে ফলে ঐ জনসংখ্যায় ক্রমশঃ অপুষ্ট ডানার (Vestigeal wing) প্রাণীদের সংখ্যা বাড়ছে কারণ তারা উড়তে পারেনা এবং হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা কম। তাহলে অপুষ্ট ডানা (Vestigeal wing) এই চরিত্রটি যে আগে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল এখন আর তা নয় বরং এই পরিবর্ত্তীত পরিবেশে এইটিই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বৈচিত্র এবং এই পতঙ্গ

গুলিকে জীবনযাপনে তা সাহায্য করছে। নির্ব্বাচন প্রভাব (Selection) এখানে তাহলে বিপরীত মুখী।

এই ভাবে গণিতের মাধ্যমে সংখ্যা তত্ত্বের প্রয়োগে আমরা কোন জন-সংখ্যার আয়তন, সেখানে নির্ব্বাচনী প্রভাবের কাজের অনুপাত, জনসংখ্যায় পরিবর্ত্তনের হার ইত্যাদি নির্ণয় করতে পারি।

ক্রমবিবর্ত্তন অনুশীলনের আর এক অধ্যায় হল ভূতাত্বিক সমীক্ষায় ভূস্তরের বিভিন্ন পর্য্যায়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজপর্য্যন্ত জীব জগতের ইতিহাস বিশ্লেষণ। কিন্তু এই বিবর্ত্তন যা লক্ষ কোটি বৎসর ধরে ধীর গতিতে এসেছে তার উত্থান পতন আমাদের জীবনকালে দেখা সম্ভব নয়। আমাদের জীবনকালে ক্রমবিবর্ত্তনের উত্থান পতন আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র দ্রুত বিবর্ত্তন (Micro evolution) যেখানে হয়। এর উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি ক্যালিফর্ণিয়ার লেবুবাগানের কথা।

ক্যালিফর্ণিয়ার বিরাট অঞ্চল জুড়ে বড় বড় লেবুবাগান আছে। এই সব বাগানের লেবু থেকে তৈরী মার্ম্মালেড্ ইত্যাদি টিন বন্দী হয়ে দেশে বিদেশে চালান যায়। এই লেবুবাগান গুলি ক্যালিফর্ণিয়ার এক বিরাট ব্যবসার কেন্দ্র। এক সময় দেখা গেল যে লেবু গাছগুলি এক ধরনের কীটের আক্রমনে (Scale insect) নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে যখন এইভাবে লেবু গাছ নষ্ট হতে বসেছে কোন রকম ওষুধপত্র দিয়েও কিছু যখন হচ্ছেনা তখন সবচেয়ে বিষাক্ত গ্যাস হাইড্রোসায়ানিক গ্যাস (H. C. N. gas) প্রয়োগ করা হল। এই গ্যাস প্রয়োগের পর কিছুদিন আর ঐ কীটের উপদ্রব নজরে এলোনা এবং গাছগুলি ভালভাবে বড় হতে লাগল। এর পর আবার কিছুদিন পরে দেখা গেল গাছগুলি ঐ কীটের আক্রমণ (Scale insect) হচ্ছে। এইবার দেখা গেল যে এই বিষাক্ত গ্যাসে এই কীটগুলির (Scale insect) কিছু হয় না। এরা এই বিষাক্ত গ্যাস সহ্য করেও বাঁচতে পারে অর্থাৎ এরা প্রতিরোধ্য (Resistant) প্রকৃতির।

দেখা গেল যে ঐ পতঙ্গ (Scale insect, fam Coccidae) দুরকমের আছে একধরণের অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির যারা ঐ গ্যাস সহ্য করতে পারে না অন্যরা প্রতিরোধ্য প্রকৃতির যারা ঐ গ্যাসের একটা নির্দ্দিষ্ট ঘনত্ব সহ্য করতে পারে।

বৈচিত্র	সময়	তাপমাত্রা	গ্যাসের ঘনত্ব প্রতি লিটার বাতাসে	জীবিত থাকে
প্রতিরোধ্য প্রকৃতি	৪০ মিনিট	২৪° সেন্টিগ্রেড	০·১৮৮ মিলিগ্রাম	৪৫·৪৩%
অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতি	,,	,,	,,	৪·০৬%

এই প্রতিরোধ্য প্রকৃতির প্রাণীরা এল কোথা থেকে? এই গ্যাসের প্রভাবে কোন জীনের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে নিশ্চয়ই নয়। প্রতিরোধ্য প্রকৃতির কীট ও আগেই ছিল তবে খুব কম হারে হয়ত হাজারে একটা। সেইজন্য এরা আগে নজরে পড়েনি। গ্যাস প্রয়োগের ফলে যখন অপ্রতিরোধ্য (**Non resistant type**) শ্রেণী বিনষ্ট হয়ে গেল তখনই এই প্রতিরোধ্য শ্রেণী অবাধে বংশ বিস্তার করার স্থযোগ পেল এবং তখনই এদের লক্ষ্য করা গেল। বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে প্রতিরোধ্য ও অপ্রতিরোধ্য এই দুইটি চরিত্র একটি মাত্র অসম্পূর্ণ প্রভাবশালী লিঙ্গাত্মক জীনের প্রভেদের ফল।

প্রকৃতিতে আকস্মিক পরিবর্ত্তন হয় যেমন খুশী (**at random**) এবং সেই ভাবেই এই প্রতিরোধ্য চরিত্রটির উৎপত্তি। আমাদের যতদূর জানা আছে হাইড্রোসায়ানিক গ্যাস এই ধরনের কোন পরিবর্ত্তন (**Mutation**) আনতে পারে না। প্রতিরোধ্য প্রকৃতি এর আগে নির্ব্বাচণী প্রভাবের (**selection**) সহায়তা পায়নি কিন্তু গ্যাস প্রয়োগের পরে নূতন পরিবেশে এরাই নির্ব্বাচনী প্রভাবের সহায়তা পেল। এবং ঐ পতঙ্গের জনসংখ্যায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন এল।

ক্যালিফর্ণিয়ার লেবুবাগানে ১৯১৪ সাল থেকে গ্যাস প্রয়োগে ঐ পতঙ্গের হাত থেকে লেবুগাছগুলিকে রক্ষা করা হয়ে আসছিল। পরে যখন গ্যাস প্রয়োগে ফল পাওয়া গেলনা তখন কোয়াইল এবং ডিকসন (**Quayle 1938, Dickson 1940**) যথাক্রমে ১৯৩৮ এবং ১৯৪০ সালে এদের বংশধারা বিশ্লেষণ করে দেখালেন ঐ লাল রঙের কীট (**Red Scale insect**) দুই শ্রেণীর আছে প্রতিরোধ্য **(Resistant)** এবং অপ্রতিরোধ্য **(Non resistant)** প্রকৃতির। ১৯৪১ সালে হার্ডম্যান এবং ক্রেগ দেখালেন (**Hardman and Craig 1941**) যে গ্যাস প্রয়োগের সময় প্রতিরোধ্য শ্রেণীর পতঙ্গ ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত তাদের শ্বাসনালীর খোলা মুখ (**Spiracle**) বন্ধ রাখতে পারে কিন্তু

অপ্রতিরোধ্য শ্রেণীর পতঙ্গেরা পারে মাত্র এক মিনিট বন্ধ রাখতে। অবশ্য এই তথ্যের যাথার্থ্য আর কোন গবেষক পরীক্ষা করে দেখেননি।

দেহতত্ত্বের এই পরিবর্ত্তন (Physiological change) যে গ্যাস প্রয়োগের ফলে ঘটেছিল এবং পরবর্ত্তী বংশধরেরা তা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল এই ব্যাখ্যা কিন্তু নির্ভুল নয়। ঐ পতঙ্গের জনসংখ্যায় দুই শ্রেণীই ছিল এবং প্রতিরোধ্য শ্রেণীর উৎপত্তির সঙ্গে গ্যাস প্রয়োগের কোন সম্পর্ক নেই। নির্ব্বাচনী প্রভাব দুই পরিবেশে দুই ভাবে কাজ করায় ঐ পতঙ্গের জন সংখ্যায় এই পরিবর্ত্তন আসে।

আর একটি বিচিত্র উদাহরণের কথা আমরা উল্লেখ করব—দেহ বর্ণে শিল্পাঞ্চলের প্রভাব—(**Industrial melanism** ; নামে যা পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডে এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এক শ্রেণীর 'মথ' দেখা যেতো (*Amphedesis betularia*) যার রঙ ছিল হাল্কা ধরনের। কিন্তু ১৮৫০ সালে এবং তার কাছাকাছি সময়ে এই মথ্‌গুলি দেখা গেল বেশ গাঢ় রঙের জন্মাচ্ছে। দেহ বর্ণের জন্য প্রত্যক্ষ্য ভাবে দায়ী একটি জৈব রসায়ণ মেলানিন (**Melanin Pigment**) এদের দেহে বেশী পরিমাণে তৈরী হচ্ছে এবং দেহের রঙ হচ্ছে গাঢ়। দেখা গেল যে ক্রমশঃ এই গাঢ় রঙের মথগুলিই বেশী জন্মাচ্ছে এবং তাদের তুলনায় হাল্কা রঙের 'মথ' (**Moth-Lepidopteridae**) সংখ্যায় খুবই নগণ্য হয়ে পড়ছে। আরো কিছুদিন পরে দেখা গেল শুধুমাত্র গাঢ় রঙের মথেরা রয়েছে, হাল্কা রঙের একেবারেই নেই।

এই একই ব্যাপার দেখা গেল কিছুদিন পরে হামবুর্গ শহরে এবং তার কিছুদিন পরে ফ্রান্সে। এই সমস্ত অংশে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় প্রকৃতির রূপ গিয়েছে বদলে। চারদিকের গাঢ় রঙের পরিবেশে, রুক্ষ গাছের কালচে পাতার আড়ালে রঙ মিলিয়ে আত্মরক্ষা করার সুবিধা গাঢ় রঙের পতঙ্গেরই বেশী। আগের দিনে যখন এত কলকারখানা গড়ে ওঠে নি, গাছের পাতা ছিল হাল্কা সবুজ এবং সেখানে হাল্কা রঙের পতঙ্গেরা সহজে আত্মগোপন করতে পারত পাখীদের সন্ধানী নজর থেকে।

হাল্কা রঙের মথগুলির অবশ্য প্রাণশক্তি (**Viability**) বেশী গাঢ় রঙের মথগুলির তুলনায় বেশী। যদি শুধুমাত্র প্রাণশক্তির প্রশ্নই নির্ব্বাচনের কারণ

হত তাহলে গাঢ় রঙের মথগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতনা কিন্তু নির্ব্বাচনী প্রভাব (Selection) এখানে বিপরীত মুখী, গাঢ়রঙের মথগুলি হাল্কারঙের মথেরই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের (Mutation) ফল। শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার আগেই তারা ছিল। এদের উদ্ভবের সঙ্গে কল কারখানার কোন সম্পর্ক নেই। তবে গাঢ় রঙেরগুলি কমছিল কারণ তাদের জীবনী শক্তি কম এবং নির্ব্বাচনী প্রভাব তাদের স্বপক্ষে তখন ছিল না।

টিমোফিফ্ রিসোভস্কি (Timofeeff-Ressovsky 1933, 1935) ১৯৩৩ সালে এবং ১৯৩৫ সালে ড্রসোফিলা পতঙ্গের উপর পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে উদ্ভুত ড্রসোফিলা ফিউনেব্রীস্ এর (Drosophila funebris) বিভিন্ন শ্রেণীর (Strains) প্রাণশক্তির এক তুলনা মূলক সমীক্ষা ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। ড্রসোফিলা ফিউনেব্রীসের বিভিন্ন শ্রেণীর পতঙ্গেরা বাইরে থেকে দেখতে এক এবং তাদের কোন পার্থক্য বোঝা যায় না বলে ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার এর (Drosophila Melanogaster) একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সঙ্গে তাদের তুলনা মূলক সমীক্ষা করা হয়। ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে বাস করে এবং ড্রসোফিলা ফিউনেব্রীস পছন্দ করে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল।

টিমোফিফ্ রসোভস্কি হিসাব করেন ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার এর জীবনী শক্তিকে (Viability or Survivalvalue) একক ধরে ড্রসোফিলা ফিউনেব্রীসের প্রাণশক্তির শতকরা কত। অর্থাৎ প্রতি ১০০টি মেলানোগ্যাসটার যেখানে বাঁচে সেখানে ফিউনেব্রীস যদি ৯০টা বাঁচে তাহলে প্রাণশক্তি (Viability) ৯০% ধরা হবে।

একই পাত্রে (Culture bottle) সমান সংখ্যায় ড্রসোফিলা মেলানো গ্যাসটার ও ড্রসোফিলা ফিউনেব্রীসের ডিম (প্রতিটি ১৫০ করে ৩০০) রাখা হয় কিন্তু তাদের খাবার দেওয়া হয় কম। এই ডিমগুলি থেকে শুক্রকীট (Larvae) বেরিয়ে যখন খাওয়া আরম্ভ করবে তখন সকলের মত পর্য্যাপ্ত খাবার তারা পাবে না। অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। এরপর এদের কোন শ্রেণীর পতঙ্গ কতগুলি করে বাঁচে তার হিসাব করা হল। ফল পাওয়া গেল এই হারে :—

ড্রসোফিলা ফিউনেব্রীস এর শ্রেণী	ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার এর তুলনায় প্রাণশক্তির শতকরা হার		
	১৫° সেঃ গ্রেঃ	২২° সেঃ গ্রেঃ	২৯° সেঃ গ্রেঃ
বার্লিন শ্রেণী	৮১	৪২	১৮
মিশর শ্রেণী	৬৮	৪৬	৩০
মস্কো শ্রেণী	১০১	৪৩	২৮
ইতালী শ্রেণী	৭৮	৪৩	২৫

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ফিউনেব্রীসের (**D. funebris**) প্রাণশক্তি যথেষ্ট কম কিন্তু কম উত্তাপে রাখলে প্রাণশক্তি খুব কম নয় বেশী উত্তাপে রাখলে খুবই কম। ফিউনেব্রীস প্রজাতি শীতপ্রধান অঞ্চল পছন্দ করে এবং মেলানোগ্যাসটার প্রজাতি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল পছন্দ করে। ফিউনেব্রীস প্রজাতির দেহতত্ব এমন ভাবে নিয়ন্ত্রীত যা শীত প্রধান অঞ্চলেই ভালো কাজ করে।

আর একটি পরীক্ষা করা হয় ফিউনেব্রীস প্রজাতির বার্লিন শ্রেণী এবং মস্কো শ্রেণীতে। এদের তফাৎ বোঝা খুবই কঠিন।

আবহাওয়া	ভৌগলিক অঞ্চল	ড্রসোফিলা ফিউনেব্রীস এর বিভিন্ন শ্রেণী	প্রাণশক্তির শতকরা হার বার্লিন শ্রেণীর ফিউনেব্রীস প্রজাতির তুলনায়।		
			১৫° সেঃ	২২° সেঃ	২৯° সেঃ
সারা বছর ধরে বেশ ভাল আবহাওয়া। কিছুই তিব্র নয়।	মধ্য ইউরোপ	বার্লিন	১০০	১০০	১০০
	পশ্চিম ইউরোপ	ইংল্যাণ্ড	৯৬·৩	১০০	১১৬·৬
	উত্তর ইউরোপ	সুইডেন	১০৮·৬	৯৫·২	১১৬·৬
শীত তীব্রনয় গ্রীষ্মের তীব্রতা বেশী	ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল	ইতালী	৯৬ ৩	১০২·৪	১৩৮·৮
		মিশর	৮৩·৯	১০৯·৫	১৬৬·৬
শীত ও গ্রীষ্ম দুইয়েরই তীব্রতা বেশী	রাশিয়া	লেনিলগ্রাদ	১১১·১	১০২·৪	১২২·২
		মস্কো	১২৪·৭	১০২·৪	১৫৫·৫

দেখা গেল (১) ১৫° সেন্টিগ্রেডে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শ্রেণীর প্রানশক্তি মধ্য ও উত্তর ইউরোপের শ্রেণীর তুলনায় কম।

(২) ১৫° সেন্টিগ্রেডে রাশিয়ার শ্রেণীদের প্রাণশক্তি উত্তর, মধ্য, ও পশ্চিম ইউরোপের শ্রেণীদের তুলনায় বেশী।

(৩) ২৯° সেন্টিগ্রেডে রাশিয়ার শ্রেণীদের এবং ভূমধ্য সাগরের শ্রেণীদের প্রাণশক্তি উত্তর, পশ্চিম, এবং মধ্য ইউরোপের শ্রেণীদের তুলনায় বেশী।

ইউরোপে সারা বছর ধরে ভাল আবহাওয়া থাকে। শীত ও গ্রীষ্ম সেখানে খুব তীব্র নয়। সেখানকার প্রজাতিরা মাঝামাঝি উত্তাপে অভ্যস্ত। ভূমধ্য সাগরীয় শ্রেণীর শীত প্রধান অঞ্চলে জীবনী শক্তি কমে যায়। রাশিয়ার শ্রেণীরা চরম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত সেইজন্য ৯৫° সেন্টিগ্রেডেও তাদের প্রাণশক্তি বেশী। ইউরোপের শ্রেণীরা গ্রীষ্মের তীব্রতায় অভ্যস্ত নয় সেই জন্য ২৯° সেন্টিগ্রেডে রাশিয়া এবং ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের শ্রেণীদের প্রাণশক্তি বেশী। নির্ব্বাচনী প্রভাব এখানে কাজ করছে জীনএর আকস্মিক পরিবর্ত্তনের (**Mutation**) উপর, এবং ঐ সব জীন নিয়ন্ত্রণ করে দেহতত্ব সংক্রান্ত (**Physiological Characters**) চরিত্রগুলি।

ডাইস ১৯৩৯ সালে (**Dice 1939 axb**) এরিজোনার মরু অঞ্চলের ১৫টি শ্রেণীর ইঁদুরের দেহের রঙ নিয়ে এক সমীক্ষা করেন। এরিজোনার এই ছোট ছোট মরু অঞ্চলে হাল্কা রঙের গ্রানাইট থেকে গাঢ় রঙের লাভাস্তর পর্য্যন্ত আছে। এখানকার পাথুরে গুহার ইঁদুরগুলির (**Perognathus nitermedias**) দেহের রঙ প্রকৃতির রঙের সঙ্গে এক। এর কারণ নির্ব্বাচনী প্রভাব (**Selection**) প্রকৃতির রঙের সঙ্গে একাত্মতার স্বপক্ষে কাজ করছে এবং যেগুলি অন্য রঙের সেগুলি সহজেই চোখে পড়ে ও শত্রুর শিকার হয়।

বার্গম্যান, এলেন এবং গ্লগারের প্রস্তাবিত নিয়ম (**Bergmann's Allen's & Gloger's rule**) বলে প্রাকৃতিক পরিবেশের তাপমাত্রা এবং আদ্রতার প্রভাব প্রাণী ও উদ্ভিদের বহিঃ প্রাকৃতির পরিবর্ত্তন আনে।

গ্লগারের নিয়ম (**Glogers rule**) :— পাখী ও স্তন্য পায়ীরা উষ্ণ এবং আদ্র আবহাওয়ায় থাকলে গাঢ় বর্ণের হয়। শীত প্রধান শুষ্ক অঞ্চলে এরা হাল্কা রঙের হয়।

বার্গম্যানের নিয়ম :— (**Bergmann's rule**) পাখী ও স্তন্য পায়ীরা শীত

প্রধান দেশে থাকলে তাদের দেহের আকার বড় হয় গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের তুলনায়।

এলেনের নিয়ম (**Allen's rule**) :— উষ্ণ শোনীতের প্রাণীরা যদি শীত প্রধান অঞ্চলে থাকে, তাদের পা, লেজ, কান এবং ঠোট আকারে ছোট হয়।

রেনশের নিয়ম (**Rensches rule**) শীতপ্রধান দেশের পাখীদের ডানা হয় সরু এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পাখীদের ডানা হয় চওড়া।

আমরা দেখেছি প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাবই জনসংখ্যার চরিত্র নির্দ্ধারণ করে ও তার পরিবর্ত্তন আনে। নির্ব্বাচনী প্রভাবের এই কাজের প্রধান উপকরণ বংশধারাশ্রয়ী বৈচিত্র যার উদ্ভব আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ফলে। ক্রম বিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে যাবার সহায়ক এরাই। ডারউইনের ক্রমবিবর্ত্তনের তথ্য এবং দ্রভ্রীস, মরগ্যান, মূলার প্রভৃতির বংশ ধারানুক্রমের তথ্য তাই অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক গভীর।

বিজ্ঞানী গবেষক ও গ্রন্থকার

প্রতিশব্দ

Acrocentric—প্রান্তবিন্দু (?)
Animal cell—জীবকোষ
Anaphase—অন্তপর্ব্ব
Aporepressor—নিয়ামক রসায়ন
Atom—পরমাণু
Allopolyploidy—অসমস্তর বহু গুণিতা
Auto ,, —সমস্তর ,,
Bacteria—জীবাণু
Banded Chromosome—রেখা দেহ ক্রমোসোম
Bareyed—রেখা চোখ
Cistron—সিস্ট্রন
Centriole—মেরুবিন্দু
Centro mere—স্থিতিবিন্দু
Chromatin granules—ঘনপ্রাণ বিন্দু
Chromosomes—ক্রমোসোম বা প্রাণ সূত্র
Chromatid—ক্রোমাটিড (প্রাণ রেখা ??)
Chiasmata—বন্ধনী
Cross over—আড়াআড়ি জোড়া
Chromocentre—কেন্দ্রাংশ
Conditioned—নির্দ্দেশিত
Chrmo mere—ক্রোমোমেয়ার
Cytologist—কোষ বিজ্ঞানী
Cosmic Ray—মহাজাগতিক রশ্মি
Delition—অঙ্গহানি
Diploid member—যোড় সংখ্যা
Diakinesis—বিকর্ষণ
Diplotine—আকর্ষণ
Duplication—পুনরাবৃত্তি
Dominant—সবল
Equatorial plane—মধ্যরেখা
Ebony body—খয়েরী দেহ
Environment—পরিবেশ
Factor—পদার্থ
Fungus—ছত্রাক
Fertilezation—নিষিক্তকরণ
Gene—জীন বা প্রান বিন্দু
Genetic Equilebrium—বংশানু ক্রমিক সমতা
Giant chromosome—বড় ক্রমোসোম
Hybrid—সঙ্কর
Heterozygous
Haploid member—একক সংখ্যা
Inducer—অনুত্তেজক রসায়ণ
Inversion—বিপরীতক্রম

Induced mutation—কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট আকস্মিক পরিবর্ত্তন
Infra red—অতিলাল রশ্মি
Industrial melanism—দেহবর্ণে শিল্পাঞ্চলের প্রভাব
Killer—বিষাক্ত
Lampbrush chromosome—গ্রন্থিবদ্ধ ক্রমোসোম
Leptotene—আবির্ভাব
Larvae—শুককীট
Matrix—ঘনপদার্থ
Metaphase—মধ্যপর্ব্ব
Meosis—যৌনকোষ বিভাগ
Mitosis—দেহকোষ বিভাগ
Muton—মিউটন
Moth—মথ-প্রজাপতী জাতিয় পতঙ্গ
Mutation—আকস্মিক পরিবর্ত্তন
Micro Disection—অতিসূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ
Meta centric—মধ্যবিন্দু
Micro evolution—দ্রুত বিবর্ত্তন
Natural Selection—প্রকৃতির নির্ব্বাচনী প্রভাব
Nucleus—প্রাণকেন্দ্র
Nucleolus—কেন্দ্রমণি
Non Resistant type—অপ্রতি-রোধ্য শ্রেণীর
Oyster—ঝিনুক
Operon—অপেরণ বা সংগঠন
Operator gene—নিয়ন্ত্রক জীন
Organic Compound—জৈব রসায়ণ
Over laping inverssion—উপস্থাপিত বৈপরিত্য
Prophase—প্রথমপর্ব
Pachetene—সম্মিলন
Polyploidy—বহুগুণিতা
Protoplasm—জীবপঙ্ক
—কোষ আবরণী
Potentiality—প্রবনতা
Pure lines—বিশুদ্ধ ধারা
Population—জনসংখ্যা
Physiology—দেহতত্ব
Pure variety—বিশুদ্ধ শ্রেণীর
Pertheno genesis—একক প্রজনন
Para centric—বিকেন্দ্রিক
Peri centric—কেন্দ্রিক
Repressor—উত্তেজক রসায়ণ
Ragulator gene—নিয়ামক জীন
Resting stage—বিরামপর্ব্ব
Refractive index—প্রতিসারণাঙ্ক
Rod shaped—দণ্ডাকৃতি
—[illegible]
Resistant type—প্রতিরোধ্য প্রকৃতির
Recessive—দুর্ব্বল
Relative Length—আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য
Restitution—পূর্ব্বক্রম

Submeta centric—উপপ্রান্ত বিন্দু
Salivary gland cell—লালাগ্রন্থি কোষ
Salivary gland chromosome—লালাগ্রন্থি ক্রমোসোম
Structural gene—কর্ম্মী জীন
Spindle—বক্রপৃষ্ঠ
Species—প্রজাতি
Satellites—উপপ্রান্ত
Selection—নির্ব্বাচনী প্রভাব
Spore—ডিম্বাস্থ
Self fertilisation—স্বতঃ প্রজনন
Spiracle—শ্বাস নালীর খোলা মুখ
Strain—শ্রে
Triploidy—ত্রিগুনিতা
Tetraploidy—চতুর্গুনিতা
Translocation—স্থানপরিবর্ত্তন
Telophase—শেষপর্ব
Telocentric—প্রান্তিক
Tarbants—উপপ্রান্ত
Telomere—প্রান্ত বিন্দু
Ultraviolet ray—অতি বেগুনী রশ্মি
Vestigeal wing—অপুষ্ট ডানা
Vshaped—জোড় পত্রাকৃতি
Variation—বৈচিত্র
Viability—জীবনশক্তি, প্রাণশক্তি
Xray—রঞ্জণরশ্মি
Zygolene—নির্বাচন